12. No. of dailys Newspaper.

13. No. of periodicals. 2

14. No. of Working days. 24

16. Cash in hand. 276/-

17. Cash in S/B. A/C. 2000/20

18. Interest occured Bank. P.L Account Rs. 690/20
upto this date.

No. of 2/KPH/Prog/91/ 1154
Government of Tripura.
..................................Dated, Agartala, the 29.5.91

Copy forwarded tox the Head of Office, Birchandra State Central Library Agartala, for favour of Information and doing the xhe needfull.

Yours faithfully.

আধুনিক পৃথিবী

(১৮১৫—১৯৩৯) ৫৪

শ্রীকিরণচন্দ্র চৌধুরী, এম. এ.

অধ্যাপক, স্কটিশচার্চ কলেজ, কলিকাতা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রকাশক :

শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মূল্য—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৫৭

তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৫৯

মুদ্রাকর :

অজিতকুমার বসু

শক্তি প্রেস

২৭/৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

ভূমিকা

বইয়ের ভূমিকা লেখার প্রয়োজন সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নহি। ...ার মতো অনেকেই হয়ত বইয়ের ভূমিকাটা বাদ দিয়াই বই পড়েন। যাহা ...ক্, প্রচলিত প্রথা-ভঙ্গের দোষে আমি দোষী হইতে চাই না।

বি. এ. ইতিহাসের তৃতীয় পত্রের বাংলা বই 'আধুনিক পৃথিবী' কয়েক মাস ...ই প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল, নানা কারণে দেরী হইয়া গেল। যাঁহারা ...ধ্যই এই বই সম্পর্কে একাধিকবার খোঁজ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ...অপরাধ স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

১৮১৫-১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক ইতিহাসের যাবতীয় বিষয়-বস্তুর ...ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী আলোচনা এই পুস্তকে করা হইয়াছে। আমার ...ওরোপের ইতিহাস' (১৪৫৩-১৮১৫)-এর মতো এই বইখানাও যদি ...ত্রীদের সমাদর লাভে সমর্থ হয় তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

...র্ণ বুক এজেন্সীর কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও সহায়তা ভিন্ন এই বই প্রকাশ ...ম্ভব হইত না। এজন্য আমি এঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

...ই বই লেখার ব্যাপারেও শ্রীমতি ফুলরাণী চৌধুরী, বি. এ. আমাকে ...ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, গতানুগতিক ধন্যবাদ দ্বারা এই ঋণ শোধের চেষ্টা ...ব না। অপর একজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। ...নাম শ্রীমান্ দীপক চৌধুরী, বয়স মাত্র ৬।৭। বইয়ে তাহার নাম উল্লেখ ... হইবে এই শর্তে সে আমাকে তাহার কলমটি মাঝে মাঝে ধার দিয়া ...য্য করিয়াছে।

কলিকাতা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় বইখানা ছাত্র-ছাত্রী সমাজে আদৃত হইয়াছে বুঝিয়া উৎসাহিত হইলাম। আমার সমকর্মী অধ্যাপকগণ তাঁহাদের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য হিসাবে বইখানা অনুমোদন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের যে-সকল দোষ-ত্রুটি চোখে পড়িয়াছিল সেগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভবিষ্যতে অতি-আধুনিক কালের ঘটনাবলী পরিশিষ্ট হিসাবে যোগ করিবার বাসনা রাখি। ইতি—

কলিকাতা
৭ই আগস্ট, ১৯৫৭

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আধুনিক পৃথিবী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনের পশ্চাতে যেসকল ছাত্র-ছাত্রী ও আমার সমকর্মী অধ্যাপকগণের সহৃদয় সহায়তা রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

তৃতীয় সংস্করণে কতক নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে। আশাকরি ইহাতে বইয়ের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতি-আধুনিক কালের ঘটনাবলী পাঠ্য-তালিকাভুক্ত না হইলেও পরিশিষ্ট হিসাবে যোগ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সত্বরই বি. এ. পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, সেজন্য বর্তমানে সে চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। ইতি

কলিকাতা
৭ই জুলাই, ১৯৫৯

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

আধুনিক পৃথিবী

(১৮১৫—১৯৩৯)

সূচনা

উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of the 19th Century)

ঐতিহাসিক বিবর্তনের পর্যায়-বিভাগের দিক হইতে বিচার করিলে নেপোলিয়নের পতনে (১৮১৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি, এবং ভিয়েনা সম্মেলন হইতে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ ছিল অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধি-যুগ।

নেপোলিয়নের পতনে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি: ভিয়েনা সম্মেলনে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল আন্তর্জাতিক সমবায়ের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা। ইওরোপীয় রাজনীতিকে যুগ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইওরোপের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখিবার যে-চেষ্টা ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এক অভিনব আন্তর্জাতিক পরীক্ষা চলিতেছিল। ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ মৌখিক আদর্শবাদিতার সহিত তাঁহাদের কার্যের কোন সামঞ্জস্য রাখেন নাই, সত্য, 'নৈতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবন,' 'ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্বণ্টন' প্রভৃতি উচ্চাদর্শের পশ্চাতে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় তাঁহারা দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তথাপি ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যেই পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান ও শান্তিরক্ষার উপায়ের ইঙ্গিত রহিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য : (১) আন্তর্জাতিক সমবায়ের মাধ্যমে ইওরোপের শান্তি-রক্ষার চেষ্টা

উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী বিপ্লবের সর্বগ্রাসী শক্তির প্রভাবে ইওরোপীয় শাসক সমাজে যে ভীতি ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই 'ন্যায্য-অধিকার' (Legitimacy), 'শক্তি-সাম্য' (Balance of power) প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এবং ইওরোপীয় কন্‌সার্ট (Concert of Europe)-এর উদারনীতি-বিরোধী কার্যকলাপে। ধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, বিপ্লব-প্রসূত অবাস্তব উদারনৈতিক আদর্শ-বাদের—যেমন রুশো'র প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণা—পরিবর্তে এখন জনকল্যাণকর রাষ্ট্র স্থাপনের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। 'সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণসাধন' তখন হইতে রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।* আদর্শবাদিতার স্থলে রাষ্ট্রের উপযোগিতা রাষ্ট্র-গঠনের এবং রাষ্ট্র-কর্তব্যের মূলনীতি হইয়া দাঁড়ায়।

(২) দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা: প্রতিক্রিয়াশীলতা ও উদার নীতি

প্রতিক্রিয়া-প্রসূত ন্যায্য-অধিকার ও শক্তি-সাম্য নীতি

উদারনীতি: আদর্শ-বাদের স্থলে বাস্তব জনকল্যাণকর রাষ্ট্র-স্থাপনের ধারণা

আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা ফরাসী বিপ্লব হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই গণতান্ত্রিকতা 'জনগণের শাসনাধিকার' বুঝায় নাই; অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শাসনাধিকার লাভ—এইটুকু গণতান্ত্রিক উদারতা ঐ সময়ে পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর ঐ যুগের শাসনাধিকার নির্ভরশীল ছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হইলেও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেণীর কোনপ্রকার উন্নতি ঘটে নাই।†

গণতান্ত্রিক ধারণা: মধ্যবিত্তের অধিকার সীমাবদ্ধ

* "The dreams of the 'State of Nature' and the 'Rights of Man' give place to gospel of utilitarianism, with its doctrine of the 'greatest happiness to the greatest number' as the supreme object of the state." *Modern Europe, 1815-1899*, Phillips, p. 4.

† "The principle of 'government by the people, for the people'—it had derived from the Revolution ; but in practice this had come to mean no more than the claim of capital to share in political privileges hitherto monopolised by birth." *Ibid.* p. 4.

ফলে অর্থশালী মধ্যবিত্ত সমাজ শাসনব্যবস্থায় স্থানলাভ করিলেও সাধারণ শ্রেণীর লোক শাসনকার্যে কোন অংশ লাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার লাভ করিলে এবং অপরদিকে শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসারহেতু মূলধনী সমাজের শ্রমিকশোষণ বৃদ্ধি পাইলে সাধারণ সমাজ অর্থাৎ 'প্রোলিট্যারিয়াট' (Proletariat) শ্রেণী জন্ম ও বিত্তের ভিত্তিতে বিশেষ অধিকার ভোগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রোলিট্যারিয়াট শ্রেণীর আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর অপর বৈশিষ্ট্য হইল জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য। ফরাসী বিপ্লব হইতেই আধুনিক জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী তথা পূর্বেকার জাতীয়তার ধারণা হইতে ইহা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক্। পূর্বে রাজার প্রতি আনুগত্য, এমন কি রাজার জন্য নিজ দেশ ও দেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা জাতীয়তার প্রকাশ বলিয়া ধরা হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্বেকার ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। রাজার স্বার্থই দেশের স্বার্থ এবং এই দুইয়ের স্বার্থের মধ্যেই জনগণের স্বার্থ—এইরূপ ধারণা জন্মিবার ফলে জনগণের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থের সহিত রাজার স্বার্থ সমধর্মী হইয়া পড়ে। এই নূতন জাতীয়তাবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে এক বিপ্লবাত্মক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সমগ্র ইওরোপে এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা, গ্রীস, বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা-লাভ এই জাতীয়তাবাদেরই বিজয়স্বরূপ।

জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য :

জাতি ও দেশের স্বার্থের সহিত শাসকের স্বার্থ সমধর্মী

জাতীয়তার প্রসার

বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের জন্যও উনবিংশ শতাব্দী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন, জাপান ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট উন্মুক্ত হয়। এই যুগেই আফ্রিকার অভ্যন্তরদেশে ইওরোপীয় বিভিন্ন দেশগুলির আধিপত্য স্থাপিত হয়।*

বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি

* "One of the principal features of the nineteenth century has been the Europeanisation of the world." *A History of Modern Times*. D. M. Ketelbey, p. 459.

বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the 20th Century) :

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর উগ্র জাতীয়তাবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, উগ্র এবং সংগ্রামশীল জাতীয়তাবোধ হইতেই প্রথম মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলকান সমস্যা সমাধানের অসম্পূর্ণতার জন্যও এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান ও শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। পারিবারিক জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এই উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক জীবন, সাধারণ শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা এবং আত্মমর্যাদায় স্থাপিত হওয়ার দাবি, বর্তমান শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। চতুর্থতঃ, ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ ও সাফল্যলাভ এক নূতন পৃথিবী রচনা করিতে চলিয়াছে। পঞ্চমতঃ, নূতন চীনের জন্ম, স্বাধীন ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার, স্বাধীন মিশরের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, রাশিয়া ও আমেরিকার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি প্রভৃতি বর্তমান শতাব্দীর অতি আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ষষ্ঠতঃ, বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পর হইতে ইউ. এন. ও.-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যা বিনাযুদ্ধে সমাধান করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার আন্তর্জাতিক এবং জনকল্যাণমূলক নিয়ন্ত্রণের উপরই বিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

উগ্র জাতীয়তাবোধ

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ

নূতন চীন ; স্বাধীন ভারত ; স্বাধীন মিশর ; বিরোধী রাষ্ট্র-জোট

আন্তর্জাতিকতার প্রসার : লীগ-অব্-ন্যাশন্স্ : ইউ. এন. ও.

প্রথম অধ্যায়

ভিয়েনা সম্মেলন

(The Congress of Vienna)

ভিয়েনা কংগ্রেস বা সম্মেলন, ১৮১৫ (Vienna Congress, 1815) :

নেপোলিয়নের পতনের পর মহাসমারোহে ইওরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিগণ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে সমবেত হইলেন। ভিয়েনার এই কংগ্রেস* বা সম্মেলন ইওরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বৈঠক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বস্তুত, সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপকতা অথবা সদস্যদের সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে এইরূপ রাজনৈতিক সম্মেলন ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

অভূতপূর্ব সম্মেলন

সমসাময়িক শক্তিশালী রাজগণের মধ্যে অস্ট্রিয়ার প্রথম ফ্রান্সিস্, রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার (১ম), প্রাশিয়ার তৃতীয় ফ্রেডারিক প্রভৃতি ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। রাজনীতি-ধুরন্ধরদের মধ্যে আসিলেন ইংলণ্ডের ক্যাসালরি ও ডিউক-অব্-ওয়েলিংটন, অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব প্রিন্স্ মেটারনিক্, রাশিয়ার নেসেল্-রোড্, প্রাশিয়ার হাম্বল্ডাট্ ও হার্ডেনবার্গ এবং ফ্রান্সের ট্যালির্যাঁ। একমাত্র তুরস্ক ও পোপের রাজ্য ভিন্ন ইওরোপের সকল দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। সমবেত সদস্যগণের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কপটতা, স্বার্থপরতা, উদারতা প্রভৃতি বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে ভিয়েনা সম্মেলনের আবহাওয়া ক্রমেই রহস্যাবৃত হইয়া উঠিল।

সম্মেলনের প্রধান সদস্যগণ

রহস্যাবৃত আবহাওয়া

---

* ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ভিয়েনার সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে বিজেতা শক্তিগুলির সহিত ফ্রান্সের যে চুক্তি (Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ঐ সন্ধির শর্তের ভিত্তিতে আলোচনা চলে। এই সময় নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। নেপোলিয়নের পুনরাগমনের শাস্তিস্বরূপ ২০শে নভেম্বর ভিয়েনা সম্মেলনে প্রথম প্যারি চুক্তির কতক পরিবর্তন সাধিত হয়।

অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটার্নিক্ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কূটকৌশল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে এক অপ্রতিহত প্রাধান্য দান করিল।* ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিনিধিগণ নিজেদের শক্তির সুযোগ লইয়া সম্মেলনের কর্মপন্থা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু এই চতুঃশক্তির প্রাধান্য ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব ট্যালির্যাঁ-এর গভীর কূটনৈতিক চালের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত হইল। ট্যালির্যাঁ এই চতুঃশক্তির প্রাধান্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র, অবহেলিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসের নেপথ্যে পূর্ব হইতেই কোন কার্যপন্থা যাহাতে স্থির না হইতে পারে এবং সকল বিষয়ই যাহাতে কংগ্রেস বা সম্মেলনের সদস্যদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তিনি সেই বিষয়ে সতর্ক রহিলেন। প্রধান শক্তিগুলির পরস্পর স্বার্থ-দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া তিনি ফ্রান্সের জন্য এই সম্মেলনে মর্যাদাপূর্ণ স্থান আদায় করিলেন। তিনি সমবেত প্রতিনিধিগণকে বুঝাইলেন যে, ইওরোপের শত্রুতা ফ্রান্স বা ফরাসী জাতির বিরুদ্ধে নহে, ইহা কেবলমাত্র নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। এইভাবে ট্যালির্যাঁ ইওরোপের পুনর্বণ্টনের কার্যে ফ্রান্সের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিলেন। তিনি দুর্বল রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মীমাংসায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া নেপোলিয়নের যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সকে যে-শাস্তি ভোগ করিতে হইত তাহা এড়াইতে সক্ষম হইলেন।†

প্রিন্স্ মেটার্নিকের প্রাধান্য : ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার আধিপত্য

ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব ট্যালির্যাঁ-এর কূট-কৌশল

ফ্রান্সের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ

* "He could swim like fish in the sparkling whirlpool of Vienna." Quoted by D. M. Ketelbey : *A History of Modern Times*, p. 144.

† "His argument was that Europe had fought Napoleon and not France." "...France became the arbiter in the chief questions before the Congress." Morse Stephens : *Revolutionary Europe*, p. 339.

"No longer was France a pariah among the nations. One wonders what might have happened if Germany had possessed a Talleyrand in 1919." Riker : *A short History of Modern Europe*. p. 383.

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যা (Problems before the Congress of Vienna) :

সম্মেলনের সম্মু সমস্যা :

নেপোলিয়নের উত্থানের ফলে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলনে স্বভাবতই সেগুলির সমাধান করা প্রয়োজন হইল। এই সমস্যা-গুলিকে সাতটি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা : (১) দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের যুদ্ধের ফলে ইওরোপের রাজনৈতিক কাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল উহার পুনর্গঠন ; (২) পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ; (৩) জার্মানির শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ; (৪) রাইন সীমারেখা নির্ধারণ ; (৫) স্যাক্সনি সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ; (৬) ফ্রান্সের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ; (৭) বিজেতা দেশগুলির মধ্যে ইতিপূর্বে যে-সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য সম্পাদন।

(১) ইওরোপের পুনর্গঠন, (২) পোল্যাণ্ড, (৩) জার্মানি, (৪) রাইন, (৫) স্যাক্সনি, (৬) ফ্রান্স, (৭) বিজেতা দেশগুলির মধ্যে চুক্তি প্রভৃতির সমাধান

ইওরোপের পুনর্বণ্টন (Territorial Redistribution) :

ভিয়েনা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ বাহ্যত সততা, ন্যায় ও আদর্শ-বাদের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। ইওরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন, 'রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন', 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপন,' 'ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্বণ্টন' প্রভৃতি আদর্শ-বাদী বুলি আওড়াইতে তাঁহারা কার্পণ্য করিলেন না। এগুলি কেবলমাত্র সম্মেলনের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব বাড়াইবার জন্যই বলা হইয়াছিল। প্রকৃতক্ষেত্রে তাঁহারা বিজিতের সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবার জন্য পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন।* বিজয়ী দেশগুলি—ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার পারিশ্রমিক হিসাবে কতক কতক স্থান আত্মসাৎ করিল।

উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা

বস্তুত নীচ স্বার্থসিদ্ধির মনোবৃত্তি

রাশিয়াকে গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারসো'র অধিকাংশ (পোজেন ও থর্ণ বাদে), ফিন্‌ল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া ও অপর কয়েকটি তুর্কী-সাম্রাজ্যভুক্ত স্থান দেওয়া হইল। এই সকল স্থানলাভের ফলে

রাশিয়া

* "They (people) saw the unedifying scramble of the conquerors for the spoils of victory." C. D. Hazen : *Europe Since 1815*, p. 8.

ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে রাশিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। অধীন পোলগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতেও রাশিয়া স্বীকৃত হইল।

প্রাশিয়া ও স্যাক্সনি

প্রাশিয়া পোজেন, থর্ণ, ডান্‌জিগ্‌ ও স্যাক্সনির উত্তরাংশ, পশ্চিম পোমেরেনিয়া এবং রাইন নদীর তীরবর্তী প্রদেশগুলি লাভ করিল। স্যাক্সনির অবশিষ্টাংশ তথাকার রাজার অধীনেই রাখা হইল।

অস্ট্রিয়া : বেভেরিয়া

অস্ট্রিয়া হল্যাণ্ডকে বেলজিয়াম দান করিল এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভেনিস ও লোম্বার্ডি লাভ করিল। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়া ডালম্যাশিয়া পূর্ব-গ্যালিসিয়া এবং বেভেরিয়ার নিকট হইতে টাইরল, স্যাল্‌জবার্গ, ভোরারল্‌বার্গ প্রাপ্ত হইল। বেভেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যারিউথ্‌, আন্‌স্‌পাক্‌ ও রাইন-প্যালাটিনেট দেওয়া হইল।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ড মাল্টা, হ্যালিগোল্যাণ্ড, সিংহল, কেপ্‌-কলোনি, আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি লাভ করিল। ইংলণ্ড ছিল নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের ক্ষতির পরিমাণ যেমন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, ক্ষতিপূরণের পরিমাণও তেমনি ইংলণ্ড সর্বাধিক গ্রহণ করিয়াছিল।

জার্মানি : কন্‌ফেডারেশন অব দি রাইন

জার্মানি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা লইয়া প্রতিনিধি দলের মধ্যে দারুণ মতানৈক্য দেখা দিল। অস্ট্রিয়া চাহিল জার্মানির উপর পূর্বেকার আধিপত্য স্থাপন করিতে, অপর দিকে জার্মান রাষ্ট্রগুলি চাহিল স্বাধীনভাবে থাকিতে। শেষপর্যন্ত জার্মানির ৩৮টি রাজ্য এবং স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রগুলি লইয়া এক অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা (Loose Confederation) গঠন করা হইল* ; ইহার নাম হইল জার্মান কন্‌ফেডারেশন (German Confederation)। এই যুক্তরাষ্ট্রটিকে আইনতঃ অস্ট্রিয়ার আধিপত্যাধীনে রাখা হইল। ফ্রাঙ্কফার্ট (Frankfurt) নামক স্থানে অস্ট্রিয়ার সভাপতিত্বে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপিত হইল।

ইতালির উত্তরভাগে ভেনিস ও লোম্বার্ডি, অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইল। ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে স্যাভয়, পাইডমণ্ট্‌ ও জেনোয়া এবং ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীকে (নেপোলিয়নের স্ত্রী মেরি লুই) পার্মা দেওয়া হইল। টাস্কেনী ও মডেনা অস্ট্রিয়ার রাজবংশোদ্ভূত যুবরাজগণকে দেওয়া হইল। ন্যাপল্‌স

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হেসি-হেমবুর্গ সংযুক্ত হইলে উহার সংখ্যা হইল ৩৯।

ও সিসিলিতে বুর্‌বোঁ রাজা ফার্ডিনাণ্ডকে পুনঃস্থাপন করা হইল। পোপের রাজ্যগুলি পুনরায় গঠন করা হইল। ইতালির ক্ষেত্রে জার্মানির ন্যায় কোন অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা হইল না। এইভাবে সমগ্র ইতালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'ইতালি' নামটির কোন সার্থকতা রাখা হইল না। 'ইতালি' একটি ভৌগোলিক নামে পরিণত হইল। বাস্তবে এইরূপ একটি দেশ আর রহিল না।

ইতালি : ভৌগোলিক নামে পরিণত

সুইট্‌জারল্যাণ্ড

সুইট্‌জারল্যাণ্ড ভ্যালাইস, নিউচ্যাটেল ও জেনেভা এই তিনটি ক্যাণ্টন (প্রদেশ) লাভ করিল এবং সর্বকালের জন্য নিরপেক্ষ (neutral) রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইল।

সুইডেন

ডেনমার্ক হইতে নরওয়ে কাড়িয়া লইয়া সুইডেনের সহিত যুক্ত করা হইল : এইভাবে সুইডেনকে ফিন্‌ল্যাণ্ড ত্যাগের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল।

হল্যাণ্ড

হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামকে যুক্ত করিয়া অরেঞ্জ পরিবারের অধীনে স্থাপন করা হইল।

ন্যায্য-অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য নীতি (Principles of Legitimacy, Compensation & Balance of Power) :

ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাততান্ত্রিক। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি উদার নীতি তাঁহাদের নিকট স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইওরোপের পুনর্গঠনের কার্যে তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থের দিকটাই বড় করিয়া দেখিলেন। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে সামাজিক পুনরুজ্জীবন ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন—ইত্যাদি আদর্শবাদী ঘোষণা নিছক মুখের কথায় পর্যবসিত হইল। নিজেদের স্বার্থের দিক বিবেচনা করিয়া এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা তিনটি নীতির অনুসরণ করিলেন : (১) ন্যায্য-অধিকার (Legitimacy), (২) ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও (৩) শক্তি-সাম্য (Balance of Power)।

মৌখিক আদর্শবাদের পশ্চাতে মূল নীতি —ন্যায্য-অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগের দ্বারা তাঁহারা ফরাসী বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা (Status Quo) ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেন। যে-স্থান যে-দেশের

ন্যায্য-অধিকার নীতি (Legitimacy) Status Quo

অথবা যে বংশের অধীনে ছিল, সেইস্থান সেই দেশ বা বংশের অধীনে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে সঞ্জীবিত করিতে গিয়া তাঁহারা বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তার আবেদনকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারা উত্তর ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যের পুনঃস্থাপন করেন; দক্ষিণ ইতালিকে পূর্বেকার সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত করেন, এমন কি, সিসিলি-ন্যাপল্‌সের সিংহাসনে কুখ্যাত ফার্ডিনাণ্ডকে পুনঃস্থাপন করেন। এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করেন। স্যাভয় ও সার্ডিনিয়ায় স্যাভয় পরিবার, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ পরিবার (House of Orange), ও মধ্য-ইতালিতে পোপের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ফ্রান্স ও স্পেনে বুর্‌বোঁ পরিবার পুনঃস্থাপিত হয়।

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ

বিজেতা রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের কার্যের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল 'ক্ষতিপূরণ' নীতির প্রয়োগ দ্বারা। ন্যায্য-অধিকার নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে বিজেতা রাষ্ট্রগুলির ভাগে কিছুই পড়ে না, সুতরাং ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগের দ্বারা সেগুলিকে কোন কোন স্থান অধিকার করিতে দেওয়া হইল।

ক্ষতিপূরণ নীতি (Compensation)

নেপোলিয়নের পরাজয়ে ইংলণ্ডের দান ছিল সর্বাধিক, ইংলণ্ডের ক্ষতিপূরণও মিলিল সর্বাপেক্ষা অধিক। সিংহল, কেপ-কলোনি, আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি ইংলণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে লাভ করিল্‌। হল্যাণ্ডকে দেওয়া হইল বেলজিয়াম। রাশিয়া পাইল গ্র্যাণ্ড ডাচি বা ওয়ার্‌সো'র অধিকাংশ, ফিন্‌ল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া ইত্যাদি। প্রাশিয়ার ভাগে পড়িল স্যাক্সনির উত্তরাংশ, ডানজিগ্‌, থর্ণ, পোজেন, রাইন প্রদেশগুলি, পশ্চিম পোমেরেনিয়া ইত্যাদি। আবার, শক্তি-সাম্য নীতি বজায় রাখিতে গিয়া একদেশ হইতে একাংশ লইয়া অপর দেশকে দেওয়া হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া হইতে বেলজিয়াম হল্যাণ্ডকে দেওয়া হইয়াছিল, ইহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অস্ট্রিয়াকে ইতালিতে প্রাধান্য দান করা হইয়াছিল। সুইডেন হইতে ফিন্‌ল্যাণ্ড রাশিয়াকে এবং পশ্চিম পোমেরেনিয়া প্রাশিয়াকে দেওয়ার জন্য সুইডেন নরওয়ে লাভ করিয়াছিল।

ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি-সাম্য নীতির প্রয়োগ পূর্ব হইতেই

চলিয়া আসিতেছিল। ভিয়েনা সম্মেলন এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা ফ্রান্সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিতে সচেষ্ট ছিল। বেলজিয়াম-হল্যাণ্ড রাষ্ট্র গঠন, প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি, ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন শক্তি-সাম্য নীতিরই পরিচায়ক। ফ্রান্সকে ভবিষ্যতে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করিবার সুযোগ না-দেওয়ার ব্যবস্থা হিসাবেই এরূপ করা হইয়াছিল। আবার প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশকে ক্ষতিপূরণ এমনভাবে দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে একটি অপরটি হইতে অধিকতর শক্তিশালী না হইতে পারে।

শক্তি-সাম্য নীতি (Balance of Power)

সমালোচনা (Criticism) :

ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, ভিয়েনা সম্মেলন নামে মাত্র-ই 'সম্মেলন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।* প্রকৃত ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্স—এই পাঁচটি শক্তিই সম্মেলনের কার্যাদি তাহাদের গোপন বৈঠকে স্থির করিয়াছিল। প্রতিনিধিবর্গকে সম-মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক নীতি ভিয়েনা সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে ইউ. এন. ও. (U.N.O.) অবধি অস্বীকৃত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভিয়েনা সম্মেলন জাতীয়তা-বাদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা তাহাদের স্বার্থপর নীতির সম্মুখে স্থান পায় নাই। জার্মানির ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিবেশী বৃহৎ জার্মান রাষ্ট্রগুলির অধিকার হইতে মুক্ত না করিয়া, জার্মানিতে এক অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া এবং সর্বোপরি অস্ট্রিয়াকে এই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিত্ব দান করিয়া জাতীয়তাবাদ-নীতির অবমাননা করা হইয়াছিল। জাতি, ধর্ম ও ঐতিহাসিক বিবর্তন উপেক্ষা করিয়া হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের একত্রীকরণ, নরওয়েকে সুইডেনের অধীনে স্থাপন, সমদোষেই দুষ্ট ছিল। ইতালির

নামেমাত্রই সম্মেলন : পাঁচটি শক্তির প্রাধান্য

জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা

দৃষ্টান্ত—জার্মানি, বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি

* "In fact, strictly speaking there was no Congress at all. A score or more of representatives from petty princes came to add their piping voices to this European chorus, but they were only allowed the privilege of forming the background. The foreign ministers of the five great powers were the Congress." Riker, *A short History of Modern Europe*, p. 382.

"Everything was arranged outside in special committees, and in the intimate interviews of sovereigns and diplomats." C. D. Hazen, p. 4.

প্রতি অবিচার আরও অধিক মাত্রায় করা হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যাধীন থাকিবার এবং ফরাসী বিপ্লবে প্রভাবিত হওয়ার ফলে ইতালি-বাসীদের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলন তাহার কোন মূল্য দেয় নাই। তৃতীয়তঃ, তাঁহারা ন্যায্য-অধিকার নীতিও সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই। বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ। চতুর্থতঃ, প্রতিনিধিগণ বিপ্লবের দান—গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিয়া ঐতিহাসিক ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন।

ন্যায্য-অধিকার (Legitimacy) নীতির আংশিক প্রয়োগ

বিপ্লবের পূর্বেকার ব্যবস্থা (Status Quo) স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজনৈতিক প্রগতিকে রুদ্ধ করিয়া তাঁহারা মৃতপ্রায় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া প্রতিনিধিগণ নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অচল শক্তি-সাম্য (Balance of Power) নীতি এবং বংশগত স্বার্থরক্ষার নীতির উপর জোর দিয়া তাঁহারা যুগধর্মকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।* পঞ্চমতঃ, প্রতিনিধি-বর্গের ফরাসী-ভীতি তাঁহাদিগকে ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতি অনুসরণে প্ররোচিত করিয়াছিল। ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাহাতে পুনরায় ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাঁহারা নানাবিধ অন্যায়মূলক, নৈতিকতা-বর্জিত অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার চিন্তা তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং সেইহেতু তাঁহারা জনস্বার্থ, ন্যায়পরায়ণতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ পান নাই। স্বভাবতই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারের কাঠামোর মূল

Status Quo স্থাপন: রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

বংশগত স্বার্থ ও অচল শক্তি-সাম্য নীতির (Balance of power) প্রয়োগ

ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতি

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ভিয়েনা চুক্তি ভঙ্গের চেষ্টা

* "It marked a reversion to the outworn ideas of the 18th century, to the doctrine of 'balance' and the supremacy of dynastic interests; the clock was set back by the repartition of Italy and the ineffective reconstitution of Germany." Marriot: *The Remaking of Modern Europe*, p. 131.

উৎপাটনে ব্যয়িত হইয়াছিল। ষষ্ঠতঃ, ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের গতানুগতিক কূটনৈতিক জ্ঞান ও স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন।* ইওরোপের জনগণের মধ্যে যে নূতন ভাবধারা, নূতন চেতনা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রতিনিধিগণ উপলব্ধি করেন নাই।

প্রতিনিধিবর্গের স্বার্থ-পরতা

স্বপক্ষে যুক্তি

তথাপি ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির স্বপক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। (১) প্রতিনিধিবর্গ জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনেই আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য প্রতিনিধিবর্গ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ইওরোপের ইতিহাসে উহাই ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে লীগ-অব-ন্যাশনস্ (League of Nations) এবং ইউ. এন. ও. (U.N.O.) ইহারই পশ্চাদনুসরণ বলা যাইতে পারে। (২) ভিয়েনা সম্মেলনে উপস্থিত রাজনীতিবিদ্‌গণের পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ইওরোপের জটিল রাজনৈতিক সমস্যা-সঙ্কুল ভিত্তির উপর পুনর্গঠনের কার্য যেমন ছিল কঠিন তেমনই ছিল অনিশ্চিত।† এই কারণে পূর্বেকার সব কিছুকে উপেক্ষা করা প্রতি-নিধিগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নেপোলিয়নের সহিত যুগ্মভাবে যুঝিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে যে-সকল চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেগুলির শর্তাদি প্রতিনিধিগণের কর্মপন্থা বহুলপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। 'আবো'র সন্ধি (Treaty of Abo, 1812) দ্বারা সুইডেনকে নরওয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে কালিশ্‌ক্ (Kalisch)-এর চুক্তি, রাইশেনবেক (Reichenbach), টোপ্‌লিজ (Toplitz)-এর চুক্তি—প্রভৃতি পূর্ব হইতেই ভিয়েনা প্রতিনিধিবর্গের কর্মপন্থা নির্ধারিত করিয়া

আন্তর্জাতিকতা

প্রতিনিধিবর্গের পরিস্থিতি

জটিল সমস্যা-সঙ্কুল ভিত্তির উপর পুনর্গঠনের কার্য

পূর্বেকার পরস্পর চুক্তির শর্তপালনের দায়িত্ব

---

*"Its work has been severely criticised, nor can it be denied that many blunders were made, that little foresight was shown, that important principles were ignored, and that selfish interests were too much regarded". Marriot, p. 120.

† "...that though diplomatists were called on to rebuild, it was on old and encumbered sites". *Ibid*, p. 120.

রাখিয়াছিল। (৩) ইহা ভিন্ন, পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বৎসর * ভিয়েনার প্রতিনিধিবর্গ ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পুনরায় ইওরোপ যদি কোন ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হইত, তাহা হইলে ইওরোপের সর্বনাশ সাধিত হইত সন্দেহ নাই। ভিয়েনায় প্রতিনিধিগণ সেইরূপ পরিস্থিতি হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (৪) সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তীকালে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদির সমালোচনা করা এবং তাহার ত্রুটি বাহির করা সহজ হইলেও ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা প্রতিনিধিগণ যেরূপ পরিস্থিতিতে কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন সেই কথা স্মরণ করিলে তাঁহাদের কার্যাদির সমালোচনা যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অহেতুক রূঢ় হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

পরবর্তী চল্লিশ বৎসর শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম

সমালোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে অযথা রূঢ়

ভিয়েনা সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যার সমাধান কিভাবে হইয়াছিল ?

(১) ইওরোপের পুনর্গঠন কার্যে ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ ন্যায্য অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য এই তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। (উপরে এই তিনটি নীতির বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। (২) পোল্যাণ্ডের সমস্যা জার আলেকজাণ্ডারের স্বপক্ষে সমাধান করা হইয়াছিল। তিনি পোজেন ও থর্ণ ভিন্ন ওয়ারসো গ্রাণ্ড ডাচির সমগ্রটাই দখল করিয়াছিলেন। (৩) স্যাক্সনির সমস্যা অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাশিয়ার স্বপক্ষে সমাধান করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া অবশ্য কয়েকটি স্থান দখল করিয়াছিল। (৪) এক অসংবদ্ধ জার্মান-জাতীয়-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জার্মানির শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত হইয়াছিল। সর্বোপরি ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্য। (৫) রাইন-প্রদেশগুলি প্রাশিয়াকে দান করিয়া ভবিষ্যতে ফ্রান্সের শক্তি-বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল। (৬) ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাহাতে ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট না-করিতে পারে সেইজন্য ফ্রান্সকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করা হইল। রাইন সীমায় প্রাশিয়াকে আধিপত্য দান, হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের সংযুক্তি, দক্ষিণ ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন, স্যাভয় পরিবারের শক্তিবৃদ্ধি—

*"It is, however, given to few Congresses to legislate for a century, while that of Vienna can at least claim to have inaugurated forty years of peace." Ketelbey, p. 147.

ইত্যাদি ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতির উপায়স্বরূপ। (৭) শক্তি-সাম্য নীতির দিক্ দিয়া লক্ষ্য রাখিয়া ইংলণ্ড, রাশিয়া, হল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে পুরস্কার-স্বরূপ অপর দেশের অংশ দেওয়া হইল। (৮) ভিয়েনা চুক্তিতে পূর্বেকার স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলির শর্তাদি পালন করা হইয়াছিল। সুইডেনকে নরওয়ে দান করা, উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

এইভাবে সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যবস্থা পোল, জার্মান, বেলজিয়ামবাসী প্রভৃতি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইল না, উপরন্তু নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইল। এই কারণে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাদি বিনষ্ট করিবার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল।

Questions & Hints

1. "Three chief principles moulded the Vienna Settlement." Critically examine this statement. (C. U. 1940, 1946)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : মুখে আদর্শবাদের পরাকাষ্ঠা : মূল নীতি ছিল তিনটি : (২) ন্যায্য-অধিকার (Legitimacy), (৩) ক্ষতিপূরণ (Compensation), (৪) শক্তি-সাম্য (Balance of power), (৫) ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগ, (৬) ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগ, (৭) শক্তি-সাম্য নীতির প্রয়োগ, (৮) সমালোচনা : (ক) জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা, (খ) ন্যায্য-অধিকার নীতির আংশিক প্রয়োগ, (গ) অচল শক্তি-সাম্য ও বংশগত স্বার্থ-নীতির প্রয়োগ, (ঘ) ফ্রান্স-পরিবেষ্টন নীতি, (ঙ) উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ ভিয়েনা-চুক্তি নাশে ব্যয়িত, (৯) স্বপক্ষে যুক্তি : (ক) আন্তর্জাতিকতা, (খ) প্রতিনিধিবর্গের পরিস্থিতি, (গ) সমস্যা-সঙ্কুল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, (ঘ) পূর্ব প্রতিশ্রুতি, (ঙ) চল্লিশ বৎসরব্যাপী শান্তি বজায়, (চ) কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা রূঢ় হইয়াছে। ৯—১৪ পৃষ্ঠা]

2. Discuss the principles underlying the Vienna Settlement of 1815. (C. U. 1935, 1948, 1954)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। ৯—১৪ পৃষ্ঠা]

3. Describe the Vienna Settlement. (C. U. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : নেপোলিয়নের পতনের পর মহাসমারোহে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে ইওরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের এক মহাসম্মেলন বসিল। মুখে আদর্শবাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও প্রতিনিধিগণ ন্যায্য-অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও শক্তি-সাম্য এই তিনটি নীতির ভিত্তিতে

ইওরোপের পুনর্বণ্টন করিলেন। (২) পুনর্বণ্টন: রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, বেভেরিয়া, ইংলণ্ড, জার্মানি, ইতালি, স্যাক্সনি, সুইট্জারল্যাণ্ড, সুইডেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতির কোন কোনটিকে ক্ষতিপূরণ দান ও কোন কোনটিকে শাস্তি প্রদান; (৩) সমালোচনা। ৭—৯, ১১—১৪ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়

(The Concert of Europe)

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (The Concert of Europe):

ভিয়েনা সম্মেলনের রাজনীতিকগণ তাঁহাদের কার্যাদি যাহাতে স্থায়ী হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইলেন। ইওরোপের শান্তি ব্যাহত হইতে পারে এমন কোন কিছুই তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইল না। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের মনে এক দারুণ ফরাসী-ভীতি জাগিয়াছিল। সুযোগ পাইলেই ফ্রান্স পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইবে এই আশঙ্কা তাঁহাদের মনে স্বভাবতই ছিল। সুতরাং কেবল-মাত্র শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াই তাঁহাবা ক্ষান্ত হইলেন না। প্রাক্-বিপ্লব যুগের যে রাজনৈতিক কাঠামো তাঁহারা পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন উহাকে বিপ্লবের প্রভাবমুক্ত না রাখিতে পারিলে ভিয়েনা চুক্তি ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা 'কন্‌সার্ট-অব্‌-ইওরোপ (Concert of Europe) বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। এই শক্তি-সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা ও উহার সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলি অব্যাহত রাখা। এইজন্য তাঁহারা আরও দুইটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন; ইহাদেব একটি হইল 'পবিত্র চুক্তি' (Holy Alliance) অপরটি 'চতুঃশক্তি চুক্তি' (Quadruple Alliance)। এই দুই চুক্তির শর্তানুযায়ী ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যে এক ঐক্য-বন্ধন স্থাপিত হইল, তাহাই কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় নামে পরিচিত।

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)

(১) পবিত্র-চুক্তি (Holy Alliance), চতুঃ-শক্তিচুক্তি (Quadruple Alliance)

পবিত্র-চুক্তি (Holy Alliance) ঃ

রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে পবিত্র-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জার আলেকজাণ্ডারের উদ্যোগে পবিত্র-চুক্তি স্বাক্ষরিত

জার আলেকজাণ্ডার ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ আদর্শ-বাদী। বাস্তব জগতের জ্ঞান তাঁহার খুব কমই ছিল। তাঁহার অত্যধিক ভাবপ্রবণ মনের অলীক কল্পনা হইতেই 'পবিত্র-চুক্তি'র উদ্ভব হয়। এই চুক্তি স্থাপনের ধারণা তাঁহার নিজস্ব নহে। দুই শতাব্দী পূর্বে ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরী 'গ্র্যাণ্ড ডিজাইন' (Grand Design) নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ নাকি তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। চতুর্থ হেনরীর 'গ্র্যাণ্ড ডিজাইন' অনুসারে ইওরোপীয় বিভিন্ন দেশের মোট ৬৬ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি সিনেট বা সাধারণ সভা (Senate or General Council) স্থাপনের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। এই সাধারণ সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপ মহাদেশে অনাবিল শান্তি বজায় রাখা ও ইওরোপীয় রাজগণের মধ্যে এক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।* কিন্তু হেনরীর আকস্মিক মৃত্যুতে (১৬১০) এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাও কার্যকরী হয় নাই। এই সকল পূর্ব-পরিকল্পনার ইতিহাস আলেকজাণ্ডারের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনের পূর্ব-পূর্ব পরি-কল্পনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার আলেকজাণ্ডার এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে উদ্যোগী হন। ভিয়েনা সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই তিনি মিত্র-শক্তিবর্গের—অর্থাৎ যে-সকল দেশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের সম্মুখে এই পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সহিত এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হন যে, যুদ্ধ শেষ হইলে ইওরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুগ্মভাবে

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের শান্তিরক্ষার পরিকল্পনা

* "...to deliver them for ever from the fear of bloody catastrophes so common in Europe ; to secure for them an unalterable repose, so that all the Princes might henceforth live together as brothers". Sully Quoted by Lipson, *Europe in the 19th and the 20th Centuries*. P. 214.

ইংলণ্ডের সহিত চুক্তি সম্পাদন

ইওরোপের শান্তি রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। স্বভাবতই ভিয়েনা সম্মেলনে জার আলেকজাণ্ডার তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সুযোগ পাইলেন।

'পবিত্র-চুক্তি' নামে এক চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে, ন্যায়, দয়া ও শান্তি—খ্রীষ্টধর্মের এই তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া ইওরোপীয় রাজগণ তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণ করিবেন। চুক্তিবদ্ধ সকল রাজা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন;

পবিত্র চুক্তির শর্ত

তাঁহারা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় বিবেচনা করিবেন এবং নিজ নিজ প্রজাবর্গকে পুত্রের ন্যায় দেখিবেন।* জার আলেকজাণ্ডার পরিকল্পিত 'পবিত্র-চুক্তি' প্রথমে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া

পবিত্র-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে ইংলণ্ডের অস্বীকৃতি

কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। ইংলণ্ড ইহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইল, কারণ ব্রিটিশ সরকার 'পবিত্র-চুক্তি'র অস্পষ্ট, অবাস্তব শর্তাদি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলেন না।† ইংলণ্ড ছাড়া তুর্কী সুলতান এবং পোপও এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অপরাপর প্রতিনিধিবর্গ জার আলেকজাণ্ডারের মনস্তুষ্টির জন্যই ইহা স্বাক্ষর করিলেন।

পবিত্র-চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া—এই তিনটি স্বৈরাচারী দেশ এই চুক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক

পবিত্র-চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ

হওয়াতে ইহা ইওরোপের জনগণের স্বাধীনতা বিনাশের এক রহস্যাবৃত যন্ত্র বলিয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইল। কিন্তু পবিত্র-চুক্তির পশ্চাতে এইরূপ উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না। উপরন্তু জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় দেশগুলিতে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের আদর্শ 'পবিত্র-চুক্তি'র বহির্ভূত নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

---

* "The Holy Alliance seemed to imply nothing more than that sovereigns were henceforth to regard each other as brothers 'united by the bonds of true and indissoluble fraternity' and their subjects as their children whom they were to rule 'as fathers of families'." *Ibid.* p. 215.

† "The English Government withheld its signature, declining to stultify its freedom of action by taking part in a vague and shadowy project which bound the contracting monarchs on all occasions and in all places to lend each other aid and assistance". *Ibid.* p. 215.

'The Holy Alliance was not a treaty; it was a solemn declaration initiated by Alexander and affirmed by the Sovereigns of Europe with varying degrees of seriousness.' D. M. Ketelbey; *A History of Modern Europe*, p. 149.

(১) পবিত্র-চুক্তি নৈতিকতা, ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরিচালিত করিতে এবং (২) ইওরোপীয় রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল। (৩) রাজগণ পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকিবেন এবং (৪) উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিবেন। উদ্দেশ্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে পবিত্র-চুক্তির উদ্দেশ্য মহৎ ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত ছিল; স্বভাবতই বস্তুবাদী জগতে উহার স্থান ছিল না। এই চুক্তি সম্পর্কে সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য উল্লেখ করিলেই পবিত্র-চুক্তির স্বরূপ বুঝা যাইবে। অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রিন্স্ মেটারনিক্ এই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই ইহাকে 'অর্থহীন বাগাড়ম্বর' (Loud-sounding nothing), 'নীতি-জ্ঞানের বাহ্যাড়ম্বর' (moral demonstration) বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। ক্যাসালরি ইহাকে 'আদর্শবাদী, অর্থহীন রহস্যাবৃত বাক্যবিন্যাস' (a piece of sublime mysticism and nonsense) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পবিত্র-চুক্তির উদ্দেশ্য : (১) আন্তর্জাতিক কূটনীতি, সততা, ন্যায় ও নৈতিকতার ভিত্তিতে স্থাপন করা, (২) নীতি-সম্মত রাজনীতি, (৩) পরস্পর সাহায্য ও সহায়তা, (৪) উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা

সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য

প্রকৃতপক্ষে 'পবিত্র-চুক্তি' (Holy Alliance)-কে 'চুক্তি' নামে অভিহিত করা যায় না। ইহাকে একটি 'পবিত্র ঘোষণা' হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। কোন সন্ধি বা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারিগণ সাধারণতঃ কতকগুলি নিশ্চিত দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ইহা ভিন্ন সন্ধি বা চুক্তি মাত্রেরই উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট থাকে এবং কতকগুলি নিশ্চিত বাস্তব সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'পবিত্র-চুক্তি'র ক্ষেত্রে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা বা বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কতকগুলি অবাস্তব আদর্শ-সম্বলিত উচ্ছ্বাস এই চুক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে একমাত্র প্রথম আলেকজাণ্ডার নিষ্ঠার সহিত এই চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্বাক্ষরকারিগণের অকপট আনুগত্য ইহাতে ছিল না। কেবলমাত্র আলেকজাণ্ডারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তাঁহারা এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

পবিত্র-চুক্তির প্রকৃতি

পবিত্র-চুক্তি—পবিত্রও নহে, চুক্তিও নহে

পবিত্র-চুক্তি না ছিল 'পবিত্র' ; না ছিল 'চুক্তি'। ইহা ছিল একটি ঘোষণাপত্র। স্বাক্ষরকারিগণ যাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন না তাহা আলেকজাণ্ডারের সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ইহার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। অপর-দিকে 'চুক্তি' স্থাপনের জন্য যে নিশ্চয়তা ও বাস্তবতার প্রয়োজন তাহাও এই চুক্তিতে ছিল না।

পবিত্র-চুক্তির বিফলতার কারণ :
(১) অবাস্তবতা ও অনিশ্চয়তা,
(২) ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত,
(৩) অকপট আনু-গত্যের অভাব

'পবিত্র-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার মুহূর্ত হইতেই বিফলতায় পর্যবসিত হইল। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আলেকজাণ্ডার 'পবিত্র-চুক্তি'-কে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলেন না।* পবিত্র-চুক্তির বিফলতার প্রধান কারণই ছিল (১) ইহার অনিশ্চয়তা ও অবাস্তবতা। (২) ইংলণ্ড ছিল সেই সময়কার সর্বপ্রধান শক্তি। ইংলণ্ড কর্তৃক এই চুক্তি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে ইহার বিফলতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। (৩) আলেকজাণ্ডার ভিন্ন অপর কেহই অকপটভাবে এই চুক্তি গ্রহণ করেন নাই ; স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ইহার আদর্শ মানিয়া চলিবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। সুতরাং 'পবিত্র-চুক্তি'-র নাম ভিয়েনা সম্মেলনের পরবর্তী যুগে পরিচিতি লাভ করিলেও ঐ সময়ের রাজনীতিতে ইহা কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

চতুঃশক্তি-চুক্তি (Quadruple Alliance) :

চতুঃশক্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত

ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে চতুঃশক্তি-চুক্তি

পবিত্র-চুক্তির অবাস্তবতার জন্য স্বভাবতই ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি রক্ষার দায়িত্ব অপর একটি শক্তি-সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত হইল। ইহা 'চতুঃশক্তি-চুক্তি' (Quadruple Alliance) নামে পরিচিত। অস্ট্রিয়ার প্রিন্স্ মেটারনিক্-এর চেষ্টায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পবিত্র-চুক্তির ন্যায় অনিশ্চিত ও অবাস্তব চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেও ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করিতে এবং ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে ইংলণ্ড ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত যোগদানে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং মেটারনিকের চেষ্টায় ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া

* "All Alexander's efforts were unavailing to provide the transparent of the Holy Alliance with a body". Lipson. p. 216.

এই চারিটি দেশের মধ্যে চতুঃশক্তি-চুক্তি সম্পন্ন হইল। কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of Europe) বলিতে পবিত্র-চুক্তি ও চতুঃশক্তি-চুক্তি উভয় সংগঠন বুঝাইলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে উহা চতুঃশক্তি-চুক্তির কার্যকলাপই বুঝাইয়া থাকে। চতুঃশক্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপই হইল ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)-এর উদ্দেশ্য ও কার্য।

চতুঃশক্তি-চুক্তিই প্রকৃত ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়

চতুঃশক্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল (১) ভিয়েনা ও সংশ্লিষ্ট সন্ধিগুলির শর্তাদি রক্ষা করা, (২) ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য বিপদ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করা; অর্থাৎ বিপ্লবের প্রভাব যাহাতে পুনরায় ফ্রান্সকে আলোড়িত করিতে না পারে এবং ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলির স্বাধীনতা যাহাতে বিপন্ন না হয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। (৩) এই চুক্তির ষষ্ঠ শর্তে স্থির করা হয় যে, চতুঃশক্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিগণ পরস্পর সৌহার্দ্য-বৃদ্ধি এবং ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া উহার যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য কিছুকাল অন্তর অন্তর সম্মেলনে সমবেত হইবেন। এইভাবে চতুঃশক্তি-চুক্তির মাধ্যমে ইওরোপের আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের এক কার্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। ইহাই হইল ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের প্রকৃত ভিত্তি।

চতুঃশক্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য : (১) ভিয়েনা চুক্তি রক্ষা করা, (২) ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা, (৩) মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া পরিস্থিতি বিবেচনার ব্যবস্থা

এই-লা-স্যাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক ও ভেরোনা'র কংগ্রেস (Congresses of Aix-la-Chapelle, Troppeau, Laibach & Verona) :

চতুঃশক্তি-চুক্তির ষষ্ঠ শর্তানুযায়ী কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর আরও চারিটি কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া—এই চারিটি শক্তির উপরই ইওরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িল।

চতুঃশক্তি-চুক্তি বা ইওরোপীয় কন্‌সার্টের চারিটি অধিবেশন

এই-লা-স্যাপেল-এর কংগ্রেস, ১৮১৮ (Congress of Aix-la-Chapelle, 1818) :

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপেল নামক স্থানে চতুঃশক্তি-চুক্তির স্বাক্ষরকারিগণ সমবেত হইলেন। ইহা ছিল ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সর্বপ্রথম কংগ্রেস। এই সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গ বিভিন্ন ধরণের কার্য সম্পাদন করিলেন। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর তাঁহাদের আধিপত্য অত্যধিক প্রতিফলিত হইল। এই শক্তি-সমবায় (Concert) সর্বসম্মতিক্রমে ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্তার মর্যাদা প্রাপ্ত হইল। সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক এই কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানাইল। হেসি (Hesse) নামক স্থানের 'ইলেক্টর' 'রাজা' উপাধি-লাভের জন্য এই কংগ্রেসের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। জার্মানির রাজগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। মোনাকো (Monaco) নামক স্থানের জনসাধারণ তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকার দাবি করিল। ব্যাডেন (Baden) নামক স্থানের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ইহুদিদের নাগরিক অধিকারের প্রশ্নও এই কংগ্রেসের সম্মুখে উত্থাপিত হইল। কংগ্রেস বা ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় জার্মান রাজগণের অভিযোগের মীমাংসা করিল, এমন কি সুইডেনের রাজাকে শাসাইতেও দ্বিধাবোধ করিল না।

এই-লা-স্যাপেল-এর অধিবেশন (১৮১৮)

বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সমাধান: কংগ্রেস ইওরোপের ভাগ্য-নিয়ন্তাস্বরূপ:

(১) সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের আবেদন,

(২) হেসি'র ইলেক্টরের 'রাজা' উপাধি প্রার্থনা

(৩) জার্মানির রাজগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা

(৪) মোনাকোর অধিবাসীদের অভিযোগ,

(৫) ব্যাডেন ও ইহুদিদের প্রশ্ন

এইভাবে নানাবিধ সমস্যার সমাধান করিয়া কংগ্রেস ইওরোপের উপর এক নৈতিক আধিপত্য লাভ করিল। ফ্রান্সকে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe)-এর সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইল। ফ্রান্স হইতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই দেখিয়া ফ্রান্সে মোতায়েন মিত্রশক্তির সৈন্য অপসারণ করা হইল। এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিবর্গ পরস্পর সহযোগিতা প্রদর্শন করিলেও এই সহযোগিতার পশ্চাতে মতানৈক্যও দেখা দিল। প্রতিনিধিবর্গ অপরাপর দেশের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তৎপরতা দেখাইলেও যখনই নিজ স্বার্থে আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল তখনই তাঁহারা সেই সমস্যা এড়াইয়া গেলেন। দাস-ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড পরস্পর পরস্পরের জাহাজ তল্লাসের প্রস্তাব করিলে এই প্রস্তাব

ফ্রান্সকে ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সদস্যরূপে গ্রহণ

সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য

দাস-ব্যবসায় নিবারণের প্রশ্ন

গৃহীত হইল না। অপর দিকে ভূমধ্যসাগর হইতে জলদস্যুতা-নিবারণের জন্য রাশিয়া নৌবহর দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও ইংলণ্ড তাহাতে স্বীকৃত হইল না, কারণ জলদস্যুগণ ইংরেজ পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত। ইহা ভিন্ন মেটারনিক্ রুশ-ফরাসী মৈত্রীর কাল্পনিক ভয়ে ভীত ছিলেন। এইভাবে পারস্পরিক সন্দেহের মধ্য দিয়া অদূরভবিষ্যতে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের পতনের পথ প্রস্তুত হইতেছিল। এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞদের সন্দেহ। অপর দিকে, জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সংগঠনকে আরও ব্যাপক করিতে চাহিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইওরোপীয় শক্তিগুলির (১) পরস্পর পরস্পরের রাজ্যসীমা ও সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলিবার এবং (২) প্রয়োজনবোধে একদেশে বিপ্লবাত্মক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে অপরাপর দেশ উহা দমনে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। একটি ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি এই নীতি মানিয়া লইলে ইওরোপের শান্তিরক্ষা সহজ হইবে, এই ছিল তাঁহার ধারণা। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া আলেকজাণ্ডারের প্রস্তাব-গ্রহণে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ক্রমেই স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ইংলণ্ড তাহার প্রতিবাদ করিলে শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণা-পত্র প্রত্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কোন্ পথে চলিতেছে তাহার ইঙ্গিত এই ঘোষণা-পত্র হইতেই অনুমান করা যায়।

জলদস্যুতা-দমনের প্রশ্ন

পারস্পরিক সন্দেহ

জার আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ইওরোপীয় কন্‌সার্টকে ব্যাপক করিবার প্রস্তাব

ইওরোপীয় কন্‌সার্টের স্বৈরাচারী প্রকৃতি

ট্রপো'র কংগ্রেস, ১৮২০ (Congress of Troppeau, 1820) :

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রপো (Troppeau) নামক স্থানে ইওরোপীয় কন্‌সার্টের দ্বিতীয় অধিবেশন বসিল। এই-লা-স্যাপেল্-এর কংগ্রেসে সদস্যবর্গের মধ্যে মতানৈক্য ও পরস্পর সন্দেহ কতক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেকথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ট্রপো'র কংগ্রেসে সদস্যবর্গের মতানৈক্য প্রকাশ্য বিরোধিতায় পরিণত হইল। ট্রপো কংগ্রেসের সম্মুখীন সমস্যা ছিল তিনটি : (১) স্পেনবাসী বুর্‌বোঁ বংশীয় রাজা সপ্তম ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উদারনৈতিক

(১) ট্রপোর কংগ্রেস (Congress of Troppeau)

স্পেনীয়-সমস্যা

শাসনব্যবস্থা-স্থাপনে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল। ফার্ডিনাণ্ড ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। (২) ন্যাপল্‌স্‌-এর রাজা প্রথম ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধেও অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। (৩) পোর্তুগালের রাজা ষষ্ঠ জনের বিরুদ্ধে তথাকার জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম ফার্ডিনাণ্ড ও ষষ্ঠ জন ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাইডমণ্ট রাজ্যেও অচিরেই বিপ্লব সংঘটিত হইতে চলিয়াছিল।

ন্যাপল্‌স্‌-সমস্যা

পোর্তুগাল-সমস্যা

স্পেনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জার আলেকজাণ্ডার ইওরোপীয় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত স্পেনীয়দের বিপ্লব দমন করিবার উদ্দেশ্যে দেড় হাজার রুশ সৈন্য অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্য দিয়া স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড-এর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে চাহিলেন। রুশ শক্তি এইভাবে পশ্চিম ইওরোপে প্রাধান্য অর্জন করুক ইহা মেটারনিকের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তিনি স্পেনীয় বিদ্রোহ তেমন মারাত্মক কিছু নয় এই অজুহাতে রুশ সৈন্য প্রেরণ বা কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানে রাজী হইলেন না। কিন্তু ন্যাপল্‌সের বিদ্রোহ মেটারনিকেরও ভীতির সঞ্চার করিল। দক্ষিণ ইতালিতে বিদ্রোহ শুরু হইলে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধীন রাজ্যাংশেও বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িবে, সেই আশঙ্কায় মেটারনিক ন্যাপল্‌সকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে পরিস্থিতিতে তিনি স্পেনের বিদ্রোহে হস্তক্ষেপে রাজী হন নাই, ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে তিনি ন্যাপল্‌সের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহা তাঁহার সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। মেটারনিক নিজ স্বার্থেই ট্রপো-র কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জার্মানিতে কট্‌জেবু (Kotzebue)'র হত্যাকাণ্ডের ফলে জার আলেকজাণ্ডারেরও উদার মতবাদের পরিবর্তন ঘটিল। ইওরোপের শান্তি রক্ষার জন্য বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ দমন করা প্রয়োজন এবং এইজন্য শান্তিপূর্ণভাবে এমনকি প্রয়োজনবোধে সামরিক সাহায্যেও ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পক্ষে যে-কোন দেশের আভ্যন্তরীণ উদারনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করা উচিত, এবিষয়ে আলেক্‌জাণ্ডার প্রিন্স মেটারনিকের মত মানিয়া লইলেন। 'প্রটোকোল অব ট্রপো' (Protocol of Troppeau) নামে এক ঘোষণা-

জার আলেকজাণ্ডার ও মেটারনিকের মতৈক্য

'ট্রপোর প্রোটোকোল' (Protocol of Troppeau)

পত্র প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে, কোন দেশে যদি বিপ্লবাত্মক আন্দোলন দেখা দেয় কিংবা বিপ্লবাত্মক কার্যাদির ফলে সেই দেশের রাজা যদি উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করিতে বাধ্য হন এবং তাহার ফলে যদি অপর দেশের শান্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে ঐ দেশ ইওরোপীয় কন্সার্টের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহার আভ্যন্তরীণ শান্তিস্থাপনের জন্য ইওরোপীয় কন্সার্ট সামরিক বা বেসামরিক সাহায্য দান করিবে। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি ক্যাসালরি এইরূপ পন্থা অবলম্বনের বিরোধিতা করিলেন। গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডের পক্ষে বহিঃশক্তির সামরিক সাহায্যে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। ঐ সময় হইতে ইংলণ্ড ইওরোপীয় কন্সার্ট সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করিলেও তখন হইতেই ইংলণ্ড ইওরোপীয় কন্সার্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। ফ্রান্সও ট্রপো'র প্রোটোকোল গ্রহণ করিল না। কিন্তু স্পেনে পুনরায় বিপ্লবাত্মক গোলযোগ শুরু হইলে এবং স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে স্পেনে বুর্বোঁ আধিপত্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিতে রাজী হইল। এদিকে গ্রীকরা তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু মেটারনিক ইহার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করিলেন না।

ইংলণ্ডের প্রতিনিধি ক্যাসালরির তীব্র প্রতিবাদ

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রোটোকোল-গ্রহণে অমত

স্পেনের বিদ্রোহ: ফরাসী মতের পরিবর্তন

লাইব্যাক-এর কংগ্রেস, ১৮২১ (Congress of Laibach):

ট্রপো'র কংগ্রেসের সম্মুখীন সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধানের পূর্বেই উহার অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। লাইব্যাক-এর অধিবেশনে সেগুলির সমাধান করা হইল। ন্যাপল্সের সিংহাসনে ফার্ডিনাণ্ডকে পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়াকে সসৈন্যে অগ্রসর হইবার অধিকার দেওয়া হইল। মেটারনিক কালবিলম্ব না করিয়া ফার্ডিনাণ্ডকে ন্যাপল্সের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে পাইডমণ্ট্-এ বিদ্রোহ দেখা দিলে মেটারনিক উহাও দমন করিলেন। ফলে ইতালিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অব্যাহত রহিল।

ন্যাপল্সে মেটারনিকের হস্তক্ষেপ

ভেরোনার কংগ্রেস, ১৮২২ (Congress of Verona):

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভেরোনা (Verona)-এর কংগ্রেসে গ্রীস ও স্পেনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। ইংলণ্ড গ্রীকদের স্বাধীনতার ব্যাপারে উৎসুক ছিল। এই জন্য ইংরেজ সরকার এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। ফ্রান্সের স্বার্থ স্পেনের রাজপরিবারের সহিত জড়িত থাকায় স্বভাবতঃই ফ্রান্স এই কংগ্রেসে যোগদান করিল। ভেরোনার অধিবেশনে স্পেন সম্পর্কে কোন যুগ্ম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। স্পেনের বিদ্রোহ দমনের সাহায্য দানের ভার ফ্রান্সের উপর ন্যস্ত করা হইল। স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশ-গুলিকে দমন করিবার জন্য কন্‌সার্ট কর্তৃক স্পেনকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ইংলণ্ড আপত্তি জানাইল এবং এককভাবে স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশ-গুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া হইল। এইভাবে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে ফ্রান্সের সাহায্যে স্পেনে পুনরায় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্ট যখন স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলি দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল তখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জেমস্‌ মন্‌রো (President Monroe) তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো নীতি' (Monroe Doctrine) ঘোষণা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮২৩)। মার্কিন কংগ্রেসের নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো স্পষ্টভাবেই একথা ঘোষণা করিলেন যে, ইওরোপীয় কোন শক্তি কর্তৃক দক্ষিণ আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশে হস্তক্ষেপ অথবা ইওরোপীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমেরিকার কোন অংশে প্রয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করিবে না। এইরূপ কার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইবে।*

(৩) ভেরোনা'র কংগ্রেস (Congress of Verona)

ইংলণ্ড কর্তৃক কংগ্রেস ত্যাগ : আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত

'মন্‌রো নীতি' (Monroe Doctrine)

আমেরিকা কর্তৃক স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত

* "We should consider any attempt on the part of these absolute monarchies of Europe 'to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety', and we could not view any interposition for the purpose of oppressing the South American States' or controlling in any other manner their destiny, by any European power, in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States."—*Monroe Doctrine*, Vide Hazen, p. 51.

আমেরিকা ঐ সকল বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল।

ইওরোপীয় কন্‌সার্টের প্রকৃতি (Character of the European Concert):

ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ইওরোপের জনগণের প্রতিনিধি অথবা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী সদস্যবর্গের সংগঠন ছিল না। ইহা ছিল ইওরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের একটি ঐক্যবন্ধন। একমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর সদস্য-রাষ্ট্র মাত্রই ছিল স্বৈরাচারে বিশ্বাসী। এই কন্‌সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের প্রকৃতির এক অদ্ভুত বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইওরোপীয় কন্‌সার্ট যখন প্রথম সংগঠিত হয়, তখন ইহার উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করা। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ ছিল ইওরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু এই-লা-স্যাপেলের কংগ্রেস হইতে ইহা ক্রমেই প্রমাণিত হইল যে, যদিও এই শক্তি-সমবায় বা কন্‌সার্ট-এর সদস্যগণ সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা করিবেন বলিয়া ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি নিজ নিজ স্বার্থের বিরোধী কোন কিছুই তাঁহারা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; দাস-ব্যবসায় বন্ধ করা এবং ভূ-মধ্যসাগরে জলদস্যুতা নিবারণের প্রশ্ন লইয়া সদস্যবর্গের মতভেদ এই মনোবৃত্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-বর্গের ঐক্যবন্ধন

এই-লা-স্যাপেল-এর কংগ্রেস হইতেই কন্‌সার্টের স্বার্থ-পরতার নীতি গ্রহণ

ট্রপো'র কংগ্রেসের সময় হইতে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট এক আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীতে পরিণতি লাভ করে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সর্বপ্রকার প্রকাশকে বলপূর্বক রুদ্ধ করিয়া ভিয়েনার ও তৎ-সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলির শর্তাদি পালন করা। ঐ সময় হইতেই গণ-তান্ত্রিক ইংলণ্ডের পক্ষে কন্‌সার্টের মত মানিয়া চলা সম্ভব হয় নাই। মেটারনিকের হস্তে এই সংগঠনটি সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আশা ও আদর্শের মূল উৎপাটনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করাই ছিল এই সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কন্‌সার্ট আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীতে পরিণত

কন্‌সার্ট গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি প্রগতিশীল আশা ও আদর্শ দমনের যন্ত্রবিশেষ

/ ইওরোপীয় কন্‌সার্টের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Concert of Europe) :

ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের বিফলতার কারণ উহার সংগঠন, প্রকৃতি ও কার্যকলাপের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। প্রথমতঃ, ইহা ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলির সঙ্ঘবিশেষ। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি ছিল স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে এইরূপ রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতি ঘৃণা উপজাত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপীয় কন্‌সার্টের মূল ভিত্তি গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিল। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ভাবধারাকে উপেক্ষা করিয়া যে-শক্তি-সমবায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত উহার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব-প্রসূত জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ইতিহাসের ইঙ্গিত অমান্য করিতে চাহিয়াছিল। প্রাক্‌-বিপ্লবের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে পুনরায় স্থাপন করিবার প্রয়াস স্বভাবতঃই সাফল্য লাভ করিল না। মূল-উৎপাটিত বৃক্ষকে কৃত্রিম উপায়ে সাময়িকভাবে সজীব রাখা সম্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত ইহা শুকাইয়া যাইবেই—ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থার পুনঃস্থাপনের চেষ্টাও ঐরূপ অবাস্তবতাহেতু বিফল হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সদস্যরাষ্ট্রের স্বার্থের বিভিন্নতা তাহাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বা অন্য কোনও প্রকার স্বার্থের ঐক্য তাহাদের মধ্যে ছিল না। বিপ্লবের বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা ছিল তাহাদের পরস্পর ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি। এই কারণে ইংলণ্ডের সহযোগিতা তাহাতে ছিল না। ক্রমে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট প্রতিক্রিয়াশীল তিনটি রাষ্ট্রের—অস্ট্রিয়া রাশিয়া ও প্রাশিয়া—এক সংকীর্ণ স্বার্থপর সঙ্ঘে পরিণত হয়। চতুর্থতঃ, সদস্য-রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতার জন্যও এই শক্তি-সমবায় বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল—অপর রাষ্ট্রের

(১) স্বৈরাচারী রাষ্ট্রসঙ্ঘ

(২) ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার বিরোধী

(৩) সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের অনৈক্য

(৪) সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতা

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা (Non-intervention); কিন্তু অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া এমন কি, স্পেনের বিদ্রোহের ব্যাপারে ফ্রান্সও, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যের প্রধান নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ট্রপো'র প্রোটোকোল এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

(৫) ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পতনোন্মুখতা : ইংলণ্ড কর্তৃক ট্রপো'র প্রোটোকোল প্রত্যাখ্যান ইংলণ্ড ও আমেরিকা কর্তৃক স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার, মন্‌রো নীতি

পঞ্চমতঃ, ট্রপো'র প্রোটোকোল ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় হইতেই ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পতন শুরু হয়। ভেরোনা'র কংগ্রেসে ইংলণ্ড কর্তৃক আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকৃতি ও ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ত্যাগ উহার পতনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সর্বোপরি 'মন্‌রো নীতি' ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পতন অনিবার্য করিয়া দিয়াছিল। তথাপি আরও কিছুকাল ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইওরোপীয় কন্‌সার্টের ধারণা বাঁচিয়া ছিল।

(৬) সেণ্ট পিটার্সবার্গে ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যুগ্ম চেষ্টায় রাশিয়ার অনাস্থা

ষষ্ঠতঃ, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-তুরস্কের সমস্যা সমাধানের জন্য জার আলেকজাণ্ডার সেণ্ট্‌ পিটার্সবার্গে পর পর দুইটি ইওরোপীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সম্মেলনেই সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। জার আলেকজাণ্ডার ঐ সময় হইতে ইওরোপীয় কন্‌সার্টের উপর বিশ্বাস হারাইয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ঘোষণা করেন যে, রুশ-তুরস্কের সমস্যা—অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের সমস্যার (Eastern Question) সমাধানে রাশিয়া কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ ও বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইওরোপীয় কন্‌সার্ট হইতে রাশিয়ার অপসরণ কন্‌সার্ট বা শক্তি-সমবায়ের পতনের শেষ অধ্যায় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহার পরেও অবশ্য হল্যাণ্ড-বেলজিয়ামের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 'কনভেন্‌শন অব লণ্ডন' (Convention of London) নামে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এক বৈঠক বসিয়াছিল। ইহাতে হল্যাণ্ড কর্তৃক বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

হল্যাণ্ড-বেলজিয়াম সমস্যা : লণ্ডন কনভেন্‌শন—বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত

সর্বশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, অত্যাচার ও দমননীতির দ্বারা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ ইওরোপীয় দেশগুলিকে দীর্ঘকাল পদানত রাখা সম্ভব হইল না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিলে ইওরোপের সর্বত্র উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। মেটারনিক এই বিপ্লব দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে (ফেব্রুয়ারী) ফরাসী বিপ্লবের বন্যায় মেটারনিক স্বয়ং ভাসিয়া গেলেন। ইওরোপীয় কন্‌সার্টের আন্তর্জাতিক পুলিশী কাজের প্রধান নিয়ন্তা মেটারনিকের পতন ঘটিল। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

(৭) জুলাই বিপ্লব, ১৮৩০

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, ১৮৪৮

Questions & Hints

1. "The Holy Alliance was not a treaty." fail? (C. U., 1946, 1949)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভিয়েনা চুক্তি কার্যকরী করা ও ইওরোপে শান্তিরক্ষার জন্য রাশিয়ার জার আলেক্‌জাণ্ডারের চেষ্টায় 'পবিত্র-চুক্তি' বা Holy Alliance স্বাক্ষরিত হয় ; (২) খ্রীষ্টধর্মের তিনটি মূল-নীতি—ন্যায়, দয়া ও শান্তির উপর ভিত্তি করিয়া আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা ; (৩) রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া কর্তৃক 'পবিত্র-চুক্তি' গৃহীত—ইংলণ্ড, পোপ ও তুরস্ক ভিন্ন অপরাপর দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ; (৪) পবিত্র-চুক্তির উদ্দেশ্য : (ক) আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে সততা, ন্যায় ও নৈতিকতার উপর স্থাপন করা, (খ) নীতি-সম্মত রাজনীতি, (গ) পরস্পরের সহায়তা, (ঘ) উদারনৈতিক সহায়তা ; (৫) অকপটভাবে কেহই এই চুক্তি গ্রহণ করে নাই—সমসাময়িক রাজনীতিকদের মন্তব্য ; (৬) পবিত্র-চুক্তির প্রকৃতি : ইহাকে 'চুক্তি' বলা যায় না : (ক) এই চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের উপর নিশ্চিত দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া থাকে—উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিশ্চিত ও বাস্তব-সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হয়—পবিত্র-চুক্তির ক্ষেত্রে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা

বা বাস্তবতার পরিচয় নাই ; (খ) অবাস্তব আদর্শের উচ্ছ্বাস মাত্র ; (৭) বিফলতার কারণ : (ক) অবাস্তবতা ও অনিশ্চয়তা, (খ) ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, (গ) অকপট আনুগত্যের অভাব। ১৭-২০ পৃষ্ঠা]

2. Describe the history of the Holy Alliance and the Quadruple Alliance and explain the causes of their failure. (C.U.1951)

[উত্তর-সংকেত : প্রথম অংশের উত্তর ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ ; দ্বিতীয় অংশের উত্তর-সংকেত : (১) পবিত্র-চুক্তির অবাস্তবতার জন্য চতুঃশক্তি নামে একটি কার্যকরী শক্তি-সমবায় স্থাপিত হইল, কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ বলিতে প্রকৃত ক্ষেত্রে চতুঃশক্তি-চুক্তিকেই বুঝায় ; (২) ইহার উদ্দেশ্য : (ক) ভিয়েনা চুক্তি রক্ষা করা, (খ) ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা, (গ) কিছুকাল অন্তর অন্তর মিলিত হইয়া পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (ঘ) এই-লা-স্যাপেল্‌, ট্রপো, লাইবেক্‌ ও ভেরোনা—চারিটি অধিবেশন ; (এই চারিটি অধিবেশনের উল্লেখ করিলেই চলিবে—বিশদ আলোচনা করিতে হইবে না) ; (৩) বিফলতার কারণ : (ক) স্বৈরাচারী রাষ্ট্রসঙ্ঘ, (খ) ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার বিরোধী, (গ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের বিভিন্নতা, (ঘ) রাজনৈতিক ধারণার বিভিন্নতা, (ঙ) ট্রপো'র প্রোটোকোল ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, (চ) স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ইংলণ্ড ও আমেরিকা কর্তৃক স্বীকৃত, (ছ) 'মন্‌রো নীতি', (জ) জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব। ২০-২৬ পৃষ্ঠা]

3. Why did the different European Congresses, which met after the Congress of Vienna, fail to achieve their purpose ? (C.U. 1953)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি রক্ষা ও ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য ইওরোপীয় কন্‌সার্ট্‌ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপে্‌ল, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রপো, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্যাক্‌ ও ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভেরোনা নামক স্থানে অধিবেশনে মিলিত হয় ; (২) (ক) এই-লা-স্যাপে্‌ল অধিবেশনে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট এক নৈতিক আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হয়, (খ) সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব—দাস-ব্যবসায় ও জলদস্যুতা-

নিবারণে পরস্পরের মতানৈক্য ও সন্দেহ ; (৩) ট্রপো ও লাইব্যাকের অধিবেশনে ইংলণ্ডের বিরোধিতা—প্রোটোকোল-অব-ট্রপো—অপরাপর দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের নীতি-গ্রহণ ; (৪) ভেরোনার অধিবেশনের অকৃতকার্যতা—আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা আমেরিকা ও ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত ; (৫) ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পিটার্সবার্গে ইওরোপীয় বৈঠক—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শন—ইওরোপীয় কন্‌সার্টের শেষ অধিবেশন হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে ; (৬) বিফলতার কারণ : ২নং উত্তর-সংকেতে দ্রষ্টব্য। ২১-২৬ পৃষ্ঠা]

4. What were the principles underlying the consitution (formation) of the Holy Alliance? How do you account for its failure to realise its ideals? (C.U. 1956)

[উত্তর-সংকেত ১নং প্রশ্নের অনুরূপ। ১৭-২০ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসী-বিপ্লবোত্তর যুগে ইওরোপ (১৮১৫-৪৮)

(Europe after the French Revolution, 1815-48)

ভিয়েনা সম্মেলন হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত (১৮৪৮) যে-যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, ঐ সময়ে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা প্রাধান্য লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। একটি ধারা ছিল স্বৈরতন্ত্রের, অপরটি ছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের। মেটারনিকের নেতৃত্বে ইওরোপীয় কনসার্ট চাহিয়াছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি যাবতীয় উদারনৈতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিতে; অপরদিকে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ চাহিয়াছিল কৃত্রিম উপায়ে পুনরুজ্জীবিত স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিতে। সম্মুখ সংগ্রামে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ জয়ী না হইলেও আপাতদৃষ্টির অন্তরালে সেইযুগে উদারনৈতিক ধারা এক সর্বজয়ী শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারা: (১) স্বৈরতন্ত্র, (২) গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

ফ্রান্স (১৮১৫-৪৮) (France, 1815-48):

বিপ্লবের উৎপত্তিস্থান ফরাসীদেশ ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে পরবর্তী যুগেও ফরাসী দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক ফরাসী-দেশে বুর্‌বোঁ শাসনের পুনঃস্থাপন স্বভাবতই বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত ফরাসী জাতির মনঃপূত হইল না। অষ্টাদশ লুই-এর সিংহাসন-লাভে কায়েমী স্বার্থের (vested interest) পুনঃস্থাপন, নির্বাসিত রাজতান্ত্রিকদের পুনরাগমন ও পূর্বেকার প্রাধান্যলাভের আশঙ্কা তাহাদের মনে স্বভাবতই জাগিয়া উঠিল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন ফরাসী জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইল। ফলে ফরাসী জাতি উগ্র রাজতান্ত্রিক ও বিপ্লববাদী—এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ চাহিল ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিতে এবং রাষ্ট্র ও চার্চের ঐক্যের ভিত্তিতে রাজতন্ত্র ও

বুর্‌বোঁ রাজবংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা: ফরাসী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী

ফরাসী জাতি উগ্র রাজতান্ত্রিক ও বিপ্লব-বাদী—দুইদলে বিভক্ত

ধর্মকে পূর্ব-মর্যাদায় ফিরাইয়া আনিতে। ধর্ম-শিক্ষার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ফিরাইয়া আনিবার এবং জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অনুকূলে গড়িয়া তুলিবার ভার পড়িল চার্চের উপর। উগ্র রাজতান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায় পুনঃস্থাপিত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে চাহিল তাহাদের হৃত সম্পত্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে।

যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের চেষ্টা

বুর্বোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসন লাভের পূর্বে মিত্রশক্তি, বিশেষত জার আলেকজাণ্ডারের নির্বন্ধতায় তাঁহাকে এক সনন্দ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা (Ancient regime) ত্যাগ করিয়া নিয়মানুগ রাজতন্ত্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল। এই সনন্দে মানুষের মধ্যে সমতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, সরকারী পদ-লাভের সমান অধিকার, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচনমূলক আইনসভা প্রভৃতি উদার-নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু অপর দিকে বিপ্লব-প্রভাবিত ফরাসী জনসাধারণ বিপ্লবের আতিশয্য না চাহিলেও বিপ্লব-প্রসূত সুফলগুলিকে রক্ষা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিল। তাহারা রাজতন্ত্রের সহিত বিপ্লব এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম-নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

অষ্টাদশ লুই-এর সনন্দ:

শর্ত: সাম্য, ধর্ম-পালনের ও সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচন-মূলক আইন সভা, সরকারী পদ-লাভের সমান অধিকার

উগ্র-রাজতান্ত্রিকদের স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের ইচ্ছা; জনসাধারণ বিপ্লবের সুফল রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

অষ্টাদশ লুই (১৮১৫-২৪) (Louis XVIII):

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ লুই-এর ফরাসী সিংহাসনলাভের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সূচনা হইল। লুই তাঁহার সনন্দ অনুসারে নির্বাচন-মূলক আইনসভা, ধর্মনৈতিক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে সমতা প্রভৃতি উদারনৈতিক পন্থা অবলম্বন করিলেন। ফলে, অন্ততঃ দৃশ্যতঃ ফরাসী শাসনব্যবস্থা একমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর দেশের মধ্যে সর্বাধিক গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করিল। ফরাসী জনসাধারণের নিকট তাঁহার শাসন জনপ্রিয় না হইলেও একেবারে অসহনীয় ছিল না। কিন্তু

অষ্টাদশ লুই কর্তৃক সনন্দ অনুসারে শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

তাঁহার উগ্র সমর্থকদল ও মন্ত্রিগণ ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। প্রথমেই তাঁহারা বিপ্লবের কালে গৃহীত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ত্যাগ করিয়া স্বৈরাচারী বুর্‌বোঁ বংশের পতাকা গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের সহায়ক মার্শাল নে (Ney)-কে তাহারা হত্যা করাইলেন; কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল। ইহাতে স্বভাবতই জাতির আনুগত্য দৃঢ় না হইয়া ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। কিন্তু সুখের বিষয়, অষ্টাদশ লুই ফরাসী জাতির মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বিপ্লবের পরে রাজপদের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ অপেক্ষা তাঁহার ধারণা ছিল অধিকতর স্পষ্ট। তিনি তাঁহার উগ্র সমর্থকদের আত্মঘাতী পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। নির্বাসিত জীবনের দুঃখদুর্দশার কথা তিনি ভুলিয়া যান নাই। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও তাঁহার নিকট নির্বাসিত জীবন অপেক্ষা শতগুণে ভাল ছিল। এদিক দিয়া বিচার করিলে অষ্টাদশ লুইয়ের মানসিক অবস্থা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী জাতির সম্মুখীন সমস্যা সমাধানের পক্ষে অনুকূল ছিল। তথাপি নির্বাচিত আইনসভায় রাজতান্ত্রিকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় সরকারী নীতি স্বভাবতই বিপ্লব-বিরোধী হইল। ট্যালির্যাঁর উদার নেতৃত্বের পরিবর্তে ডিউক্-ডি-রিশ্‌ল্যু'র (Duc de Richelieu) নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের উগ্র-সমর্থকদের মন্ত্রিসভা নিযুক্ত হইল। কিন্তু রিশ্‌ল্যু ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি উগ্রপন্থীদের অনেক দাবিই সাময়িকভাবে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন। তথাপি আইনসভায় উগ্র-রাজতান্ত্রিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাঁহার পক্ষে বেশী দিন স্বাধীনভাবে চলা সম্ভব হইল না। তিনি উগ্রপন্থীদের চাপে নেপোলিয়নের আমলের জাতীয় ঋণের দুই-পঞ্চমাংশ অস্বীকার করিতে এবং বিপ্লবে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের উপর হইতে আইনের নিরাপত্তা অপসারণ করিতে অগ্রসর হইলে অষ্টাদশ লুই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন আইনসভা নির্বাচনের আদেশ দিলেন (১৮১৬)। এইরূপে সাময়িকভাবে রাজতন্ত্রের বিপদ কাটিল। রিশ্‌ল্যু নিজ নীতি সম্পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ লাভ করিলেন। কারণ, আইন-

রাজতন্ত্রের সমর্থকদের উগ্রতা

অষ্টাদশ লুই-এর বিচক্ষণতা

আইনসভায় উগ্রপন্থীদের সংখ্যাধিক্য

ডিউক্-ডি-রিশ্‌ল্যুর মন্ত্রিত্ব

উগ্রপন্থীদের আত্মঘাতী নীতি: লুই কর্তৃক নূতন আইনসভা-গঠন

সভায় উগ্র রাজতান্ত্রিকদের প্রাধান্য নাশ হইয়া তখন উদারনৈতিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। রিশ্‌ল্যু পরবর্তী দুই বৎসর আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপেলের কংগ্রেসে তিনি ফ্রান্সকে ইওরোপীয় কনসার্টের পঞ্চম সদস্য হিসাবে ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অংশ দান করিলেন। ইতিমধ্যে উদারপন্থীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় রিশ্‌ল্যুকে পদত্যাগে বাধ্য করা হইল এবং ডেকাজে (Decazes) উদারপন্থীদের সহায়তায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন।

উদারনৈতিক প্রাধান্য

রিশ্‌ল্যু'র স্থলে উদারপন্থী ডেকাজে'র মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

উগ্রপন্থীদের আমলে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার স্বাধীনতা নাশ করা হইয়াছিল, ডেকাজে তাহা পুনরায় দান করিলেন। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রজাহিতৈষী শাসন-ব্যবস্থার সুফল দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু এমন সময়ে লোভেল (Louvel) নামে এক উন্মত্ত ব্যা আর্টোয়েস-এর ডিউক-পুত্র ডিউক্‌-ডি-বেরি (Duc de Berri)-কে হত্যা করিলে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ডিউক্‌-ডি-বেরি ছিলেন ফরাসী সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী। তাঁহার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে (১৮২০) ডেকাজে'র মন্ত্রিত্বের পতন ঘটে। উগ্র-রাজতান্ত্রিকগণ এই সুযোগে অষ্টাদশ লুই-এর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠে এবং রিশ্‌ল্যুকে পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ভোটাধিকার হ্রাস, বিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া ভোটপ্রদানের অধিকার দান প্রভৃতি গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু রিশ্‌ল্যুর কর্মপন্থা উগ্র-রাজতান্ত্রিকদের সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহাকে শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে হইল।

ডেকাজে'র প্রজা-হিতৈষী শাসন-ব্যবস্থা

ডিউক্‌-ডি-বেরি'র হত্যার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়া

ডেকাজে'র পতন : রিশ্‌ল্যু'র মন্ত্রিত্ব : প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা

রিশ্‌ল্যু'র পর ভিলীল (Villele) উগ্রপন্থীদের সহায়তায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। উগ্রপন্থীদের উগ্রতা কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইলেও তিনি চার্চ ও অর্থনীতি এই দুই অস্ত্রের ব্যবহারে ফরাসী-জাতিকে বিপ্লবের প্রভাবমুক্ত করিতে চাহিলেন।

ভিলীল কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

একদিকে তিনি চার্চকে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতি জনগণের আনুগত্য সৃষ্টির কাজে লাগাইলেন, অপর দিকে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জাতির মনকে বিপ্লবের পথ হইতে অর্থনৈতিক উন্নতির কার্যে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার কর্মপন্থা ছিল সূক্ষ্ম ও আপাতদৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াবিহীন। এইভাবে অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষদিকে ফরাসী শাসন-ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস্ সিংহাসনে বসিলেন।

ভিলীলের কর্মপন্থা

অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বের শেষদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা

দশম চার্লস্ (১৮২৪,—জুলাই ১৮৩০) (Charles X) :

অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উগ্র রাজতান্ত্রিকদের পক্ষে প্রতিক্রিয়ার সীমা লঙ্ঘনের শেষ বাধাটুকুও অপসারিত হইল। অষ্টাদশ লুই রাজতন্ত্রের সঙ্কট মুহূর্তে একাধিকবার গভীর বিবেচনা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস্ সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিয়া এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এই ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণের মনে আশার সৃষ্টি করিলেও অল্পকালের মধ্যেই তিনি ফরাসী-জাতির বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী। তিনি তাঁহার ভ্রাতা অষ্টাদশ লুইয়ের উদারনীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন।

দশম চার্লসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি; ফরাসীজাতির বিদ্বেষ

তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম তিন বৎসর ভিলীল (Villele) মন্ত্রিপদে আসীন ছিলেন। সেই সময়ে দশম চার্লস ফরাসী বিপ্লবে যে-সকল অভিজাত ব্যক্তি সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করিলেন। যাহারা বিপ্লবের কালে দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকেও উপযুক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। এই সকল বিষয়ে আইনসভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। ক্রমেই দশম চার্লসের শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ব্যাপক হইয়া উঠিল। বিপ্লবের যাবতীয় সুফল দশম চার্লস বিনষ্ট করিতে চাহিতেছেন এই অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বত্র ধ্বনিত

হইতে লাগিল দশম চার্লসের অত্যধিক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থায় ভিলীল বেশীদিন মন্ত্রিত্ব করিতে পারিলেন না। দশম চার্লস্ যাজক সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা চালাইতে শুরু করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আইনসভায় সরকারের বিরোধীদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জাতীয় বাহিনীর (National Guard) আনুগত্য দিন দিনই হ্রাস পাইতে লাগিল। ক্রমেই তাঁহার বিরোধীপক্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ভিলীল আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচন ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু নির্বাচনে বিরোধীপক্ষ জয়ী হইলে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। দশম চার্লস মর্টিগ্নাক্-কে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিলেন। মর্টিগ্নাক্ উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মর্টিগ্নাক্-এর মধ্যপন্থা উদারপন্থী বা রক্ষণশীল কোন দলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। ফলে তিনি পদত্যাগ করিলেন। এইবার দশম চার্লস্ পোলিগ্নাক্ (Polignac) নামক এক কূটনৈতিক ধুরন্ধরকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন।

যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য

পোলিগ্নাক্ মন্ত্রী নিযুক্ত

দশম চার্লস্ যেমন ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়, তেমনি ছিলেন যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাবাধীন এবং আইনসভা বা পার্লামেণ্ট-বিরোধী। দশম চার্লস্ বিশ্বাস করিতেন যে, মন্ত্রী নিয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ইচ্ছাধীন। ইহাতে আইনসভার মতামতের কোন অবকাশ নাই।* তাঁহার আমলে গোলযোগ সৃষ্টি হইতে অধিককাল লাগিল না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করিয়া জাতিকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন এবং সেই সুযোগে উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া একক-অধিনায়কত্ব স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তিনি আলজিয়ার্স (Algiers) নামক স্থানে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানের সাফল্যের ফলে আফ্রিকায় ফরাসী অধিকার স্থাপিত হইল। তারপর তিনি বেলজিয়াম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে পোলিগ্নাক্ ঘোষণা করিলেন যে, শাসন-ব্যাপারে যাজক সম্প্রদায়কে

আলজিয়ার্সে সামরিক অভিযান

* "I would rather saw wood, than be a king of the English type"—*Charles X*, vide Hazen p. 89.

তাঁহাদের হৃত সম্পত্তি ও মর্যাদায় পুনরায় স্থাপন করাই তাঁহার নীতি হইবে।*

অভিজাত ও যাজক প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের চেষ্টা

বিপ্লব-প্রসূত রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল পরিবর্তন নাকচ করিয়া তিনি ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, উদ্ধত অভিজাত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের ধর্মের নামে শোষণ পুনঃস্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। পোলিগ্‌নাক্ ফরাসী জাতির মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনপদ্ধতি জাতীয় প্রতিনিধিসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্টের (Chamber of Deputies) উদারপন্থী সদস্যগণের নিকট

পোলিগ্‌নাকের অপসারণ দাবি

অসহনীয় হইয়া উঠিল।† তাঁহারা পোলিগ্‌নাকের অপসারণ দাবি করিলেন। কিন্তু দশম চার্লস্ নিতান্ত অপরিণামদর্শীর ন্যায় পোলিগ্‌নাক্‌কে মন্ত্রিপদে বহাল রাখিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি অপর কাহারো মতামতের ধার ধারিবেন না

পোলিগ্‌নাকের স্বৈরাচারী চারিটি ঘোষণা :

এইরূপ ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের ভাগ্য-বিড়ম্বনার ইতিহাস হইতে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিলেন না। তাঁহার পরামর্শে পোলিগ্‌নাক্ স্বৈরাচারী শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে চারিটি বিশেষ ঘোষণা জারী করিলেন।

(১) ফরাসী জাতীয় সভা পার্লামেণ্ট বা Chamber of Deputies ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হইল; (৩) ভোটদাতাগণের সংখ্যা হ্রাস করিয়া সম্পত্তির ভিত্তিতে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত করা হইল; (৪) এই নূতন তালিকাভুক্ত অল্পসংখ্যক নাগরিকের ভোটে নূতন পার্লামেণ্ট নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হইল। এই

ঘোষণার সরাসরি ফল : জুলাই বিপ্লব (১৮৩০)

ঘোষণা জারী হওয়ার পরের দিন প্যারিস নগরীতে বিদ্রোহ দেখা দিল (২৬শে জুলাই, ১৮৩০)। (অষ্টাদশ লুই-স্বাক্ষরিত) 'সনন্দ অক্ষয় হউক', 'মন্ত্রিসভার নিপাত চাই' ধ্বনিতে প্যারিস নগরীর রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিল। সরকার পক্ষের সৈন্যগণ অনেকেই বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান

* "There is no such thing as political wisdom. With the warning of James II before him Charles X is setting up a government by priests, through priests and for priests," Duke of Wellington, Quoted by Ketelbey p. 159; Lipson p. 14.

† "He (Polignac) was chauvinist which was bad; ultra-clerical which was worse, an enemy of the Parliament which was fatal"—Grant & Tempereley, *Europe in the 19th Century*, p. 192.

করিল, অনেকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসম্মত হইল। ২৮শে জুলাই ফ্রান্সে এক অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। দশম চার্লস্ পরিস্থিতির চাপে উপরি-উক্ত ঘোষণা নাকচ করিতে এবং উদারপন্থীদের সহিত বিরোধ মিটাইতে চাহিলেন, কিন্তু তখন মিটমাটের আর অবকাশ ছিল না। অর্লিয়েন্সের ডিউক লুই ফিলিপ্পিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। ইনি বুর্বোঁ রাজবংশের সন্তান ছিলেন বটে, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবে তিনি বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

দশম চার্লস্ কর্তৃক আপোষের বৃথা চেষ্টা

লুই ফিলিপ্পির সিংহাসন লাভ

জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের গুরুত্ব (Importance of the July Revolution):

ফ্রান্সে (Within France): আপাতদৃষ্টিতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে নাই বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিপ্লব ফ্রান্স এবং ইওরোপের ইতিহাসে এক অতিগুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছিল।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা

ফ্রান্সের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, (১) উদারপন্থিগণ দশম চার্লস্‌কে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও রাজতন্ত্র অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই। উদারপন্থীদের অনেকেই ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু যে আশা লইয়া তাহারা প্যারিস নগরীর রাজপথে দশম চার্লসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহা সফল হইল না। কিন্তু ঐ সময়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের কোন উপায়ও ছিল না। কারণ দশম চার্লসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হইলে ইওরোপের মিত্রশক্তিবর্গ ফ্রান্সের বিরোধিতা শুরু করিবে এইরূপ ভয় ছিল। এই কারণে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লুই ফিলিপ্পিকে সিংহাসনে স্থাপন ভিন্ন অপর কোন পন্থা ছিল না।

আভ্যন্তরীণ ফলাফল: রাজা পরিবর্তিত হইলেও রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে নাই

(২) রাজতন্ত্রের অবসান না হইলেও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। জরুরী পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল; সর্বপ্রকার আইনের প্রস্তাব একমাত্র জাতীয় প্রতিনিধি

গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

সভার (Chamber of Deputies) হাতে ন্যস্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হইল। শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাথলিক ধর্ম ও যাজকদের প্রাধান্য দূর করা হইল। সর্বসাধারণকে ভোটদানের অধিকার অবশ্য তখনও দেওয়া হইল না। (৩) জনসাধারণকে ভোটাধিকার না দিলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের ('১৬৮৮) ন্যায়ই ফরাসী শাসন-ব্যবস্থায় রাজগণের ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা-নীতি (Divine Right of Kingship) চিরতরে লুপ্ত করিল। রাজার ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা-নীতির স্থলে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব ভগবানপ্রদত্ত, এই নীতি গৃহীত হইল। লুই ফিলিপ্পি জনমতের ভিত্তিতে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন।* (৪) এই বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত 'ন্যায্য-অধিকার' (legitimacy) নীতি ফ্রান্স কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল; 'ন্যায্য-অধিকার'-এ শাসন-ক্ষমতার উপরে স্থান পাইল জনমত। (৫) এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইল। উগ্র-রাজতান্ত্রিক এবং যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও তাহাদের প্রাক্-বিপ্লবযুগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করা হইল। জুলাই বিপ্লব ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হইতে লাগিল।† এখন হইতে সাম্য, ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন, শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতি স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। অষ্টাদশ লুই সিংহাসনলাভের সময় যে সনন্দ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা এখন হইতে ফরাসী জাতির জন্মগত ও অপরিবর্তনীয় অধিকারে পরিণত হইল। (৬) জুলাই বিপ্লবের ফলে যাজক সম্প্রদায় ও উগ্র-রাজতান্ত্রিকদের স্থলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। উদারপন্থী মধ্যবিত্ত সমাজই জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিল।

ভগবানপ্রদত্ত রাজশক্তির ধারণা বিলুপ্ত

ন্যায্য-অধিকার নীতির স্থলে জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত

ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত

জুলাই বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরিপূরক

যাজক সম্প্রদায় ও উগ্র-রাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নাশ : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লাভ

* "The king will respect our rights, for it is of us that he will hold his own". Quoted by Lipson, p. 17.

† "In short, the Revolution of 1830 was the complement of the Revolution of 1789; for the future, the achievements of the revolutionary spirit—the principles of equality, secularism and constitutional liberty rested on secure foundations." *Ibid* p. 18.

ইওরোপে (In Europe) : ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব দাবাগ্নির ন্যায় মুহূর্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। (ক) বেলজিয়ামে এই বিদ্রোহ জাতীয় স্বাধীনতার এক গভীর আবেগের সৃষ্টি করিল। বেলজিয়ামবাসিগণ ভিয়েনা সম্মেলনের অন্যায়মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল এবং হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ পরিবারের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ঐ বৎসরই লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শনে (Convention of London) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ইওরোপীয় দেশগুলি স্বীকার করিয়া লইল। (খ) জার্মানিতে জুলাই বিপ্লবের ফলে এক ব্যাপক গণজাগরণের শুরু হইল। নানাস্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়া খণ্ডযুদ্ধের সৃষ্টি হইল। স্যাক্সনি, হ্যানোভার, হেসি, প্রভৃতি বিভিন্ন জার্মান রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্বীকৃত হইল। কিন্তু ইওরোপীয় কন্‌সার্টের নেতা মেটারনিকের তৎপরতা ও সাহায্যে জার্মানির সর্বত্র পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা নাকচ করিয়া স্বৈরাচারের পুনঃপ্রবর্তন করা হইল। স্যাক্সনির উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা নাকচ করা হইল না সত্য, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে ইহার কোন মূল্য রহিল না। (গ) রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে এক বিরাট গণজাগরণের সৃষ্টি হইল। জার আলেকজাণ্ডার পোলগণকে উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থাধীনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র পুনঃস্থাপন করিতে এবং পোল্যাণ্ডের লুপ্তগৌরব ফিরাইয়া আনিতে চাহিল। দীর্ঘ ছয় বৎসর তাহারা রুশ-শক্তির সহিত যুঝিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল। শাস্তিস্বরূপ তাহাদের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা নাকচ করিয়া তাহাদিগকে সরাসরি রুশ সরকারের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল। (ঘ) ইতালির পার্মা, মোডেনা, পোপের রাজ্য প্রভৃতি নানা অংশে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দিলে তাহা অস্ট্রিয়া কর্তৃক কঠোর হস্তে দমিত হইল। (ঙ) পোর্তুগাল ও স্পেনের জনসাধারণ জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা আদায় করিতে সমর্থ

ইওরোপে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল : জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গভীর আগ্রহের সৃষ্টি

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা

সাময়িকভাবে জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন : মেটারনিকের সহায়তায় স্বৈরাচারের পুনঃস্থাপন

পোলদের স্বাধীনতা-স্পৃহা : রুশ দমননীতি

ইতালির পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি রাজ্যে বিপ্লব—অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমন

হইল। জুলাই বিপ্লবের পূর্ব হইতেই স্পেনে স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা চলিতেছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত গোলযোগের ফলে স্পেনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডেও জুলাই বিপ্লবের প্রভাব পৌঁছিল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল বুঝিলেন যে, গণতান্ত্রিক প্রভাব হইতে ইংরেজ জনসাধারণকে দমন করিয়া রাখা চলিবে না। ফলস্বরূপ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন গৃহীত হইল।

পোর্তুগাল ও স্পেনে বিপ্লবের প্রভাব : ইংলণ্ডের উপর প্রভাব : ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন

মোট ফলের দিক হইতে বিচার করিলে জুলাই বিপ্লব কেবল মাত্র ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি স্থানে এই বিপ্লবের প্রভাবে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয় নাই। ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনও জনসাধারণের দাবি পূরণ করে নাই। এমন কি, ফ্রান্সেও জুলাই বিপ্লব কেবল মাত্র মধ্যবিত্ত সমাজকেই ক্ষমতা দান করিয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিকগণ ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই বিপ্লব-প্রসূত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হয় নাই। এই কারণেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে পুনরায় এক বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এই বিপ্লব ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল এবং বিপ্লব-প্রসূত সাম্য, স্বাধীনতা, ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিল। ইওরোপের ইতিহাসেও গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধ যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ আমরা জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে যে ব্যাপক জাগরণ ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এই দুইটি ধারা স্বৈরাচারী শক্তিবর্গের অত্যাচারে অন্তর্মুখী হইয়াছিল মাত্র, নিশ্চিহ্ন হয় নাই এবং সুযোগ পাইলেই অত্যাচারের কঠোরতা উপেক্ষা করিয়াও আত্মপ্রকাশ করিবে এই সত্য জুলাই বিপ্লব-প্রসূত জাগরণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

জুলাই বিপ্লবের আংশিক সাফল্য

ফ্রান্সের ইতিহাসে বিপ্লবের গুরুত্ব

গণতন্ত্র ও জাতীয়তা অন্তর্মুখী

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ শাসন ও লুই ফিলিপ্পির শাসনের পার্থক্য : ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগের ফলে অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রথম কয়েক বৎসর চালু ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রজাবর্গের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুযোগ এবং আইনের চক্ষে সমতা প্রভৃতি উদারনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে একমাত্র ইংলণ্ড ভিন্ন সমগ্র ইওরোপে ফ্রান্স-ই সর্বাধিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল। ডিউক-ডি-বেরির হত্যার পূর্বাবধি অষ্টাদশ লুইয়ের শাসনব্যবস্থা উদারপন্থী ছিল, সেকথা অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ লুই নির্বাসিত জীবনের দুঃখদুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া উদারপন্থা অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগে বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : প্রথম ভাগে উদারপন্থী শাসন

কিন্তু ডিউক-ডি-বেরির হত্যাকাণ্ডের ফলে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অষ্টাদশ লুইয়ের শাসনকালের অবশিষ্টাংশ প্রতিক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করে। সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ভোটাধিকার হ্রাস, বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গকে দুইটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা দান প্রভৃতি এই প্রতিক্রিয়ার পরিচায়ক। ইহার পর বিপ্লবের প্রভাব হইতে ফরাসী জাতিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিল। এইভাবে অষ্টাদশ লুইয়ের শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসর ফরাসী শাসনব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম অভিব্যক্তি ঘটে অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা দশম চার্লসের অধীনে। প্রথমদিকে তিনি সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া রাজনৈতিক বন্দিগণকে মুক্তিদান করিয়া এবং অষ্টাদশ লুই কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনন্দ মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলেও তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। ক্রমেই তাঁহার শাসনব্যবস্থা অধিক হইতে অধিকতর প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত পোলিগ্নাক্ মন্ত্রিসভার অধীনে জাতীয় আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া সঙ্কুচিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন আইনসভা গঠন করিতে চাহিলে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করিলে ও সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দিবার ব্যবস্থা করা হইলে জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ডিউক-ডি-বেরির হত্যাকাণ্ড : প্রতিক্রিয়ার শুরু

দশম চার্লসের আমলে প্রতিক্রিয়ার চরম পর্যায়

লুই ফিলিপ্পি জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেন। পুনঃস্থাপিত বুর্‌বোঁ রাজগণের শাসন অপেক্ষা অর্লিয়েন্স বংশোদ্ভূত লুই ফিলিপ্পির শাসন নানা দিক দিয়া উন্নত ছিল, একথা অনস্বীকার্য। প্রথমতঃ, লুই ফিলিপ্পির সিংহাসন লাভে ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগে যে ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী বুর্‌বোঁ শাসন স্থাপিত হইয়াছিল উহার অবসান, ঘটিয়া জনসাধারণের নির্বাচিত রাজার শাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নীতির দিক দিয়া ইহা গণতন্ত্র ও উদার রাজনীতির জয়ের সূচনা করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কার্যকলাপের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও লুই ফিলিপ্পির শাসনকাল বহুগুণে উদারপন্থী ছিল তাহা প্রমাণিত হইবে। দশম চার্লস্ বিপ্লবের নীতি ও দানকে অগ্রাহ্য করিয়া অভিজাতবর্গকে তাহাদের সম্পত্তির জন্য বিশাল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়াছিলেন। বিপ্লবের কালে যে সকল রাজতন্ত্রের সমর্থক দেশত্যাগ করিযা গিয়াছিল, তাহাদিগকেও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। লুই ফিলিপ্পির আমলে সেই সকল বিপ্লবের নীতিবিরোধী সুযোগসুবিধা নাকচ করা হইয়াছিল। দশম চার্লস্-প্রবর্তিত প্রথম পুত্রকে ভূসম্পত্তি দানের আইন পুনরায় ভূসম্পত্তি একই হস্তে সঞ্চিত হইবার যে-ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাও নাকচ করা হইল। ফলে বিরাট পরিমাণ ভূসম্পত্তির মালিক শ্রেণী আর গড়িয়া উঠিতে পারিল না। আইনসভার উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পত্তির ভিত্তিতে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি হইতে পারিল না। তৃতীয়তঃ, পূর্বে যে পরিমাণ সম্পত্তি থাকিলে ভোটাধিকার পাওয়া যাইত তাহার প্রায় অর্ধেক সম্পত্তি থাকিলেই এখন ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইল। চতুর্থতঃ, রাজার দেহরক্ষিগণ এখন জাতীয় বাহিনী হইতে লইবার ব্যবস্থা করা হইল। পূর্বে রাজকীয় দেহরক্ষিগণকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নিয়োগ করা হইত। কিন্তু বিপ্লবের পর জাতীয় বাহিনীর একাংশের হস্তে রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হইবার অর্থ ছিল এই যে, রাজা জনসাধারণেরই মনোনীত রাজা, তাঁহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্বও জনসাধারণের।* পঞ্চমতঃ, ধর্মাধিষ্ঠান

ভগবান-প্রদত্ত রাজ-ক্ষমতার নীতির অবসান

উদারপন্থী কার্যকলাপ

বিপ্লব-বিরোধী আইন-কানুনের পরিবর্তন

ভোটাধিকারের প্রসার

রাজা জনসাধারণের

* Vide *World History*, E. Fueter, pp. 67-68.

যাহাতে শাসন-ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে সেজন্য 'ক্যাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম'—এই শর্তটি সংবিধান হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইল। ষষ্ঠতঃ, লুই ফিলিপ্পির আমলে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা কৃষক-মজুরদের শাসনক্ষমতা স্বীকৃত না হইলেও অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর হাত হইতে শাসনক্ষমতা উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দিক্ দিয়া ইহাও অগ্রগতির পরিচায়ক।

শাসনব্যবস্থায় ধর্মা-ধিষ্ঠানের প্রাধান্য নাশ

মধ্যবিত্তের শাসন

লুই ফিলিপ্পি, (১৮৩০—৪৮) (Louis Philippe) ঃ

লুই ফিলিপ্পি শাসক হিসাবে যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার সিংহাসন লাভের পশ্চাতে যে, জনগণের সমর্থন রহিয়াছে এবং এই সমর্থন অক্ষুণ্ণ রাখার উপরই যে তাঁহার নিজের এবং নিজ বংশের সিংহাসনে অধিকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, এই কথা তিনি কখনও ভুলেন নাই। ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতার স্থলে তিনি যে, জনসাধারণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি নিজ পুত্রদিগকে সাধারণ স্কুলে ছাত্রহিসাবে ভর্তি করিলেন। অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় রাস্তায় তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং যে-কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার বক্তব্য শুনিতেন। এইভাবে তিনি নাগরিক রাজতন্ত্রের (citizen monarchy) সূচনা করিলেন। বিপ্লবের মূল-নীতির প্রতি তিনি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন এবং এই কারণে তিনি বুর্বোঁ রাজবংশের আমলের জাতীয় পতাকা ত্যাগ করিয়া বিপ্লব যুগের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ফিলিপ্পির আদেশেই সেন্ট্ হেলেনা হইতে নেপোলিয়নের দেহাবশেষ ফ্রান্সে আনা হয় এবং উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে এক অতি মনোরম সমাধিসৌধে সমাহিত করা হয়। লুই ফিলিপ্পির পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি রক্ষা করিয়া চলা এবং দেশের বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করা। এইরূপ উদারনৈতিক এবং জনকল্যাণকর শাসনের বিরুদ্ধে ফরাসী জাতি কেন বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ ফ্রান্সের সমসাময়িক পরিস্থিতিতে খুঁজিতে হইবে। প্রথমতঃ, জুলাই বিপ্লব ফরাসী

লুই ফিলিপ্পির সাধারণ নাগরিক-সুলভ ব্যবহার

বিপ্লবের নীতির প্রতি সহানুভূতিশীল

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা ও বাণিজ্যের প্রসার

জাতির মনে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, লুই ফিলিপ্পির শাসন সেই আশানুরূপ কার্য করিতে পারে নাই। (ক) ন্যায্য-অধিকার নীতিতে যাহারা বিশ্বাসী ছিল (legitimists) তাহারা দশম চার্লসের বংশধরকে সিংহাসন দানের পক্ষপাতী ছিল। তাহারা ভগবানপ্রদত্ত রাজশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং জনসাধারণের নির্বাচিত লুই ফিলিপ্পির প্রতি তাহাদের কোন আনুগত্য ছিল না। (খ) উগ্র ক্যাথলিকরা ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলনা। তাহারা দশম চার্লসের আমলে যে-সকল সুবিধা ভোগ করিত তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। (গ) প্রজাতান্ত্রিকরা লুই ফিলিপ্পির শাসন একক-অধিনায়কত্বের নামান্তর বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহারা প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, লুই ফিলিপ্পির শাসনকালে শ্রেণী-নির্বিশেষে ফরাসী জাতির উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু তাহারা দেখিল যে, লুই ফিলিপ্পি গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র কোনটাই মানিয়া চলেন না। তিনি এক মধ্য-পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা না ছিল রক্ষণশীল, না ছিল উদারপন্থী, না ছিল নরমপন্থী। স্বভাবতই প্রজাতান্ত্রিকগণ লুই ফিলিপ্পির শাসন-ব্যবস্থায় খুশি হইল না। (ঘ) লুই ব্ল্যাঙ্ক নামক একজন ফরাসী সমাজতান্ত্রিকের প্রচারকার্যের ফলে ফ্রান্সে সেই সময়ে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দলের সৃষ্টি হয়। তাহারা লুই ফিলিপ্পির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-প্রভাবিত রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল।* প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই উপযুক্ত আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা, কারখানাগুলির জাতীয়করণের এবং ধনী পুঁজিপতিদের বিলোপ সাধনের তাহারা পক্ষপাতী ছিল। (ঙ) নেপোলিয়নের অধীনে সৈনিকের কাজ করিয়াছে এমন এক শ্রেণীয় লোক এবং নেপোলিয়নের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সাধারণ লোক লইয়া বোনাপার্টিস্ট্ (Bonapartist) দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা নেপোলিয়নের পরিবার-উদ্ভূত লুই নেপোলিয়ন

ফিলিপ্পির পতনের কারণ

(ক) ন্যায্য-অধিকার নীতিতে বিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট, আশানুরূপ কার্য সম্পাদনের অক্ষমতা

(খ) উগ্র ক্যাথলিকদের অসন্তোষ

(গ) প্রজাতান্ত্রিকদের আশাভঙ্গ

(ঘ) সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যবিত্ত-প্রাধান্যের বিরোধিতা

(ঙ) নেপোলিয়ন-ভক্তদের নেপোলিয়নের বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপনের ইচ্ছা

* "Louis Philippe committed a fatal mistake in not broadening the basis of his rule." Lipson. p. 26.

বোনাপার্টির সিংহাসন প্রাপ্তির পক্ষপাতী ছিল। এইভাবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন কারণে লুই ফিলিপ্পির শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, আড়ম্বরপ্রিয় ফরাসী জাতি লুই ফিলিপ্পির শান্তিবাদী নীতির মধ্যে জাতীয় গৌরববৃদ্ধির তথা উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার মত কোন কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা ক্রমেই কোনরূপ উত্তেজনার অভাবে বিরক্ত হইয়া উঠিল। প্রজাতান্ত্রিক নেতা লা মার্টিন বলিয়াছিলেন, 'ফ্রান্সের বৈচিত্র্যহীন শাসনজনিত অবসাদ' (la France's ennuie) ফিলিপ্পির পতনের প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে লুই ফিলিপ্পি গৌরব-লোভী ফরাসীজাতিকে সম্মোহিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

শান্তিবাদী নীতিতে উন্মাদনার অভাব

দুর্বল পররাষ্ট্র নীতি

(ক) জুলাই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া ইতালি ও পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে ফরাসী জাতি আশা করিয়াছিল যে, লুই ফিলিপ্পি সেই দুই দেশে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্য ও সমর্থন করিবেন, কিন্তু লুই ফিলিপ্পি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রহিলেন। (খ) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন-ই নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার শীর্ষে স্থাপিত ফরাসীরাজ ফ্রান্সকে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্থাপন করিতে পারিলেন না। বেলজিয়ামবাসী লুই ফিলিপ্পির পুত্রকে বেলজিয়ামের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল। তাহা হইলে বেলজিয়াম ফ্রান্সের অধীনে আসিত। কিন্তু পামারস্টোনের কুট কৌশলে তাহা কার্যকরী হইল না। ইহাতে লুই ফিলিপ্পি ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হইলেন। (গ) মিশরের পাশা মহম্মদ আলি তুরস্ক আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ তুরস্কের পক্ষ গ্রহণ করে। ফ্রান্স কিন্তু মহম্মদ আলিকে সমর্থন করে। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় তুরস্ক-মিশর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের নেতৃত্বই সাফল্য লাভ করিয়াছিল, ফ্রান্স মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজ মর্যাদা নাশ করিয়াছিল। (ঘ) স্পেনের রাজকন্যার সহিত নিজপুত্রের বিবাহ দিয়া লুই ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তারপর

ইতালি ও পোল্যাণ্ড

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা আন্দোলন

মিশর-তুর্কী দ্বন্দ্ব

অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি অস্ট্রিয়ার সহিত যুগ্মভাবে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের প্রোটেস্টান্ট দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা উদারপন্থী ফ্রান্সের মর্যাদার পরিপন্থী ছিল।

ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা নাশ

(ঙ) আফ্রিকার উত্তর উপকূলে আল্‌জিয়ার্স ছিল ফরাসী-অধিকৃত স্থান। সেই সময়ে আফ্রিকায় উপনিবেশ-বিস্তার ব্যাপারে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু লুই ফিলিপ্পি ইংলণ্ডের ভয়ে আফ্রিকায় উপনিবেশ-বিস্তারের সুযোগও গ্রহণ করেন নাই।

আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে অকৃতকার্যতা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদালোভী ফরাসী জাতির সম্মুখে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ফ্রান্সের প্রাধান্যের স্মৃতি তখনও সুস্পষ্ট ছিল। সেই জন্যই লুই ফিলিপ্পির শান্তিবাদী, উন্মাদনাহীন পররাষ্ট্র নীতি তাহাদের সমর্থন লাভ করিতে পারিল না। তাঁহার পতনের ইহাও একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। তৃতীয়তঃ, লুই ফিলিপ্পিব আমলে ফরাসী জাতির যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে কোন শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মূল বুর্‌বোঁ পরিবারের স্বপক্ষে লা ভেণ্ডি (La Vendee) ও প্রভেন্স্‌ নামক স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্ট্রাস্‌বার্গ ও বোলোন নামক স্থানে ১৮৩৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বিদ্রোহের সৃষ্টি করেন। ১৮৩১ ও ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে-সাধারণ লোকেরা ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। এই সকল কারণে স্বভাবতই লুই ফিলিপ্পির শাসন দৃঢ় হইতে পারে নাই। চতুর্থতঃ, জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অসন্তোষের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল লুই ফিলিপ্পি ততই অসহায় হইয়া পড়িতেছিলেন। নির্বাচিত জাতীয় সভার অধিকাংশ সভ্য ছিলেন গিজো (Guizot) নামক নেতার অধীনে। কিন্তু ক্রমেই সেই সভায় এক সংস্কারপন্থী দলের সৃষ্টি হইল। এই দলের নেতা ছিলেন থিয়ার্স (Thiers)। থিযার্স ও তাঁহার সমর্থকগণ ভোট দানের ক্ষমতার প্রসার দাবি করিলেন। তাঁহাদের দাবির কোন মূল্যই দেওয়া হইল না। ক্রমে থিয়ার্সের দলের প্রচারকার্যের ফলে ফ্রান্সের সর্বত্র সংস্কারের দাবি উত্থিত হইল। 'গিজোর মন্ত্রিসভার পতন', 'ভোটাধিকারের প্রসার' প্রভৃতি দাবি ফ্রান্সের সর্বত্র ধ্বনিত

আভ্যন্তরীণ শান্তির অভাব

লুই ফিলিপ্পির অসহায় অবস্থা

গিজো'র নিয়োগ ও পদচ্যুতি

হইল। লুই ফিলিপ্পি ও তাঁহার পরিবারের সকলকে হত্যার একাধিকবার চেষ্টা করা হইল। লুই ফিলিপ্পি ভীত হইলেন। তিনি সংস্কার-সাধনে রাজী হইলেন, কিন্তু গিজো তখনও সংস্কারের পরিপন্থী রহিলেন। লুই গিজোকে পদচ্যুত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন কাজ হইল না। গিজো'র পদচ্যুতি এবং লুই ফিলিপ্পির উদারনৈতিক সংস্কার সাধনে সম্মতি সংস্কারপন্থীদের নিরস্ত করিল বটে কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক দল জনসাধারণকে সেই সুযোগে রাজতন্ত্র তথা লুই ফিলিপ্পির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। পদচ্যুত মন্ত্রী গিজোর বাসস্থানের সম্মুখে এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে উচ্ছৃঙ্খল জনতা রক্ষীদের উপর গুলি করিলে রক্ষীদল পাল্টা গুলি করিয়া জনতার কয়েকজনকে হত্যা করিল (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮)। এই সূত্রে প্যারিসের সর্বত্র মারামারি শুরু হইল। পরদিন (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮) লুই ফিলিপ্পি তাঁহার পৌত্রের স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইভাবে ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিকদের চেষ্টায় ফরাসী রাজতন্ত্রের পতন ঘটিল।

বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে গুলি চালনা

প্যারিসের সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা: ফিলিপ্পির সিংহাসন ত্যাগ

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮) ফলাফল ও গুরুত্ব (Effects & Importance of the February Revolution):

ফ্রান্সে (In France): ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদী প্রজাতান্ত্রিকগণ এবং সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকগণ মিলিতভাবে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করিল। লামার্টিন (Lamartine) হইলেন এই অস্থায়ী সরকারের প্রধান নেতা। ফ্রান্সের জাতীয় সভার (Chamber of Deputies) সদস্যদের মধ্য হইতে দশজনকে লইয়া এই অস্থায়ী সরকারের কার্য-নির্বাহক (Executive) সমিতি গঠিত হইল। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী লুই ব্ল্যাঙ্ক এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইলেন। প্রথমেই লুই ফিলিপ্পির পৌত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইল। জাতীয় সামরিক বাহিনীতে যে-কোন শ্রেণীর লোক যোগদান করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

সমাজতন্ত্রী, প্রজাতান্ত্রিক ও সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের মিলিতভাবে অস্থায়ী সরকার গঠন

ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র দেশ বলিয়া ঘোষণা

এইভাবে ফ্রান্সের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইল।

উদারনৈতিক ব্যবস্থা

সকলের জন্যই আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা, মজুর শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা এবং প্রজাতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা, এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। সমাজতন্ত্রবাদ বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা ফরাসী দেশে ঐ সময়ে একবার করা হইয়াছিল।

সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা

শাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে জনকল্যাণকর করিয়া তোলাই ছিল এই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উদ্দেশ্য। লুই ব্ল্যাঙ্ক্ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "শ্রমিকের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য হইতে মানুষকে রক্ষা করা ও তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জ্ঞানান্ধতা ও দারিদ্র্য—এই দুই প্রকার 'দাসত্ব' হইতে জনগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মানুষের মর্যাদায় স্থাপন করা সরকার মাত্রেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন।" বলা বাহুল্য প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিবিধানের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সরকারের তত্ত্বাবধানে কারখানা স্থাপন করিয়া দরিদ্র শ্রমিকদের উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সুনিশ্চিত পরিকল্পনার অভাব হেতু এই পরীক্ষা সফল হইল না। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার বিফলতার পশ্চাতে সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের একনিষ্ঠ সহযোগিতার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

জ্ঞানান্ধতা ও দারিদ্র হইতে জনগণকে উদ্ধারের চেষ্টা

সরকারী কারখানা স্থাপন : বিফলতা

অস্থায়ী সরকার অতঃপর প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের শাসনপদ্ধতি স্থির করিতে মনোনিবেশ করিলেন। (১) প্রথমেই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের 'নাগরিক অধিকারের ঘোষণা'র (Declaration of the Rights of man & citizen) অনুকরণে একটি অধিকারের ঘোষণা প্রকাশ করিলেন। (২) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত ৭৫০ জন সদস্যের এক-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। (৩) জনগণের ভোটে একজন প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা স্থির হইল। রাষ্ট্রপতি চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গঠন :

নাগরিক অধিকারের ঘোষণা,

এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা,

জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নাশ করিয়াছিল এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব মধ্যবিত্ত প্রাধান্য নাশ করিয়া জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য স্থাপন করিয়াছিল।

মধ্যবিত্ত-প্রাধান্য নাশ; জনগণের প্রাধান্য স্থাপন

ইওরোপে (In Europe) : ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব এক প্রবল ঝটিকার ন্যায় সমগ্র ইওরোপ মহাদেশকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব ইওরোপীয় কন্‌সার্টের অত্যাচারে বিনষ্ট না হইয়া বরঞ্চ প্রসারলাভ করিয়াছিল। ইওরোপের পনরটি বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। সমগ্র ইওরোপে এক মানসিক প্রস্তুতি পূর্ববর্তী অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ চলিতেছিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যেন একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রহিয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ইঙ্গিতে সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইওরোপের উপর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার

স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ

জার্মানির প্রাশিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ব্যাডেন, বেভেরিয়া প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট নামক স্থানে এক বিপ্লবী পার্লামেণ্ট জার্মানির রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা অবশ্য ফলবতী হয় নাই। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম নিজে ছিলেন উদারপন্থী। তিনি নিজ রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। জার্মানির অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

জার্মানি

অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে—যথা ভিয়েনা, মিলান, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা দিল। মেটারনিক্ স্বয়ং আত্মরক্ষার্থ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মেটারনিকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট বা মেটারনিক্-ব্যবস্থার (Metternich System) অবসান ঘটিল।

ইতালির সিসিলি, টাস্কেনি, ন্যাপল্‌স্, মোডেনা, পার্মা, পোপের রাজ্য প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যেক স্থানের শাসক-ই আত্মরক্ষার্থ উদারনৈতিক

ইতালি

শাসনতন্ত্র স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ দেশত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

সুতরাং ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব কেবলমাত্র ফ্রান্সের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে। ঐ বৎসর ইওরোপে এমন ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে "বিপ্লবের বৎসর" বলিয়া অভিহিত করা হয়।* ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এই বিপ্লবের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে স্বৈরাচারী শক্তি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে এবং ইতালিতেও বিপ্লবিগণ পরাজিত হয়। এই দৃষ্টান্ত প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাপর রাজগণকে উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা নাচক করিতে উৎসাহিত করে। সুতরাং গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব খুব কার্যকরী হইয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু এইজন্য এই বিপ্লবের গুরুত্ব কোন প্রকারেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া খ্যাত

প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা গুরুত্ব বেশী

প্রথমতঃ, এই বিপ্লবের ফলে 'মেটারনিক্-ব্যবস্থা' (Metternich System) অর্থাৎ মেটারনিকের নেতৃত্বে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র দমনের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, প্রগতিশীল ভাবধারাকে বলপূর্বক নির্মূল করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ভিয়েনা চুক্তিকে কার্যকরী করিবার এবং প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করিবার যে চেষ্টা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে বিফল হইল। যুগধর্মের ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে কোন পূর্বতন ব্যবস্থাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নহে এই সত্য-ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লব প্রমাণিত করিল। তৃতীয়তঃ, এই বিপ্লব-প্রসূত জাগরণের ফলে জার্মানি ও ইতালির সর্বত্র এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই পরবর্তীকালে জার্মানি ও ইতালির ঐক্য সাধন সম্ভব হইয়াছিল। চতুর্থতঃ,

(১) 'মেটারনিক্ ব্যবস্থা'র পতন

(২) প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামো পুনঃস্থাপনের চেষ্টা বিফল

(৩) জার্মানি ও ইতালিতে গভীর জাতীয়তার সৃষ্টি

* "When France catches cold Europe sneezes"—*Metternich* vide **Ketelbey, p. 176.**

গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই বিপ্লবের দান নেহাৎ কম ছিল না। এই বিপ্লবের পর ফ্রান্সে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ইহার প্রভাব ক্রমে সমগ্র ইওরোপে বিস্তার লাভ করে। পঞ্চমতঃ, সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা ফেব্রুয়ারী বিপ্লব হইতেই প্রথম শুরু হয়। পরবর্তী যুগে এই সমাজতান্ত্রিক প্রভাব সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা কার্যকরী করিবার চেষ্টা এই বিপ্লব হইতেই শুরু হয়। ইওরোপের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। ষষ্ঠতঃ, এই বিপ্লবের ফলে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর কৃষকগণ ভূমিদাসত্ব (serfdom) হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। স্বৈরাচারী শাসন পুনঃস্থাপিত হওয়ার পরও কৃষকদের এই স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় নাই। সপ্তমতঃ, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্মশক্তির তৎপরতায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব দমন করা সম্ভব হইয়াছিল বটে, তথাপি জার্মানির রাজগণের অনেকেই কতক পরিমাণ শাসনতান্ত্রিক উদারতা দর্শাইতে বাধ্য হইয়াছিল। জার্মানির জনসাধারণ রাজগণের ক্ষমতা ভগবানপ্রদত্ত, এই সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

(৪) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার

(৫) সমাজতান্ত্রিক শাসনের সর্বপ্রথম চেষ্টা

(৬) কৃষকদের ভূমি-দাসত্বের অবসান

(৭) আংশিক সাফল্য

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা অর্জন (Independence of Belgium)

জুলাই বিপ্লবের (১৮৩০) ফলস্বরূপ বেলজিয়ামে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বেলজিয়ামবাসী হল্যাণ্ড হইতে পৃথক হইবার দাবি হল্যাণ্ড রাজের নিকট জানাইল। তাহারা হল্যাণ্ড রাজপরিবারের অধীনে থাকিতে রাজী ছিল বটে, কিন্তু শাসন-ব্যাপারে তাহারা হল্যাণ্ড হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হইতে চাহিল। হল্যাণ্ড-রাজ এই দাবি অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্ অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তিনদিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া হল্যাণ্ডবাসী এই সেনাদলকে ব্রাসেল্‌স্ হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক জাতীয় সভা আহ্বান করা হইল। এই সভা বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ড হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। হল্যাণ্ডরাজ

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব : স্বাধীনতা দাবি

হল্যাণ্ড রাজ্যের দমন নীতি

ইওরোপীয় কন্‌সার্টের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডে বিপ্লব দেখা দিলে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোলগণ সেই বিপ্লবের সমর্থন করায় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া বেলজিয়াম-সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে পারিল না। কেবলমাত্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইল। ফরাসী জাতির উদ্দেশ্য ছিল বেলজিয়াম দখল করা। বেলজিয়ামবাসীরাও ফরাসীরাজের বা তাঁহার প্রতিনিধির অধীনে থাকিতে রাজী ছিল। এমন কি তাহারা ফরাসী-রাজ লুই ফিলিপ্পির পুত্রকে (Duc de Nemours) বেলজিয়ামের রাজা নির্বাচন করে (১৮৩৯)। কিন্তু ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত সেক্সিকোবার্গের লিওপোল্ডকে বেলজিয়ামবাসী তাহাদের নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে গ্রহণ করে। পামারস্টোনের উদারতার ফলে বেলজিয়ামবাসী স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কূটকৌশলের ফলে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ্পির পুত্রের স্থলে লিওপোল্ড বেলজিয়ামের সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লিওপোল্ড ছিলেন ইংরেজ রাজকন্যা (তৃতীয় জর্জের পৌত্রী) সার্লটির স্বামী এবং ভিক্টোরিয়ার খুল্লতাত। অবশ্য হল্যাণ্ড বেলজিয়াম সংযুক্ত থাকাকালীন সরকারী ঋণের একাংশের ভার বেলজিয়ামকে গ্রহণ করিতে হইল। ইহা ভিন্ন লাক্সেম-বার্গের একাংশ হল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দিতে হইল। এইভাবে বেলজিয়াম-সমস্যার সমাধান করা হইল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল ইওরোপীয় কনসার্ট এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। ইহা ছিল ভিয়েনা চুক্তির অকার্য-কারিতার প্রথম দৃষ্টান্ত। ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পতনেরও ইহা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। পামারস্টোনের চেষ্টায় লিওপোল্ডের সিংহাসন লাভে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের জয় হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে বেলজিয়ামবাসী তাহাদের জাতীয় জীবনকে দেশ-প্রেম, সাহিত্য, শিল্প, সব কিছু দ্বারা গড়িয়া তোলে।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ

লিওপোল্ডকে রাজা হিসাবে গ্রহণ

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক স্বীকৃত

ভিয়েনা চুক্তি ভঙ্গের এবং ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পতনের প্রথম পদক্ষেপ

মেটারনিক্‌ঃ 'মেটারনিক্‌-ব্যবস্থা' ও অস্ট্রিয়া (Metternich : 'Metternich-system' & Austria) :

ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয়

সমস্যা ছিল বহুগুণে জটিলতর। পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় অস্ট্রিয়ার সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তদুপরি অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিল অসংহত, অস্ট্রিয়ার জনসাধারণ ছিল জার্মান, ম্যাগিয়ার, চেক্, স্লোভাক্, পোল, রুথেন, ক্রোট, সার্বিয়ান প্রভৃতি বারোটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। স্বভাবতই অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক সমস্যা ছিল যেমন জটিল তেমনি বিপদ-সঙ্কুল।

অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যার জটিলতা

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জাতীয়তাবোধ ইতালি ও জার্মানিতে এক গভীর জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়াতে সেই প্রভাবের ফল বিপরীত হইয়াছিল। বহু জাতির লোকের এক মিশ্রিত জনসমাজের উপর জাতীয়তাবাদের প্রভাব স্বভাবতই অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে—এই আশঙ্কা অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স্ মেটারনিকের নীতিকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদের প্রভাবে মিশ্রিত জনসমাজের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা

মেটারনিক্ ১৮০৮ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের সহিত ইওরোপীয় মিত্রশক্তির যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মেটারনিক্ তাঁহার কুটকৌশল ও দূরদৃষ্টির দ্বারা অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র নীতিকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার দান নেহাৎ কম ছিল না। তিনি এইজন্য নিজেকে নেপোলিয়ন-বিজেতা বলিয়া সগর্বে ঘোষণা করিতেন। ভিয়েনা সম্মেলনের তিনিই ছিলেন নিয়ামক। তাঁহার কূটকৌশল ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভিয়েনা সম্মেলনে তাঁহাকে এক অপ্রতিহত ক্ষমতা দান করিয়াছিল।

মেটারনিক্ অস্ট্রিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্তা : 'নেপোলিয়ন বিজেতা' মেটারনিক্

মেটারনিক্ ছিলেন মার্জিতরুচি-সম্পন্ন, সুদর্শন ও সুচতুর ব্যক্তি। তাঁহার কূটনৈতিক জ্ঞান ছিল অপরিসীম। নিজ চরিত্রের দোষ-ক্রটি ভিন্ন অপর সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের দোষ-ক্রটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। লোক-চরিত্র উপলব্ধি করিবার অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁহার ব্যবহারিক ভদ্রতা, সামাজিকতা তাঁহার চরিত্রকে সুমধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ আকর্ষণী

মেটারনিকের চরিত্র

শক্তি ছিল। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, তাঁহার সূক্ষ্ম কূটনৈতিক জ্ঞান, জটিল প্রশ্ন সমাধানের অসামান্য ক্ষমতা তাঁহাকে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃত্ব গ্রহণে সাহায্য করিয়াছিল। অবশ্য সমসাময়িক রাজনীতিকদের দৃষ্টিতে মেটারনিক্ ছিলেন নিছক চক্রান্তকারী ও সুবিধাবাদী। জার আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় 'মিথ্যাবাদী' বলিয়াছেন। উদারপন্থীরা তাঁহাকে প্রতিক্রিয়াশীল, সংকীর্ণমনা প্রকৃত রাজনৈতিক জ্ঞানহীন কুচক্রী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মেটারনিক্ ছিলেন জনগণের শত্রু।

মেটারনিকের সমস্যা: (১) জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য রক্ষা, (২) অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করা

মেটারনিক্ ছিলেন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী, স্বভাবতই অস্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা করা ছিল তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য। তিনি যখন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ (Habsburg) রাজতন্ত্রের সম্মুখে দুইটি প্রধান সমস্যা ছিল: (১) জার্মানির উপর প্রাধান্য বজায় রাখা এবং এইজন্য প্রাশিয়ার প্রতিযোগিতা নষ্ট করা; (২) বিচ্ছিন্ন এবং অসংহত অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করা। মেটারনিক্ যখন অস্ট্রিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তখন আভ্যন্তরীণ এবং পর-রাষ্ট্রীয় উভয় দিক দিয়াই অস্ট্রিয়ার পতনোন্মুখতা দেখা দিয়াছে। অস্ট্রিয়ার শাসন-ব্যবস্থা ছিল প্রগতিহীন, অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। সংরক্ষণ নীতি অনু-

মেটারনিকের আমলে গুরুতর পরিস্থিতি

সরণ করিতে গিয়া উচ্চহারে শুল্ক স্থাপনের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সামন্ত-প্রথা-জনিত ত্রুটির ফলে কৃষকদের দুরবস্থার সীমা ছিল না, কৃষি স্বভাবতই দিন দিন অবনতির দিকে যাইতেছিল। দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছিল, সমগ্র দেশে এক গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমি বড় অদ্ভুত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এক যুগ আগে বা পরে আমার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। এক যুগ আগে আসিলে আমি জীবন উপভোগের সুযোগ পাইতাম, এক যুগ পরে আসিলে নূতন যুগ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আমার সমগ্র

অস্ট্রিয়ার স্বার্থ দ্বারা মেটারনিকের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রিত

জীবনই এক পতনোন্মুখ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কোনও ক্রমে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টায় ব্যয়িত হইতেছে।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়াই তিনি তাঁহার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন—ব্যক্তিগত

আদর্শের দ্বারা নহে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাঁহার একমাত্র নীতি ছিল বর্তমানে যাহা আছে তাহা রক্ষা করিয়া চলা। অস্ট্রিয়ার পরিস্থিতির চাপে-ই মেটারনিক্ সর্বপ্রকার প্রগতিপন্থী প্রভাব হইতে ইওরোপ তথা অস্ট্রিয়াকে মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ কারণেই তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি বিপ্লবী প্রভাবকে দমন করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের প্রভাব অস্ট্রিয়ায় বিস্তৃত হইলে বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত অস্ট্রিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আরও বৃদ্ধি পাইবে, অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কাঠামো ধূলিসাৎ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার আশঙ্কা।

প্রগতিপন্থী প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়াকে মুক্ত রাখা

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া জার্মানি এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের উদারপন্থী পরিবর্তন মানিয়া লওয়া অবাস্তব হইবে বিবেচনা করিয়া মেটারনিক্ সমগ্র ইওরোপে বিপ্লবী প্রভাবকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তির সাহায্যে ও বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। মেটারনিক্ কর্তৃক গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি উদারনৈতিক প্রভাব দমনের নীতিই 'মেটারনিক্-ব্যবস্থা' (Metternich System) নামে পরিচিত। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ইওরোপে আন্তর্জাতিক পুলিসের কাজ করিয়াছিল। মেটারনিকের হস্তে ইওরোপীয় কন্‌সার্ট এক প্রতিক্রিয়ার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মেটারনিক্ রাশিয়ার রাজ্যবিস্তৃতির বিরোধী ছিলেন। রাশিয়ার রাজ্যবিস্তৃতি অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী ছিল। অস্ট্রিয়ার স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে মেটারনিকের নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না।

চিরাচরিত শাসন-ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা ঃ গণতন্ত্র ও জাতীয়তা-বাদের প্রভাব দমন,— 'মেটারনিক্ ব্যবস্থা (Metternich System)

রাশিয়ার রাজ্য-বিস্তারে বাধাদান

আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই মেটারনিক্ উদারনীতির শত্রুতা সাধন করিয়া চলিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার জাতীয় জীবন তখনও চিরাচরিত গতিপথ ধরিয়া চলিতেছিল। উদারনৈতিক প্রভাবে এই গতি যাহাতে বিভ্রান্ত না হইতে পারে সেইজন্য মেটারনিক্

আভ্যন্তরীণ কার্যপন্থা

আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন সাধন না করিয়া কেবলমাত্র স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেটারনিক্ ইওরোপীয় কন্সার্টকে নিজ ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া ইতালি, জার্মানি ও ইওরোপের অন্যান্য স্থানের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের টুটি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কার্লস্‌বাড্ ডিক্রী (Carlsbad Decrees) ও ট্রপো'র প্রোটোকোল (Protocol of Troppeau) তাঁহার দমন নীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইওরোপীয় কন্সার্টের কার্যকলাপ

মেটারনিকের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে কোন দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সংকীর্ণতা, ধ্বংসপ্রবণতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় তিনি প্রতি পদে পদে দিয়াছিলেন। সমসাময়িক ভাবধারার সহিত 'মেটারনিক্-ব্যবস্থা' (Metternich-system)-এর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি যে-যুগে বাস করিতেছিলেন সে-যুগের মানুষের মানসিক চেতনার যে দ্রুত সম্প্রসারণ চলিতেছিল তাহা উপলব্ধি করিবার মত দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাঁহার নীতি বা 'সিস্টেম' (system)-এর মূল ত্রুটি ছিল এই যে, উহা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভাব-প্রসূত সমস্যাগুলিকে শক্তিবলে দমন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সেগুলির উপযুক্ত সমাধানের চেষ্টা করে নাই।* উদার চিন্তাধারা সম্বলিত বিদেশী পুস্তক অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করিতে না দিলেই অস্ট্রিয়াবাসী উদারনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকিবে এইরূপ অবাস্তব ধারণা তাঁহার ছিল। সুতরাং তিনি যখন দমন নীতি দ্বারা অস্ট্রিয়া এবং ইওরোপে আপাতদৃষ্টিতে শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন গণতন্ত্র ও জাতীয়তার প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গু-ধারার ন্যায় সমগ্র ইওরোপ তথা অস্ট্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনার ব্যাপক প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই।

দূরদৃষ্টির অভাব : সংকীর্ণ, ধ্বংসপ্রবণ নীতি

মেটারনিক্-ব্যবস্থার মূল ত্রুটি : উদারনীতি-প্রসূত সমস্যার সমাধান না করিয়া দমনের চেষ্টা

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ফল্গু-ধারার ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত

* "The fundamental weakness of Metternich's famous 'system' was that it only retarded, it could not avert the day of reckoning". Lipson, P. 128.

অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে শাসন-ব্যবস্থাকে যুগধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রগতিশীল না করায় এবং কৃষকদিগকে সামন্ত-প্রথা-জনিত অত্যাচার হইতে রক্ষা না করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ায় বিপ্লবের প্রস্তুতির সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে অস্ট্রিয়ায় বিপ্লব দেখা দিলে মেটারনিক্ ও তাঁহার 'সিস্টেম'-এর সম্পূর্ণ পতন ঘটে।

কৃষকদিগকে রক্ষা না করার কুফল

তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার কার্য-নীতির আংশিক সাফল্যের কথা স্বীকার করিতে হয়। নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুঝিয়া ইওরোপে যখন শান্তি আসিয়াছিল তখন উদারনৈতিক প্রভাব বশতঃ কোন ব্যাপক অশান্তি দেখা দিলে ইওরোপের অপূরণীয় ক্ষতি হইত সন্দেহ নাই। মেটারনিক্ বা তাঁহার 'সিস্টেম' (system)-এর স্বপক্ষে এইটুকু বলা উচিত যে, তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শান্তি রক্ষা

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী : অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইওরোপ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যস্থলে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান স্বরূপ ছিল। ইতালি, জার্মানি, পোল্যাণ্ড, বলকান অঞ্চল, প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্ট্রিয়ার উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়ার জনসাধারণ বারোটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত ছিল, যথা : জার্মান, ম্যাগিয়ার, শ্লোভাক্, পোল, রুথেন্স্, ক্রোট্স্, ইতালিয়ান, রুমানিয়ান, চেক্, শ্লোভেন্স্ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন জাতির লোকদ্বারা অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাবে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর জনগণকে একই মৌলিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার সুযোগ স্বভাবতই ছিল না। এক জাতির লোক লইয়া গঠিত সেনাবাহিনী অন্য জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য প্রেরণ করিয়া কোনরকমে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর শাসন-ব্যবস্থাকে সংহত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অগ্রগতির পথ ত্যাগ করিয়া প্রাচীন পন্থী এবং রক্ষণশীল নীতির প্রয়োগের উপরই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক ঐক্য নির্ভরশীল ছিল। বিদেশী প্রভাব বিস্তারের ফলে অস্ট্রিয়ায় যাহাতে বিপ্লবী

বিভিন্ন জাতির লোক দ্বারা অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া

দমন নীতির উপর অস্ট্রিয়া নির্ভরশীল

ধারা প্রবাহিত না হইতে পারে সেজন্য বিদেশী পুস্তকাদি পাঠ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সমাজব্যবস্থা সামন্ত-প্রথার অধীন ছিল। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যধিক দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত। ভিয়েনা কংগ্রেসে অস্ট্রিয়া যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সেই সুবাদে-ই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকার নিজ দক্ষতা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। মেটারনিক্ তাঁহার অনুদার, দমন-নীতির প্রয়োগ দ্বারা অন্ততঃ জুলাই বিপ্লবের প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধু তাহা-ই নহে অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে গিয়া ইওরোপের সর্বত্র উদার নীতি—গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশকে দমন করা তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু দমন নীতি যতই কঠোরভাবে প্রযুক্ত হউক না কেন, উহার মধ্যেই উদার নীতির বীজ নিহিত থাকে। অস্ট্রিয়ায় দমন নীতি যতই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইতে লাগিল জনসাধারণের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার গোপন প্রস্তুতিও তেমনি অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিসিয়া অঞ্চলের বিদ্রোহ ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠোর আঘাত আসিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব হইতে। প্রথমেই অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে বিপ্লব দেখা দিল। মেটারনিক্ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। মিলান, ভেনিস, পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার বিদ্রোহ ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধিকার প্রায় বিলুপ্ত করিতে চলিয়াছিল। প্র্যাগ, বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সর্বাধিক ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দিল হাঙ্গেরীতে। উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে লুই কসুথ্ হাঙ্গেরীর জাতীয়তাবাদী দলকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাগাইয়া তুলিলেন। তিনি অস্ট্রিয়া হইতে হাঙ্গেরীর স্বাতন্ত্র্য এবং ক্রোটস্, স্লোভেনস্, রুমানিয়ান প্রভৃতি জাতির লোককেও এই স্বাধীন হাঙ্গেরীর অধীনে লইয়া যাইতে চাহিলেন। লুই কসুথ্ হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ার জাতিকে স্বাধীন করিতে গিয়া ক্রোট, স্লোভেন প্রভৃতি জাতিকে ম্যাগিয়ারদের অধীনে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হইল। এইভাবে

লোকচক্ষুর অন্তরালে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক প্রস্তুতি

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব

লুই কসুথ্

অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অংশে উদারনৈতিক আন্দোলন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও এই সকল আন্দোলনকারীদের মধ্যে পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং পরস্পর যোগাযোগের অভাব হেতু অস্ট্রিয়ার পক্ষে এই সকল বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইল।

বিদ্রোহ দমন

একে একে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। রুশ সামরিক সাহায্য লইয়া হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করা হইল। লুই কসুথ্ পরাজিত হইয়া দেশ হইতে পলায়ন করিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর অস্ট্রিয়ায় কোন গোলযোগ দেখা দিল না।

১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবোত্তর যুগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the period from 1815-1848) :

১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা 'মেটারনিকের যুগ' নামে পরিচিত। বস্তুতঃ ঐ যুগে মেটারনিক্ ছিলেন ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ামক। (১) দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘর্ষ আমরা ঐ সময়ে দেখিতে পাই। এই দুই ধারার একটি ছিল প্রতিক্রিয়ার

প্রতিক্রিয়া ও উদার নীতির সংঘর্ষ

অপরটি ছিল উদার নীতির। বিপ্লবী যুদ্ধের অবসানে নেপোলিয়নকে নির্বাসিত করা সম্ভব হইলেও উদারনৈতিক প্রভাব—গণতন্ত্র, জাতীয়তা, শাসনতান্ত্রিকতা, স্বাধীনতা ও সমতা—প্রভৃতিকে নির্বাসিত করা গেল না। অথচ ভিয়েনা সম্মেলনে স্থির হইল যে, এই সকল বিপ্লব-প্রসূত প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া বিপ্লবের পূর্বতন রাজনৈতিক অবস্থায় পুনঃস্থাপন করা হইবে। এই কারণে সমবেত রাজনীতিকগণ প্রাক্-বিপ্লব যুগের স্বৈরতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। স্বভাবতই এই দুই বিপরীতমুখী ধারার সংঘর্ষ

স্বাধীনতা' ও জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি উদারনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা

উপস্থিত হইল। (২) এই যুগ ইওরোপীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি উদারনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বপ্ন তাহারা দেখিতেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল ইওরোপীয় কন্সার্টের দমন নীতির ফলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ফলবতী না হইলেও দিন দিনই বিপ্লবী প্রভাব তাহাদের মনে এক গভীর চেতনার সৃষ্টি করিতেছিল। যতদিন পর্যন্ত তাহারা তাহাদের দাবি আদায় করিতে

মোট সাফল্য অধিক নহে

না পারিল ততদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া গেল। মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে এই যুগে অবশ্য গণতন্ত্র ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। আশা-আকাঙ্ক্ষার তুলনায় সাফল্যের পরিমাণ খুব কমই ছিল। এইজন্য কেটেল্‌বি (Ketelbey)'র মতে এই যুগ ছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী 'আকাঙ্ক্ষার যুগ' (period of aspirations), সাফল্যের যুগ নহে।* এই যুগে (ক) বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের আধিপত্য মুক্ত হইয়াছিল। (খ) গ্রীস দেশ তুরস্কের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।† (গ) জার্মানির বিভিন্ন অংশে কতক পরিমাণ উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল; অন্ততঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইওরোপীয় স্বৈরাচারী শাসকগণ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিল। (ঘ) ইহা ভিন্ন রাজার শক্তি ভগবান-প্রদত্ত এই কুসংস্কার হইতে জনগণ নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়াছিল।

(১) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা
(২) গ্রীসের স্বাধীনতা
(৩) জার্মানির স্থানে স্থানে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন
(৪) রাজশক্তি ভগবান-প্রদত্ত—এই কুসংস্কার হইতে মুক্তি

মোট সাফল্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া কেটেল্‌বি ১৮১৫—'৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে সাফল্যের অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার যুগ বলিয়া অভিহিত করা সমীচীন মনে করিয়াছেন (a period rather of aspirations than of achievements)। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই যুগে মানসিক প্রস্তুতির ফলেই পরবর্তীকালে উদারনীতির সাফল্য সম্ভব হইয়াছিল।

মানসিক প্রস্তুতির যুগ

১৮১৫ হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কয়টি কংগ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছিল তাহাতে মেটারনিকের নেতৃত্বে উদারনৈতিক অসন্তোষ দমনের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ন্যাপল্‌স, পোর্তুগাল, পাইড্‌মণ্ট্‌ এবং অপরাপর

* "In the realm of politics the period from 1815-1850 was one rather of aspirations than of achievements". Ketelbey, P. 156.

† পরবর্তী অধ্যায়ের গ্রীসের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

স্থান হইতে ফরাসী বিপ্লবের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলা হয়।

১৮১৫-'৩০ ইওরোপীয় কনসার্ট কর্তৃক দমন নীতির অনুসরণ

কার্লসবাড ডিক্রী দ্বারা জার্মানিকে কঠোর প্রতিক্রিয়াশীল নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। ট্রপো'র প্রোটোকোল দ্বারা ইওরোপীয় কন্‌সার্ট যে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উদারনৈতিক আন্দোলন দমনের অধিকার গ্রহণ করে। ১৮২২ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব পর্যন্ত পরবর্তী আট বৎসর মেটারনিক্ নিছক দমন নীতির দ্বারা ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হন। কিন্তু পরবর্তী অষ্টাদশ বৎসরে (১৮৩০-৪৮) উদারনৈতিক প্রভাব এত বেশি বিস্তারলাভ করে যে, ক্রমে ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত প্রাক্-বিপ্লব যুগের স্বৈরাচারী কাঠামো ও ইওরোপীয় কন্‌সার্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে সেই পরিচয় আমরা পাই। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অধিক সাফল্যলাভ সম্ভব না হইলেও এই যুগে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাব ইওরোপের জনগণের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করিয়াছিল। তাহার-ফলে পরবর্তীকালে ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা প্রভৃতির সাফল্য সম্ভব হইয়াছিল।

১৮৩০-'৪৮ পর্যন্ত উদার নীতির প্রভাব বিস্তার—ইওরোপীয় কন্‌সার্টের পতন

১৮১৫-'৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয়তা ও গণ-তন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুতির ফল—ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা

Questions & Hints

1. Account for the Revolution of 1830 in France. What were the results in France and other countries of Europe? (C.U. 1953, 1956)

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক বুর্বোঁ রাজবংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ফরাসী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল, তথাপি অষ্টাদশ লুই-এর শাসন ফরাসী জাতির নিকট অসহনীয় ছিল না। লুই তাঁহার সনন্দের শর্তানুযায়ী উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উগ্র সমর্থকগণ স্বৈরাচারী ব্যবস্থা স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। নির্বাচিত আইন-সভায় উগ্র-রাজতান্ত্রিকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় ট্যালির‍াঁয়ের উদার নেতৃত্বের পরিবর্তে ডিউক-ডি-রিশ্‌ল্যু মন্ত্রী হইলেন। রিশ্‌ল্যু বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন,

সুতরাং উগ্রপন্থীদের দাবির অনেক কিছুই তিনি মানিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হার মানিতে হইল। উগ্রপন্থীদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ থাকায় তাঁহাকে তাহাদের ইচ্ছানুক্রমে চলিতে হইল। ঐ সময়ে অষ্টাদশ লুই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন আইনসভা নির্বাচনের আদেশ দিলেন। এইভাবে উগ্র-পন্থীদের স্বৈরাচারী নীতি হইতে দেশকে রক্ষা করা হইল। পুনঃ নির্বাচিত আইনসভায় উদারপন্থীদের সংখ্যা বেশী ছিল। রিশ্‌ল্যু সেই কারণে কতকটা নির্বিঘ্নেই শাসনকার্য চালাইতে পারিলেন। কিন্তু ক্রমে উদারপন্থীদের দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রিশ্‌ল্যুর স্থলে ডেকাজে মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ডেকাজে'র প্রজাহিতৈষী শাসনের ফলে দেশে এক ব্যাপক উন্নতি দেখা দিল। (২) ডিউক-ডি-বেরি'র হত্যাকাণ্ড—ডেকাজে'র মন্ত্রিসভার পতন—প্রতিক্রিয়া শুরু—রিশ্‌ল্যু পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত; (৩) ক্রমেই প্রতিক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—রিশ্‌ল্যুর স্থলে চরম উগ্রপন্থী ভিলীল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন; (৪) দশম চার্লসের রাজত্বকালের অসহনীয় স্বৈরাচার; পোলিগ্‌নাকের অভিজাত ও যাজক প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্কল্প; (৫) প্রত্যক্ষ কারণ: পোলিগ্‌নাকের স্বৈরাচারী ঘোষণা—(ক) জাতীয়সভার অবসান, (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-নাশ, (গ) ভোটাধিকার হ্রাস, (ঘ) নূতন নির্বাচন; (৬) বিপ্লবের শুরু; (৭) ফলাফল: (ক) ফ্রান্সে: শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন, ভগবান-প্রদত্ত রাজশক্তির ধারণার বিলোপ, ন্যায্য অধিকারনীতির উপরে জনমতের স্থান, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের স্থাপন, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরিপূরক, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের পরিবর্তে মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের প্রাধান্য লাভ, (খ) ইওরোপে সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনতার আগ্রহ, বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ, জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, পোলদের স্বাধীনতা-স্পৃহা, ইতালিতে বিপ্লব, পোর্তুগাল ও স্পেনে বিপ্লব, ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন, জুলাই বিপ্লবের আংশিক সাফল্য। ৩৩-৪৩ পৃষ্ঠা]

2. What were the causes of the Revolution (1830) in France? Briefly trace its repercussions in other countries of Europe. (C. U. 1951).

[উত্তর-সংকেত: ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত দ্রষ্টব্য—কেবলমাত্র ফলাফলের ৭নং (ক) বাদ দিতে হইবে। ৩৩-৪৩ পৃষ্ঠা]

3. Why did the Bourbon restoration fail in France? Was the Orleanist monarchy an improvement upon it? (C. U. 1958).

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের ১-৬ দ্রষ্টব্য। অপরাংশ ৩৩-৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

4. (a) Account for the fall of the monarchy of Louis Philippe of France. (C. U. 1955).

(b) Write a note on the Revolution of 1848 at Paris. What were its results? (C. U. 1957).

[(a) উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : লুই ফিলিপ্পি বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার ছিল নাগরিক-সুলভ। ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহার শাসন ছিল জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি শান্তিরক্ষা ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার পতন ঘটিল কেন সে উত্তর সমসাময়িক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে। (২) লুই ফিলিপ্পির শাসন-ব্যবস্থা কোন পক্ষেরই সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে নাই। ন্যায্য-অধিকার নীতিতে বিশ্বাসীরা, উগ্র-ক্যাথলিক দল, প্রজাতান্ত্রিকগণ, সমাজতান্ত্রিকগণ, বোনাপার্টির সমর্থকগণ—কেহই সন্তুষ্ট ছিল না; (৩) শান্তিবাদী নীতিতে উন্মাদনা ও উত্তেজনার অভাব; (৪) আভ্যন্তরীণ শান্তির অভাব; (৫) অসহায় ফিলিপ্পি বিভ্রান্ত; (৬) গিজো'র মন্ত্রিপদে নিয়োগ ও পদচ্যুতি; (৭) প্রজাতান্ত্রিক দলের বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে বিপ্লবের শুরু—ফিলিপ্পির সিংহাসন ত্যাগ। ৪৬-৫০ পৃষ্ঠা।]

[(b) উত্তর-সংকেত : (a)'র অনুরূপ। ফলাফল ৫নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ। ৪৬-৫০, ৫০-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

5. What were the effects of Revolutions of 1830 and 1848 in the history of France? (C. U. 1954)

[উত্তর-সংকেত : (১) ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফল : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত (৭) (ক) দ্রষ্টব্য; (২) ফ্রান্সের উপর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলাফল : (ক) সমাজতন্ত্রী-প্রজাতান্ত্রিক ও সাধারণ প্রজাতান্ত্রিকদের মিলিত অস্থায়ী সরকার স্থাপন, (খ) ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত, (গ) উদার-নৈতিক ব্যবস্থা, (ঘ) সমাজতান্ত্রিক শাসন স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা, (ঙ) জ্ঞানান্ধতা

ও দারিদ্র্য হইতে জনগণকে উদ্ধারের চেষ্টা, (চ) সরকারী কারখানা স্থাপন, (ছ) প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠন—'নাগরিক অধিকারের ঘোষণা,' প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটে আইনসভা নির্বাচন, জনগণের ভোটে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন; (জ) মধ্যবিত্ত প্রাধান্য নাশ—জনগণের প্রাধান্য-স্থাপন। ৪০-৪৩, ৫০-৫৪ পৃষ্ঠা]

6. Discuss the European repercussions of the French Revolution of 1848. (C. U. 1947)

Or, "The French Revolution of 1848 was the signal for the most wide-reaching disturbances of the century." Discuss. (C. U. 1949)

[উত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপে এক প্রবল ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এই বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া এত অধিক সংখ্যক বিপ্লব ইওরোপে দেখা দিয়াছিল যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে ঐতিহাসিকগণ 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (২) জার্মানির প্রাশিয়া, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ব্যাডেন, বেভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে বিদ্রোহ: উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন; (৩) অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নানাস্থানে এবং ভিয়েনায় বিদ্রোহ—মেটারনিকের পতন ও দেশ-ত্যাগ; (৪) ইতালির টাস্কেনি, সিসিলি, ন্যাপ্‌লস্‌, মোডেনা, পার্মা, পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ—উদারনৈতিক শাসন স্থাপন; (৫) প্রত্যক্ষ ফল খুব বেশী নহে; কিন্তু গুরুত্ব যথেষ্ট, (৬) গুরুত্ব: (ক) 'মেটারনিক্‌-ব্যবস্থার' পতন, (খ) প্রাক্‌-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক কাঠামো পুনঃস্থাপনের চেষ্টা বিফল, (গ) ইতালি ও জার্মানিতে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি, (ঘ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত, (ঙ) সমাজতান্ত্রিক শাসনের প্রথম চেষ্টা, (চ) কৃষকদের ভূমিদাসত্বের অবসান। ৫৬-৫৪ পৃষ্ঠা]

7. Describe the character and policy of Metternich. (C. U. 1952, 1955)

Attempt an estimate of the character and statesmanship of Metternich. (C. U. 1947)

[উত্তর-সংকেত: (১) স্চনা: মেটারনিক্‌ ১৮০৮ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অস্ট্রিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার দান নেহাৎ কম ছিল না। তিনি ছিলেন ভিয়েনা

সম্মেলনের নিয়ামকস্বরূপ। (২) তাঁহার চরিত্র ; (৩) তাঁহার সমস্যা ; (৪) তাঁহার উদ্দেশ্য : জার্মানির উপর প্রাধান্য রক্ষা, অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যকে সংহত করা ; (৫) অস্ট্রিয়ার স্বার্থ দ্বারা মেটারনিকের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারিত ; (৬) তাঁহার নীতি : উদারনৈতিক প্রভাব হইতে অস্ট্রিয়াকে মুক্ত রাখা এবং সেইজন্য ইওরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দমন করা, চিরাচরিত শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা, রাশিয়ার রাজ্য বিস্তারে বাধা দান ; (৭) ইওরোপীয় কন্‌সার্ট তাঁহার হস্তে এক অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ—কন্‌সার্টের কার্যকলাপ, (৮) সমালোচনা : (ক) দূরদৃষ্টির অভাব—সংকীর্ণ, ধ্বংসাত্মক নীতি, (খ) মেটারনিক্ ব্যবস্থার মূল ত্রুটি—উদারনৈতিক প্রভাব-প্রসূত সমস্যার সমাধান না করিয়া তাহা দমনের প্রয়াস, (গ) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে নিস্তেজ হইলেও ফল্গু-ধারার ন্যায় প্রবহমান, (ঘ) অস্ট্রিয়ায় ভূমিদাসত্ব দূর না করিবার কুফল, (ঙ) সাফল্য : দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মেটারনিক্ কর্তৃক ইওরোপের শান্তি রক্ষা। ৫৫-৬০ পৃষ্ঠা]

8. Examine the foreign policy of Metternich during the period between 1815-1848. (C. U. 1948, 1954)

[উত্তর-সংকেত ৬নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত (৩) হইতে শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য]

9. "In the realm of politics the period from 1815-50 was one rather of aspirations than of achievements." Illustrate. (C. U. 1950)

[উত্তর-সংকেত : (১) ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ বা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা 'মেটারনিক্ যুগ' নামে পরিচিত। এই সময়ে মেটারনিক্ ছিলেন ইওরোপীয় রাজনীতির নিয়ামক। (২) দুইটি পরস্পর বিরোধী প্রভাবের সংঘর্ষ—প্রতিক্রিয়া ও উদারনীতি ; (৩) উদারনীতির সাফল্য অধিক নহে—(ক) বেলজিয়ামের স্বাধীনতা, (খ) গ্রীসের স্বাধীনতা, (গ) জার্মানির নানাস্থানে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, (ঘ) রাজশক্তি ভগবান-প্রদত্ত—এই কুসংস্কার হইতে জনগণের মুক্তি ; (৪) প্রধানতঃ মানসিক প্রস্তুতির যুগ : ইওরোপীয় কন্‌সার্ট কর্তৃক দমনকার্যের ফলে উদারনীতির সাফল্য ব্যাহত, কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির ফলে পরবর্তীকালে ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্ভব হইয়াছিল।

৬২-৬৪ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রীসের স্বাধীনতালাভ

(Independence of Greece)

রাশিয়ার জার পিটারের আমল হইতে (১৬৮২—১৭২৫) তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলে (১৭৬২—৯৬) এই নীতি বহুল পরিমাণে সাফল্য লাভ করে এবং রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের প্রাধান্য, ইউক্রেণ ও ক্রিমিয়ার আধিপত্য লাভে সমর্থ হয়। রুশ পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া কন্‌স্টানটিনোপ্‌ল্ দখল করা, বস্‌ফোরাস্ ও দার্দানেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করা এবং তথায় রুশ প্রাধান্য স্থাপন করা। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুখারেস্ট্-এর সন্ধি দ্বারা এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সন্ধি দ্বারা বেসারাবিয়া প্রভৃতি স্থানলাভের ফলে রাশিয়ার সীমা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্দেশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (sick man of Europe) বলিয়া বিবেচিত হয়। বস্তুত তুরস্ক সাম্রাজ্য তখন দুর্বলতার চরমে পৌঁছিয়াছিল।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। এই কারণে একাধিকবার এই সকল ইওরোপীয় দেশ রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দান করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হইলেও তুরস্কের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাবশতঃ সাম্রাজ্যের পতন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি রোধ করিতে পারিল না। দুইটি বিশেষ কারণে এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা পাশাগণ (Pashas) সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নামে মাত্রই তাঁহারা সুলতানের অধীন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর উদ্ধত পাশাদের মধ্যে আল্‌বানিয়ার আলি এবং মিশরের মেহেমেৎ আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হইলেও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা-বশতঃ পতন রোধ করা সম্ভব হইল না

দুই জনই স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পশ্চাতে জাতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি প্রভৃতির পার্থক্য ছিল সর্বপ্রধান কারণ। তুরস্ক সাম্রাজ্য কোন প্রকার স্বাভাবিক আনুগত্যের বন্ধন, শাসনব্যবস্থার ঐক্য, বা কৃষ্টিমূলক সংহতি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা, ধর্মনৈতিক বিভেদ, ভাষা ও আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য দিন দিনই তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিতেছিল।

পাশাদের স্ব স্ব প্রাধান্য

প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়া (Serbia) বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তুরস্কের সুলতান হইতে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিয়া লয়। কিন্তু গ্রীসই সর্বপ্রথম তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

সার্বিয়ার স্বায়ত্ত-শাসন লাভ

গ্রীসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম (Struggle for Independence by the Greeks):

সার্বিয়ার কৃষক সম্প্রদায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের নেতা কারা জর্জের নেতৃত্বে বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানের বিরোধিতা শুরু করিল এবং বহু অত্যাচার-অবিচার সহ্য করিয়া স্বায়ত্তশাসন আদায় করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু তখনও পশ্চিম ইওরোপের শক্তিবর্গ সেদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। কিন্তু ১৮২০-'২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক দ্বীপ মোরিয়া (Morea) এবং গ্রীস দেশে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র ইওরোপে এক চাঞ্চল্য দেখা দিল।

গ্রীসের বিদ্রোহে ইওরোপে চাঞ্চল্য

প্রধানতঃ, দুইটি কারণে গ্রীকদের মনে স্বাধীনতার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। (১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রীকগণ অত্যাচারিত হইতেছিল বলিয়া তাহারা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল—এইরূপ মনে করা ভুল। গ্রীকগণ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন যে-পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন ও ধর্মপালনের সুযোগ ভোগ করিত তাহা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশ আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিকগণ বা অস্ট্রিয়ার

বিদ্রোহের কারণ

প্রোটেস্টাণ্টগণও ভোগ করিত না।* ধর্ম পালন, সম্পত্তি সঞ্চয়, জন্ম ও শ্রেণীগত উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সরকারী-পদ লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার স্বাধীনতা তাহারা ভোগ করিত। এইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবার ফলেই গ্রীকদের মনে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ক্রমে জাগিবার সুযোগ পায়। গ্রীক চার্চ মুসলমানদের ঘৃণা পোষণে এবং গ্রীক জাতিকে ধর্মের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ঐ সময়ে প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গ্রীকদের মধ্যে এক গভীর শ্রদ্ধা দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যালোচনার মাধ্যমে গ্রীকগণ তাহাদের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতি যতই শ্রদ্ধাশীল হইতে লাগিল তাহাদের স্বাধীনতাস্পৃহাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যের এক পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে প্রাচীন গৌরবে পুনরায় গ্রীসকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক আগ্রহ তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। এই জাগরণ বা চেতনার পশ্চাতে কোরায়েস (Koraes) নামক একজন গ্রীক মনীষীর দান ছিল অপরিসীম।

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রীকদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা : স্বাধীনতা-স্পৃহা বৃদ্ধি

(২) প্রাচীন গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের আলোচনা : প্রাচীন গৌরব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রীকদের আগ্রহ

গ্রীকদের স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। তুরস্ক-সুলতান ঐ সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পাশা আলির (Ali) বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া (Moldavia and Wallachia) নামক দুইটি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আলেকজাণ্ডার ইপ্‌সিলান্টি (Alexander Ypsilanti) ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা ইপ্‌সিলান্টি রাশিয়ার সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ : মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ (১৮২৩)

* "The Christian (*in Turkey*) was allowed a greater measure of liberty than that enjoyed in any other country in Europe. Catholics in Ireland and Protestants in Austria might envy him his privileges. He was free to exercise his religion, to educate himself as he pleased, to accumulate wealth ; however humble his origin, in a system which accounted nothing of birth, he could hold high office in the Government." Lipson. P. 185.

কিন্তু মেটারনিকের চেষ্টায় জার আলেকজাণ্ডার গ্রীকদিগকে সাহায্য দানে নিরস্ত হইলেন। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ অনায়াসে দমন করা হইল। ইতিমধ্যে মোরিয়া নামক গ্রীক দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্রোহ এক বিরাট স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি পূর্ব হইতেই চলিতেছিল।

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ দমন

ন্যায্য-অধিকার নীতিতে (Legitimacy) বিশ্বাসী ভিয়েনা সম্মেলন গ্রীকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন সাহায্যই করিবে না এই কথা উপলব্ধি করিয়া গ্রীকগণ 'হিটাইরিয়া ফিলিকি' (Hetairia Philike) বা 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ' নামে গোপন সঙ্ঘ স্থাপন করে। ১৮১৪ হইতে ১৮২০ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সঙ্ঘের শাখা গ্রীসের সর্বত্র স্থাপিত হয়। প্রত্যেক স্থানের গণ্যমান্য গ্রীক মাত্রেই এই সঙ্ঘে যোগদান করেন। এই সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় বহু সভ্যের সহিত রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারের যোগাযোগ ছিল এবং গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধে রুশ সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে গ্রীকগণ নিশ্চিন্ত ছিল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মোরিয়ার বিদ্রোহের পূর্বেই গ্রীকদে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার কৃষকগণ গ্রীক ভূম্যধিকারীদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। সুতরাং সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহারা তেমন সাহায্য করে নাই। প্রধানতঃ, এই কারণেই মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার বিদ্রোহ বিফল হয়। কিন্তু মোরিয়ার বিদ্রোহে এক স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা দেখা গেল। সমগ্র দক্ষিণ গ্রীসের দেশগুলিতে বিদ্রোহ দাবাগ্নির ন্যায় বিস্তৃত হইল। ক্রমে উত্তর-গ্রীসের থেসালি, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অসংখ্য মুসলমানের রক্তে এই বিদ্রোহ অভিশপ্ত হইয়া উঠিল। তুরস্ক সরকার নৃশংস অত্যাচারের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করিতে চাহিলেন। তুরস্কের সুলতান কন্‌স্টান্‌টিনোপ্‌লের চার্চের অধিকর্তা পেট্রিয়ার্ক (Patriarch)-কে হত্যা করিয়া গ্রীক বিদ্রোহী কর্তৃক মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া এই স্বাধীনতা যুদ্ধ সমভাবে চলিল।

'হিটাইরিয়া ফিলিকি' নামে গোপন সঙ্ঘ স্থাপন

রুশ সাহায্যের আশা

মোরিয়ার বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-লাভের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি

উভয়পক্ষের নৃশংসতা : পেট্রিয়ার্কের হত্যা

এদিকে তুরস্কের সুলতান মিশর প্রদেশের পাশা মেহেমেৎ আলির সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মেহেমেৎ আলি ছিলেন তুরস্কের সুলতানের অবাধ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় মোরিয়া, সিরিয়া ও দামাস্কাস, এই কয়টি স্থান পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলিকে নিজ সাহায্যার্থে আমন্ত্রণ করিলেন। মেহেমেৎ আলি যুদ্ধে যোগদান করিলে যুদ্ধের গতি তুরস্কের অনুকূলে পরিবর্তিত হইল। এমতাবস্থায় রাশিয়া অত্যাচারিত গ্রীকদের রক্ষার্থে যুদ্ধে যোগদানে প্রস্তুত হইল। মেটারনিকের প্রভাবে গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়া নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার চিরাচরিত নীতিই ছিল তুরস্কের সাম্রাজ্যাংশ গ্রাস করিয়া রুশ রাজ্যসীমা বিস্তৃত করা। ইহা ভিন্ন বলকান দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া এক বিশাল স্লাভ্ সাম্রাজ্য গঠনের ইচ্ছাও রাশিয়ার ছিল। সুতরাং মেহেমেৎ আলির সাহায্য দান এবং পেট্রিয়ার্কের হত্যা রাশিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পথ পরিষ্কার করিল। ইংলণ্ডের পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন অংশ রাশিয়াকে গ্রাস করিতে দেওয়া কাম্য ছিল না।

মেহেমেৎ আলির সাহায্য গ্রহণ

রাশিয়ার গ্রীকদের পক্ষে যোগদানের প্রস্তুতি

সুতরাং গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের সুযোগে রাশিয়া যাহাতে গ্রীসের উপর আধিপত্য স্থাপন না করিতে পারে সেইজন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং (Canning) রাশিয়ার সহিত যুগ্মভাবে তুরস্ককে যুদ্ধ বিরতির জন্য চাপ দিতে মনস্থ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রথম জার আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইয়াছিল। তখন প্রথম নিকোলাস ছিলেন রাশিয়ার জার। ক্যানিং প্রথম নিকোলাসের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিলেন (৪ এপ্রিল, ১৮২৬)। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, তুরস্কের সুলতান যাহাতে গ্রীকদিগকে স্বায়ত্তশাসন দান করেন সেইজন্য ইংলণ্ড ও রাশিয়া যুগ্মভাবে চেষ্টা করিবে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হইবে—এইরূপ কোন শর্ত স্বীকৃত হইল না। পরবৎসর ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার সহিত মিলিত হইলে এই তিন দেশ যুগ্মভাবে তুরস্কের উপর চাপ দিতে প্রস্তুত হইল। এমন কি, প্রয়োজন হইলে সামরিক শক্তির সাহায্যে

ইংলণ্ড কর্তৃক রাশিয়ার যুদ্ধে বাধার সৃষ্টি

ইংলণ্ড রাশিয়ার যুগ্মভাবে তুরস্কের উপর চাপ

ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স—প্রয়োজনবোধে তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগে প্রতিশ্রুত

তুরস্ককে গ্রীকদের স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করিতে বাধ্য করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইল।* এই সূত্রে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের এক সম্মিলিত নৌবাহিনী ন্যাভারিনো (Navarino)-এর জলযুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের নৌবহর ধ্বংস করিল (১৮২৭)। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুরস্ক দুর্বল হইয়া পড়িলে স্বভাবতই গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্যের আশা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তুরস্ক সরকার তখনও গ্রীকদের সহিত যুদ্ধের অবসান করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

ন্যাভারিনোর যুদ্ধ (১৮২৭)

পর বৎসর (১৮২৮) রাশিয়ার জার নিকোলাস এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। এক বৎসরের মধ্যে তিনি তুরস্ককে আড্রিয়ানোপ্‌ল (Adrianople)-এর সন্ধি (১৮২৯) স্থাপনে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া আইনতঃ তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীন রহিলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে রাশিয়ার আধিপত্যাধীনে আসিল। (২) বস্‌ফোরাস্‌ ও দার্দানেলিজ প্রণালীর অবাধ ব্যবহারের অধিকার রাশিয়াকে দেওয়া হইল। (৩) রাশিয়া গ্রীসকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দান করিয়া নিজ আধিপত্যাধীনে রাখিতে চাহিলে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া তাহাতে বাধা দান করিল। ইতিমধ্যে পামারস্টোন (Palmerston) ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব হইলে তাঁহার চেষ্টায় গ্রীসদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। বেভেরিয়ার রাজা লুই-এর পুত্র ওথো (Otho) গ্রীসের রাজপদ গ্রহণ করিলেন। গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুরস্ক সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ

আড্রিয়ানোপলের সন্ধি (১৮২৯)

গ্রীসের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত

Questions & Hints

Explain how Greece achieved her independence. (C. U. 1923)

Write a note on: Greek War of Independence. (C. U. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক ইওরোপের 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হয়। রাশিয়ার আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ

* Treaty of London, 1827.

দুর্বলতায় তুরস্ক সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইয়া পড়িলে স্বভাবতই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে, বিশেষতঃ বলকান দেশগুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা, সাম্রাজ্যাধীন জনগণের জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিভেদ, শাসকের প্রতি শাসিতের স্বাভাবিক আনুগত্যের অভাব বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা স্পৃহা জাগরিত করে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই সার্বিয়া নামক ক্ষুদ্র দেশটি তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার আদায় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু গ্রীস-ই সর্বপ্রথম তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে সমর্থ হয়। (২) দুইটি কারণে গ্রীকদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগে: (ক) তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীন থাকাকালীন যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ, (খ) প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ; (৩) বিদ্রোহ: (ক) মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া—তুরস্ক কর্তৃক দমন, (খ) মোরিয়া দ্বীপের বিদ্রোহ, 'হিটাইরিয়া ফিলিকি'র প্রভাব, সমগ্র দক্ষিণ, ক্রমে উত্তর গ্রীসে বিদ্রোহের বিস্তার, (গ) রুশ সাহায্যের আশা, (ঘ) উভয় পক্ষের নৃশংসতা, (ঙ) পেট্রিয়ার্কের হত্যা; (৪) যুদ্ধে যোগদানের জন্য রাশিয়ার প্রস্তুতি; (৫) ইংলণ্ড কর্তৃক বাধা দান,—ইংলণ্ড ও রাশিয়া এবং পরে ফ্রান্সের মিলিত চেষ্টা; (৬) রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ; (৭) আড্রিয়ানোপ্‌লের সন্ধি, ১৮২৯; (৮) গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত। ৬৯-৭৪ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

(Eastern or Near Eastern Question : Crimean War)

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্যের* সমস্যা প্রধানতঃ দুইটি কারণ হইতে উৎপত্তি লাভ করে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা; দ্বিতীয়তঃ, তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কৃষ্ণসাগর, বস্‌ফোরাস ও দার্দানেলিজ প্রণালীর উপর রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা।

পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার মূল কারণ:
(১) তুরস্কের পতনোন্মুখতা,
(২) রাশিয়ার বিস্তার নীতি

---

* পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য বলিতে ইওরোপের পূর্বাঞ্চল বুঝায়। সুদূর বা দূরপ্রাচ্য বলিতে চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ (আমাদের নিকট-প্রাচ্য) বুঝায়।

এই সমস্যা আরও কয়েকটি কারণে অধিকতর জটিল হইয়া উঠে। রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগে বলকান দেশগুলি স্বাধীন হইতে সচেষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন বলকান দেশগুলির জনসংখ্যার প্রায় সকলেই ছিল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী অথচ তুরস্ক ছিল মুসলমান দেশ। এই ধর্মের বৈষম্যও বলকান দেশগুলির মধ্যে তুরস্কের প্রতি এক বিদ্বেষভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি তুরস্ক সরকারের শাসন পরিচালনার অক্ষমতা, অত্যাচারী ও প্রগতিহীন প্রাচীনপন্থী শাসনপদ্ধতি এই সকল সমস্যার জটিলতা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

রাজনৈতিক, ধর্ম নৈতিক প্রভৃতি কারণে সমস্যা জটিলতর

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির—বিশেষতঃ ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের স্বার্থের দিক দিয়া রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে, অর্থাৎ তুরস্কের দিকে রাজ্য বিস্তার মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিস্তার নীতি রুদ্ধ করিতে না পারিলে ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই কারণে ইংলণ্ডের নীতি ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা। অস্ট্রিয়ার পক্ষে রাশিয়ার বিস্তার নীতির বাধাদানের প্রয়োজন ছিল ততোধিক। কারণ বলকান দেশগুলির বা দানিউব অঞ্চলে রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃতি অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী ছিল। দানিউব নদী অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। দানিউব নদীর মোহনায় রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইলে অস্ট্রিয়ার জলপথের বাণিজ্য, তথা অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফ্রান্সের ধর্মগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দিক দিয়া রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাসের নীতির বাধাদান করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ: ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হওয়ার ভয়, অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়, ফ্রান্সের ধর্মসংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয়

সুতরাং আভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা ইওরোপের এক অত্যন্ত জটিল সমস্যায় পরিণত হয়। বস্তুত রাশিয়ার জার পিটারের আমল (১৬৮২-১৭২৫) হইতেই তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি শুরু হয়। দ্বিতীয় ক্যাথারিণের রাজত্বকালে এই নীতি সাফল্যের সহিত অনুসৃত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কুস্থুক-কেইনার্‌জি (Kutchuk Kainardji)-এর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া

পিটার ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলে রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাসের নীতি: কুস্থক-কেইনারজি (১৭৭৪) ও জাসির সন্ধি (১৭৯২), ক্রিমিয়া দখল (১৭৮৩)

কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। ইহা ভিন্ন ডন ও নিপার নদীর মোহানায় রুশ আধিপত্য স্থাপিত হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রাশিয়া দানিউব ও কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যপোত চালনার অধিকার লাভ করে। সর্বোপরি তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রীক খ্রীষ্টানদের ধর্মাধিষ্ঠানের উপর অভিভাবকত্ব করিবার অধিকার রাশিয়াকে দেওয়া হয়। রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আমলেই জাসির সন্ধি (Treaty of Jassy) দ্বারা (১৭৯২) রাশিয়া ওচাকভ্ (Ochakov) অধিকার করে। ইহার পূর্বেই (১৭৮৩) ক্যাথারিণ ক্রিমিয়া দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা : লর্ড মোর্‌লে-এর বর্ণনা

উনবিংশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা অত্যধিক জটিল আকার ধারণ করে। লর্ড মোর্‌লে (Lord Morley) উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে "পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে ক্রম পরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা"* বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

টিলজিট্-এর সন্ধির পর হইতে রাশিয়ার তুরস্ক গ্রাসের নীতি পুনরায় গ্রহণ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তুরস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে টিলজিট্ (Tilzit)-এর সন্ধির পর জার আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইলে এবং রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ক-গ্রাস নেপোলিয়ন কর্তৃক সমর্থিত হইবে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইলে জার আলেকজাণ্ডার তুরস্কের দিকে পুনরায় দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেপোলিয়নের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। তদুপরি ইওরোপে রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন হেতু রাশিয়া তুরস্ক-গ্রাস নীতিতে কোন সাফল্যলাভে সমর্থ হইল না।

বুকারেস্ট্-এর সন্ধি (১৮১২)

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুকারেস্ট্ (Bukharest)-এর সন্ধি দ্বারা জার আলেকজাণ্ডার তুরস্কের সহিত দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিলেন এবং তাহার পরিবর্তে বেসারাবিয়া (Bessarabia) নামক স্থানটি লাভ করিলেন।

* "...intractable and interwoven tangle of conflicting interests, rival peoples and antagonistic faiths."—*Lord Morley.* Quoted by Ketelbey p. 192.

ইহার ফলে রাশিয়ার রাজ্যসীমা প্রুথ্ (Pruth) নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার তুরস্ক-নীতির এক আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই দুই দেশই রাশিয়ার ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অস্ট্রিয়ার প্রিন্স মেটারনিক্ "ন্যায্য অধিকার" (Legitimacy) নীতির দোহাই দিয়া রাশিয়ার বলকান দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তৃতি রোধ করিতে চাহিলেন। ইংলণ্ডের ক্যাসালরীগ্, ক্যানিং, পামারস্টোন প্রভৃতি সকলেই রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করেন। ফ্রান্স ধর্মসংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের পক্ষপাতী ছিল। রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি ইওরোপে এক ভীতির সৃষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার এক নূতন পর্যায় শুরু হয়। নিজেদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করিয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি রাশিয়ার ক্রম-বিস্তার নীতির প্রতি আর অমনোযোগী থাকিতে পারিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আক্রমণ ইওরোপের শক্তি-বর্গের চেষ্টায় প্রতিহত হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না বটে, কিন্তু তুরস্কের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়া তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা আদায় করিতে সমর্থ হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আড্রিয়ানোপ্লের সন্ধি দ্বারা গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইওরোপীয় দেশগুলির তুরস্ক নীতির পরিবর্তন

রাশিয়ার বিস্তার নীতির ফলে ইওরোপে ভীতির সঞ্চার

তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ইওরোপীয় শক্তিবর্গ দ্বারা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা: আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের অক্ষমতা

গ্রীসের স্বাধীনতা-যুদ্ধ দমন করিবার উদ্দেশ্যে তুরস্কের সুলতান মিশরদেশের পাশা মেহেমেৎ (মহম্মদ) আলি ও তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম আলির সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কার-স্বরূপ সুলতান ক্রীট দ্বীপটির শাসনভার মেহেমেৎ আলিকে দিয়াছিলেন। মেহেমেৎ আলি বা ইব্রাহিম তাহাতে

গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ: মেহেমেৎ আলির সহায়তা

সন্তুষ্ট হইলেন না। নিজ বলে উপযুক্ত পুরস্কার আদায় করিবার জন্য ইব্রাহিম প্যালেস্টাইন আক্রমণ করিলেন এবং এ্যাকার ও দামাস্কাস দখল করিলেন; এমনকি তিনি কন্স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ দখল করিতে উদ্যত হইলেন। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স তখন বেলজিয়ামের স্বাধীনতা প্রশ্ন লইয়া বিব্রত। সুতরাং সুলতানের আবেদন অনুযায়ী তাহারা সাহায্য পাঠাইতে সমর্থ হইল না। পরিস্থিতির চাপে তুরস্কের সুলতান তাঁহার প্রধান শত্রু রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইলেন। রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় শক্তিগুলির চমক ভাঙ্গিল। রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ না দেওয়ার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া তুরস্কের সুলতানকে মেহেমেৎ আলির সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য করিল। এইজন্য তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলিকে সীরিয়া দান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রাশিয়া তুরস্ককে বিপদে সাহায্য দানের পুরস্কারস্বরূপ উন্‌কিয়ার স্কেলেসি (Unkiar Skelessi) নামক সন্ধি (১৮৩৩) দ্বারা (১) প্রয়োজনবোধে সামরিক সাহায্য দ্বারা রাশিয়া তুরস্ককে রক্ষা করিবার অধিকার লাভ করিল; (২) দার্দানেলিজ প্রণালীতে রুশ যুদ্ধ-জাহাজ চলাচলের অধিকার স্বীকৃত হইল; (৩) যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশের জাহাজ দার্দানেলিজ প্রণালীতে চলাচল নিষিদ্ধ হইল।

মেহেমেৎ আলির অসন্তুষ্টি ও যুদ্ধ

রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে সাহায্যদান : ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চমক ভঙ্গ

ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের চাপে যুদ্ধের অবসান : মেহেমেৎ আলির সীরিয়া লাভ

রাশিয়ার পুরস্কার—উন্‌কিয়ার স্কেলেসির সন্ধি

এই সন্ধির শর্তাবলী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোন এই সন্ধিপত্র নাকচ করিতে এবং রাশিয়ার বিস্তার-নীতি বন্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) তুরস্কের সুলতান মেহেমেৎ আলির দখল হইতে সীরিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইংলণ্ড ও রাশিয়া মেহেমেৎ আলির শক্তি খর্ব করিবার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু ফ্রান্স এই যুদ্ধে গোপনে মেহেমেৎ আলিকে সাহায্য দিতে লাগিল। কিন্তু পামারস্টোনের কূটনৈতিক চেষ্টার ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের কন্‌ভেন্‌শনে (Convention of London)

মেহেমেৎ আলির বিরুদ্ধে সুলতানের যুদ্ধ ঘোষণা

এই সমস্যার মীমাংসা হইল। মেহেমেৎ আলি সীরিয়া ত্যাগ করিলেন; উন্‌কিয়ার স্কেলেসির সন্ধির শর্তাদির সামান্য পরিবর্তন করিয়া যুদ্ধের সময় দার্দানেলিজ প্রণালী সকল ইওরোপীয় শক্তির নিকটই সমভাবে বন্ধ থাকিবে স্থির হইল। এইভাবে ফরাসী কূটনৈতিক চাল বিফল করা হইল এবং রাশিয়ার ক্ষমতা কতক পরিমাণে খর্ব করা হইল।

লণ্ডনের কন্‌ভেনশন্ (১৮৪০)

পরবর্তী কয়েক বৎসর (১৮৪১-৫৩) পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় কোন প্রকার নূতন জটিলতা দেখা দিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার নিকোলাস পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস নীতি গ্রহণ করিলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল।

ইওরোপে শান্তি (১৮৪১-৫৩)

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৩-৫৬, (Crimean War):

কারণ (Causes): ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্যে সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের কন্‌ভেন্‌শনের পর কয়েক বৎসর পূর্বাঞ্চল বা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার দ্বারা ইওরোপের শান্তি কোন প্রকার ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া ইংলণ্ডের সহিত যুগ্মভাবে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ডের অমতে তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ অসম্ভব হইবে বিবেচনা করিয়া নিকোলাস্ প্রস্তাবটি ইংলণ্ডের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন। তুরস্ককে তিনি 'অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং এই দুর্বল 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি'র (sick man) মৃত্যুর পূর্বেই—অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই উহা ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন।* ইংলণ্ড মিশর ও ক্রীট

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব (১৮৫৩)

ইংলণ্ডকে মিশর ও ক্রীট দ্বীপ দিবার প্রস্তাব

*"When we have agreed, I am quite without anxiety as to the rest of Europe; it is immaterial what others may think or do". Czar Nicholas I to the English Ambassador to Russia. Quoted by C. D. Hazen. P. 560.

দ্বীপ দখল করিয়া ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথ নিরাপদ রাখিতে পারিবে এই ইঙ্গিতও তিনি দিলেন। কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা (integrity of Turkey) ছিল ইংলণ্ডের চিরাচরিত নীতি। স্বভাবতই জার নিকোলাসের প্রস্তাব ইংলণ্ডের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না, উপরন্তু রাশিয়ায় অভিপ্রায় সম্পর্কে ইংলণ্ডে এক গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হইল।

ইংলণ্ড কর্তৃক নিকোলাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

ঐ সময়ে রাশিয়া, ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে প্যালেস্টাইনে অবস্থিত খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থানের আধিপত্য লইয়া এক বিবাদ চলিতেছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ও জীবনের স্মৃতিজড়িত সকল স্থানই খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কুস্থক-কেইনারজির সন্ধির শর্তানুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত গ্রীকখ্রীষ্টান,* অর্থাৎ গোঁড়া খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থানগুলির এবং গ্রীকখ্রীষ্টান যাজকদের অভিভাবকত্ব রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। অপর দিকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি† দ্বারা ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থান ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের অভিভাবকত্ব দেওয়া হইয়াছিল ফ্রান্সকে। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধের সময় এই সকল অধিকার কোন পক্ষই কার্যকরী করিবার সুযোগ পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্স ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের শর্তানুযায়ী পূর্বেকার অধিকার পুনরায় তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইল। রাশিয়ার জার নিকোলাস ফ্রান্সের এই সকল অধিকার নাকচ করিবার জন্য তুরস্কের সুলতানকে চাপ দিলেন। সুলতান উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। নিকোলাস কালক্ষেপ না করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন সকল গোঁড়া ক্যাথলিক ও তাহাদের ধর্মস্থানের উপর অভিভাবকত্ব দাবি করিলেন। তুরস্কের সুলতান ধর্মস্থানের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহায় প্রজাবর্গের উপর রাশিয়ার কোনপ্রকার অধিকার স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। জার নিকোলাস

গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির অনুযায়ী ফ্রান্স কর্তৃক ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থানের অভিভাবকত্ব দাবি : রাশিয়া কর্তৃক গ্রীক খ্রীষ্টানযাজক ও ধর্মস্থানের অভিভাবকত্ব দাবি

রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল

* "গ্রীকখ্রীষ্টান বা গোঁড়া খ্রীষ্টান বলিতে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মাধিষ্ঠান হইতে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বুঝায়। রোম হইতে প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ল্যাটিন খ্রীষ্টান বলা হয়।

† **Capitulations of 1740.**

সঙ্গে সঙ্গে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করিয়া লইলেন। এই দুইটি স্থান আইনত তুরস্ক-সুলতানের অধীন হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রভাবাধীন ছিল। এখন রাশিয়া সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই দুইটি স্থান সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইল। সুলতান রাশিয়ার সৈন্য বাহিনীর অপসারণ দাবী করিলেন কিন্তু রাশিয়া সে-বিষয়ে কর্ণপাত না করিলে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (অক্টোবর, ১৮৫৩)।

তুরস্ক কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ রহিল না। ইংরেজগণ রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ছিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলতা উদারনৈতিক ইংরেজ জাতির নিকট সমর্থনযোগ্য ছিল না। ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে যখন ব্যাপকভাবে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল তখন একমা' রাশিয়া-ই অনায়াসে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমনকি হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে রাশিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ইওরোপের সর্বত্রই বিপ্লবের প্রভাবে কোন না কোন পরিব ঘটিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র রাশিয়ার প্রজাবর্গই সর্বপ্রক উদারনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। বহুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়া ইংরেজ জাতির অধিকাংশই তখন কোন প্রকার একটি যুদ্ধ বাধাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। লর্ড পামারস্টোন রাশিয়ার বিস্তার নীতিতে বাধাদানের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথ রাশিয়ার বিস্তার নীতির ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে এই আশঙ্কা ছিল ইংরেজ সরকারের তুরস্ক-নীতির মূল সূত্র। ভূমধ্য-সাগরের পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এজন্য ব্রিটেন তুরস্কের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।* অপরদিকে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইহার পশ্চাতেও

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা নীতি পরিত্যক্ত

ইংরেজ জাতির যুদ্ধ-স্পৃহা

পামারস্টোনের যুদ্ধ-নীতি

নেপোলিয়নের যুদ্ধ বাধাইবার প্রয়োজনীয়তা

*"...the British Government needed an independent Turkey for the security of the eastern Mediterranean" J. A. P. Taylor : *The Struggle for Mastery in Europe*, p. 69.

কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তৃতীয় নেপোলিয়ন জার নিকোলাসের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ নিকোলাস তাঁহাকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেও চিঠিপত্রাদিতে তিনি তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিয়েনা চুক্তি নাশ করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পরাজয়ের অপমান দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন নেপোলিয়ন মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন।* তৃতীয়তঃ, এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিয়া এবং যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জন করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ঐতিহ্য তিনি ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। তৃতীয় নেপেলিয়ন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইয়া কৌশলে স্বয়ং ফরাসী সম্রাটপদ গ্রহণ করেন এবং প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ফরাসী জাতি যাহাতে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির উন্মাদনায় মাতিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে তিনি বিনাশ করিয়াছেন সেদিকে মনোযোগ না দিতে পারে সেজন্য নেপোলিয়নের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।* এই সকল কারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইল। রুশ-তুরস্কের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ারও শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রাশিয়া এবং তুরস্ক উভয় দেশই ছিল অস্ট্রিয়ার নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। এই দুই দেশের পরস্পর যুদ্ধ অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তার পরিপন্থী ছিল। ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়া রাশিয়ার বিস্তার-নীতি ভীতির চক্ষে দেখিত। অস্ট্রিয়ার চেষ্টায় ভিয়েনা নগরীতে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে 'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্র' (Vienna Note) নামে এক প্রস্তাব-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই প্রস্তাবে কুস্থক-কেইনারজি ও আড্রিয়ানোপলের

জার নিকোলাসের প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের অসন্তুষ্টি

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মস্কো অভিযানের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির প্রয়োজনীয়তা

অস্ট্রিয়ার ভীতি

'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্র'

*"Napoleon needed success for the sake of his domestic position" Vide *The Struggle for Mastery in Europe*. Taylor pp. 65-66.

সন্ধির শর্তানুযায়ী তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাবর্গের উপর রাশিয়াকে যে-অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করা হইল কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু যাহাতে রাশিয়া না করে সেই দিকে জার নিকোলাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। নিকোলাস নিজের সুবিধানুযায়ী এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিলেন। এবিষয় লইয়া রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। রাশিয়া শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া যুদ্ধের মূল কারণ দূর করিল। যদিও ইহাতে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ নষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তি এখন কৃষ্ণসাগরে রুশ প্রাধান্য নাশ, দানিউব নদীতে নৌচলাচলের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃতি ও তুর্কী খ্রীষ্টানদের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব এই তিনটি শর্ত রাশিয়ার উপর চাপাইবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ চালাইতে লাগিল।

নিকোলাস কর্তৃক সুবিধানুযায়ী 'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্রের' ব্যাখ্যা

রাশিয়া কর্তৃক ভিয়েনা প্রস্তাব অগ্রাহ্য : ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে যোগদান না করিলেও সর্বদা রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন রহিল। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার [illegible] (Olmutz) নামক স্থান-সংক্রান্ত কূটনৈতিক বিবাদে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দান করিয়াছিল। অস্ট্রিয়া শত্রুভাবাপন্ন হওয়ায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় সহজ হইল বটে, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া রাশিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ ক[illegible]স।

অস্ট্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিলেও পরোক্ষভাবে শত্রুতাসাধন

প্রাশিয়া বিসমার্কের পরামর্শে এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রহিল। ইহার ফলে পরবর্তীকালে জার্মান ঐক্য সাধনের যুদ্ধে প্রাশিয়া রাশিয়ার বন্ধুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রাশিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত

পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় কোন প্রকার স্বার্থ জড়িত না থাকা সত্ত্বেও পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়া পনর হাজার সৈন্যসহ মিত্রপক্ষে যোগদান করিল।

পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার মিত্রপক্ষে যোগদান

এই যুদ্ধে যোগদানে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইতালীয় ঐক্যের সমস্যাকে এক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত করা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহানুভূতি, বিশেষতঃ ফ্রান্সের বন্ধুত্ব লাভ করা এবং ফ্রান্সের সহায়তায় ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

যুদ্ধের ঘটনা (Events of the War) : যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে রাশিয়া সিলিস্ট্রিয়া (Silistria) নামক স্থানটি আক্রমণ করিল। কিন্তু এই স্থানটি অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এমন সময় অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। ইহাতে রাশিযাকে অনতিবিলম্বে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে বলা হইল। সিলিস্ট্রিয়ার অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ-ক্ষমতা তদুপরি অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নিকোলাসকে মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগে বাধ্য করিল। যে-কারণে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল তাহা রাশিয়ার এই দুইটি স্থান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হইল। কিন্তু মিত্রশক্তি তখন যুদ্ধ অবসানের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এইভাবে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল। এই পর্যায়ে ক্রিমিয়া ও সিবাস্তোপোল আক্রমণ হইল প্রধান ঘটনা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিত্রশক্তি আল্‌মা (Alma)-র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রিমিয়া দখল করিল। বালাক্লাভা ও ইঙ্কারম্যান (Balaclava and Inkerman) এই দুই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইলে সিবাস্তোপোলের পতন ঘটিল।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়

সিলিস্ট্রিয়া আক্রমণ ; অস্ট্রিয়ার চরমপত্র : রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়

আল্‌মা, বালাক্লাভা ও ইঙ্কারম্যান-এর যুদ্ধ : রুশ পরাজয়

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হইল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অধিককাল যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি কার্‌স (Kars) নামক স্থানটি জয় করিয়া পরাজয়ের অপমান হইতে রক্ষা পাইলেন। এমন সময় অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে পুনরায় যুদ্ধের অবসান

নিকোলাসের মৃত্যু : দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন লাভ ; রাশিয়া কর্তৃক কার্‌স দখল ;

অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় চরমপত্র : যুদ্ধাবসান

ঘটাইবার জন্য কতকগুলি শর্তসম্বলিত এক চরমপত্র দিলে রাশিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটিল।*

প্যারিসের সন্ধি (মার্চ, ১৮৫৬) (Peace of Paris) :

প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির শর্তগুলিকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ের শর্তদ্বারা (১) যুদ্ধের সময় কৃষ্ণসাগর ও দার্দানেলিজ প্রণালী সকলের নিকট সমভাবে বন্ধ করা হইল; (২) সকল দেশের বাণিজ্যপোত কৃষ্ণসাগর ও দার্দানেলিজ প্রণালীতে চলাচলের সমান অধিকার পাইল; (৩) দানিউব নদীতে নৌচালনার অবাধ অধিকার সকল দেশকেই সমানভাবে দেওয়া হইল; (৪) কৃষ্ণসাগর বা দার্দানেলিজ উপকূলে রাশিয়া বা তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন নিষিদ্ধ করা হইল। দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্তদ্বারা (১) রাশিয়া তুরস্কের গোঁড়া খ্রীষ্টানদের উপর অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিল; (২) রাশিয়া দক্ষিণ-বেসারাবিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দিল, ফলে রুশ রাজ্যসীমা দানিউব অঞ্চল হইতে অপসারিত হইল। তৃতীয় পর্যায়ের শর্তদ্বারা (১) তুরস্ককে ইওরোপীয় আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের অধীনে আসিতে এবং ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ে যোগদান করিতে দেওয়া হইল; (২) ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্কের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল; (৩) সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসন তুরস্ক স্বীকার করিয়া লইল এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মনোযোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল।

প্রথম পর্যায়ের শর্ত

দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্ত

তৃতীয় পর্যায়ের শর্ত

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তথা প্যারিসের সন্ধির গুরুত্ব (Importance of the Crimean War or Peace of Paris) :

প্রথমতঃ, ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনের প্রস্তাবক্রমে স্থির হইল যে, কোন ইওরোপীয় শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বে শান্তিপূর্ণ

* ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সামরিক চিকিৎসা বিভাগের ত্রুটির ফলে ইংরেজ সেনাবাহিনীর মধ্যে দারুণ পীড়া দেখা দেয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁহার সেবাকার্য দ্বারা মিত্র ও শত্রুপক্ষের রুগ্ন ও আহত সৈনিকদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

উপায়ে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা অবশ্যই করিবে। এই সদিচ্ছা প্রকাশের মধ্যে কাহারো আন্তরিকতা ছিল না বটে, তথাপি আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি রক্ষার প্রয়োজন যে অনুভূত হইতেছিল তাহা এই প্রস্তাব হইতেই বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, জলযুদ্ধ নিযন্ত্রণের একটি নূতন আন্তর্জাতিক নীতি প্যারিস সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয। নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ হইতে শত্রুপক্ষের কোন জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা নিষিদ্ধ করা হইল। যুদ্ধ-সামগ্রীর (contraband of war)ক্ষেত্রে অবশ্য এই নীতি প্রযোজ্য হইবে না। তৃতীয়তঃ, এই যুদ্ধের দ্বারা রাশিযার ক্রম-বিস্তার নীতি রুদ্ধ হইল এবং রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল। তুরস্ক আরও কিছুকাল নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিবার অর্থাৎ একটি সাম্রাজ্য হিসাবে টিকিযা থাকিবার সুযোগ লাভ করিল। চতুর্থতঃ, ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয নেপোলিয়ন কর্তৃক বোনাপার্টির আমলের ফরাসী সাম্রাজ্যের মর্যাদা পুনরায ফিরাইযা আনিবার চেষ্টা অতি সামান্যভাবে সফল হইল। পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ড এই যুদ্ধের ফলে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইযা পড়িল। ইহা ভিন্ন এই যুদ্ধ হইতে ইওরোপীয মহাদেশে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার মত সামরিক শক্তি ইংলণ্ডের নাই একথা প্রমাণিত হইল। সমুদ্রবক্ষে প্রাধান্য এবং নিজ দেশ রক্ষার জন্য প্রযোজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য থাকিলেও ইওরোপীয মহাদেশের স্থলযুদ্ধে তেমন তৎপরতা বা শক্তি দেখাইবার মত ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাই একথা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রমাণিত হইল।* ষষ্ঠতঃ, ক্রিমিযার যুদ্ধে ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত এবং কনসার্ট অব ইওরোপ কর্তৃক সংরক্ষিত ইওরোপীয় শান্তির যুগের অবসান ঘটাইয়া এক যুদ্ধের যুগের সূচনা করিল।† ইংরেজদের স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া অনেকেই ইংলণ্ডের পক্ষে এই যুদ্ধে

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত

জলযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত

রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস ; ক্রমবিস্তার প্রতিহত

তৃতীয় নেপোলিয়নের গৌরব বৃদ্ধি

* "One of the first and most important of these general results was the putting an end to Great Britain as a military factor in European politics." *World History*, Fueter, p. 220.

† "The Crimean War also opened an era of great wars on Europe." *Idem.*

যোগদান নিবু'দ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়াছেন, কিন্তু ইওরোপের বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। এই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধে যোগদান করা ইংলণ্ডের পক্ষেও অযৌক্তিক ছিল না।

ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি

সপ্তমতঃ, ইতালির রাজনৈতিক ঐক্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াই পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্যাভুর (Cavour) ইতালির ঐক্যের প্রশ্নকে এক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যে ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতালির ঐক্যের সূত্রপাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই হইয়াছিল।* ইহা ভিন্ন, ইতালির ঐক্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ : ইতালির সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত

অষ্টমতঃ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পশ্চাতে আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা কতদূর দায়ী ছিল সেই কথা উপলব্ধি করিয়া জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপে রুশ অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হওয়ায় রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি এক নূতন পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে মধ্য-এশিয়ায় পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত রাশিয়ার রাজ্য-সীমা বিস্তারলাভ করিল। দক্ষিণে ককেশাস পর্বতের পাদদেশ রুশ রাজ্যভুক্ত হইল। ইহা ভিন্ন, এই সময় হইতেই রুশ পররাষ্ট্র-নীতি ফ্রান্সের বিরোধিতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ফল হিসাবেই ফরাসী দ্বিতীয় সাম্রাজ্য (Second French Empire)-এর পতন ঘটান রুশ

পারস্য ও আফগানিস্তানের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি

* "Out of the mud of Crimea a new Italy was made and less obviously a new Germany". Ketelbey, p. 210.

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার শত্রুতা : জার্মানি ও ইতালির প্রাধান্য নাশ

পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। নবমতঃ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পূর্ব-সহানুভূতি ও সাহায্যের কথা বিস্মৃত হইয়া রাশিয়ার বিরোধিতা করায় পরবর্তী বহু বৎসর ধরিয়া অস্ট্রিয়া রাশিয়ার সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।* এই কারণেই অস্ট্রিয়াকে ইতালি ও জার্মানির হস্তে বার বার পরাজিত হইতে হইয়াছিল। ফলে ইতালি ও জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য চিরতরে লোপ পাইয়াছিল, স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি ও জার্মান রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইওরোপের শান্তিভঙ্গ

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের শান্তি ভঙ্গ করিয়া পরবর্তীকালের কয়েকটি যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল।

সমালোচনা (Criticism) :

অনেকের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যেমন অতি সামান্য কারণে শুরু হইয়াছিল, উহার প্রকৃতিও ছিল তেমনি সংকীর্ণ ও গৌরবহীন, আর উহার ফলাফল ছিল ততোধিক নগণ্য। এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী ঐতিহাসিক ও মন্ত্রী এ্যাডল্‌ফি থিয়াস´ (Adolphe Thiers) ইহাকে "কবরের চাবিকাটি লইয়া জঘন্য যাজকদের মধ্যে দ্বন্দ্বপ্রসূত যুদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।† কিংলেক (Kinglake), স্যার রবার্ট মোরিয়ার (Sir Robert Morier) প্রমুখ অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে আধুনিক যুগের সর্বাধিক অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) প্রমুখ অন্যান্য লেখকগণ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। ইঁহাদের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ না ঘটিলে

কারণ অতি সামান্য, প্রকৃতি সংকীর্ণ, ফলাফল নগণ্য

থিয়াস, কিংলেক ও স্যার রবার্ট মোরিয়ার-এর অভিমত : আধুনিক যুগের সর্বাধিক অনাবশ্যকীয় যুদ্ধ

* "The Crimean war checked and humiliated Russia, gave a new lease of life to Turkey under the joint protection of the powers. Napoleon III gained a great advertisement, England a heavy National Debt, Austria an enemy for a generation." Ketelbey. p. 210.

† "A war to give a few wretched monks the key of Grotto."—*Thiers ;* Ketelbey, p. 191.

বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইত না এবং কন্‌স্টান্‌টিনোপল রাশিয়ার দখলে চলিয়া যাইত। বস্তুতঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলেই ইতালি ও জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্য, বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা, প্রভৃতি ইওরোপীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

লর্ড ক্রোমার-এর মত: বলকান স্বাধীনতা ও তুরস্কের নিরাপত্তা যুদ্ধের ফলে সংঘটিত

আধুনিক ঐতিহাসিক টেলর (G. A. P. Taylor)-এর মতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর সন্দেহ হইতেই এই যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল, পরস্পর আক্রমণ হইতে নহে। তথাপি ইহা একটি অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ ছিল, একথা বলা চলে না।* তাঁহার মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের স্বার্থের জন্য সংঘটিত হইয়াছিল তুরস্কের স্বার্থে নহে। এই যুদ্ধ রাশিয়ার বিরুদ্ধে চালান হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া উহা তুরস্কের স্বপক্ষের যুদ্ধ একথা বলা চলে না।† টেলর একথাও বলেন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিয়া রাশিয়া অস্ট্রিয়ার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেই সূত্রে ইতালি ও জার্মানির উপর রাশিয়ার প্রাধান্যমূলক প্রভাব বিস্তৃতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কারণ ইতালি ও জার্মানি তখন অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যাধীন ছিল। এদিক্ দিয়া বিচার করিলে মধ্য-ইওরোপকে রুশ প্রাধান্য হইতে মুক্ত রাখা ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে কোন দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপিত হয় নাই; এই যুদ্ধের ফলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যারও কোন উপযুক্ত সমাধান সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছিল। সাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে রাশিয়া অপসারিত হইলেও ঐ সময়ে রাশিয়া মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইয়াছিল। তথাপি এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ ফল অধিক নহে

* "Mutual fear, not mutual aggression, caused the Crimean War. Nevertheless it was not a war without a purpose" Taylor : *The Struggle for Mastery in Europe*, p. 61.

† "... it was fought against Russia not in favour of Turkey." *Idem.*

ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা ইত্যাদি ইহার গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ ফল

ও পরোক্ষ ফলাফলের গুরুত্ব বিচার করিয়া ইহাকে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক যুদ্ধ বলা চলে না। ইতালির ঐক্য, জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা ও পুনর্গঠন, ভিয়েনা ব্যবস্থার লোপ—ইত্যাদি সব কিছুই ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া এই দুইটি স্থানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৮৫৯) এই দুইটি স্থান ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এক বিরাট স্রোতস্বতীর ন্যায় দুই কূল ছাপাইয়া সমগ্র ইওরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের এক প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং ইওরোপীয় ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব কম নহে।

Questions & Hints

1. Discuss the causes and consequences of the Crimean War. (C. U. 1955)

What were the causes of the Crimean War? What were its results? (C. U. 1953)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ পূর্বাঞ্চলের সমস্যার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। (২) কারণ : (ক) জার নিকোলাসের তুরস্ক ভাগ করিয়া লইবার ইচ্ছা—ইংলণ্ডের নিকট প্রস্তাব—ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, (খ) গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব, (গ) রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল, (ঘ) তুরস্ক কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, (ঘ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থ, (চ) অস্ট্রিয়ার ভীতি—'ভিয়েনা প্রস্তাব-পত্র' (Vienna Note), (ছ) নিকোলাস কর্তৃক ভিয়েনা প্রস্তাব অগ্রাহ্য, (জ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধে যোগদান ;—পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহায়তা ; (৩) ফলাফল : (ক) কৃষ্ণসাগর ও দার্দানেলিজ যুদ্ধকালে সকলের নিকট সমভাবে রুদ্ধ, (খ) দানিউব নদীতে নৌচালনার সকলকে সমভাবে অবাধ অধিকার দান, (গ) কৃষ্ণসাগর বা দার্দানেলিজ উপকূলে রুশ বা তুর্কী ঘাঁটি স্থাপন নিষিদ্ধ, (ঘ) রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে বেসারাবিয়া

প্রত্যর্পণ, (ঙ) তুরস্ককে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ে যোগদানের অধিকার দান, তুরস্কের নিরাপত্তা ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক প্রতিশ্রুত, (চ) তুরস্ক কর্তৃক প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি, (ছ) আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন স্বীকৃতি, জলযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত, (জ) রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস, অগ্রগতি প্রতিহত, (ঝ) নেপোলিয়নের গৌরব বৃদ্ধি, ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি, অস্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার শত্রুতা, ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ—ইতালির দৃষ্টান্ত অনুসরণে জার্মানির ঐক্য, বলকান স্বাধীনতা, রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন—এশিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি ; সমালোচনা (সংক্ষেপে)।

৮০-৮৫, ৮৬-৯১ পৃষ্ঠা]

2. (a) What was the nature of the Eastern Question at the time of the outbreak of the Crimean war ? (b) What were the direct and indirect results of the war ? (C.U. 1950)

উত্তর-সংকেত : (a) (১) সূচনা : উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে লর্ড মোর্‌লে 'পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে ক্রমপরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধের জন্য রাশিয়া তুরস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারে নাই ; (৩) টিলজিট্-এর সন্ধির পর হইতে রাশিয়ার তুরস্ক-গ্রাসনীতি পুনরায় গ্রহণ—বুকারেস্ট্-এর সন্ধি (১৮১২) ; (৪) ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ইওরোপীয় দেশগুলির তুরস্ক-নীতির পরিবর্তন ;—রাশিয়ার বিস্তার নীতির ফলে ইওরোপে ভীতির সঞ্চার ; রাশিয়ার আক্রমণ হইতে তুরস্ককে রক্ষা করা ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাহায্যে সম্ভব হইলেও আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাজনিত পতন হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইল না ; (৬) গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ—রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে সাহায্য দান—ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ—মেহেমেৎ আলির সীরিয়া লাভ ; রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে উন্‌কিয়ার স্কেলেসির সন্ধি ; (৭) তুরস্ক কর্তৃক মিশরের পাশা মেহেমেৎ আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ; লণ্ডন কন্‌ভেন্‌শন (১৮৪০), (৮) ১৮৪১—৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কোন নূতন জটিলতা দেখা দেয় নাই, কিন্তু তুরস্কের দুর্বলতা দিন দিনই পরিস্ফুট হইতে থাকে ; (৯) জার প্রথম

নিকোলাস কর্তৃক তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব—তুরস্ক ইওরোপের "রোগগ্রস্ত ব্যক্তি"। ৭৫-৮০, ৮৬-৮৯ পৃষ্ঠা]

(b) [১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের—'ফলাফল' অংশটি দ্রষ্টব্য]

3. Comment on the importance of the Crimean War.
(C. U. 1937)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৩) 'ফলাফল' ও (৪) সমালোচনার অনুরূপ। ৮৬-৯১ পৃষ্ঠা]

4. What is the Eastern Question ? How did it affect Anglo-Russian relations upto 1856 ? (C. U. 1958)

[উত্তর-সংকেত : প্রথম অংশের উত্তর-সংকেত ২নং প্রশ্নোত্তরের (a)-এর অনুরূপ। দ্বিতীয় অংশের উত্তর-সংকেত : রাশিয়ার তুর্কী সাম্রাজ্য গ্রাস-নীতি ; ইংলণ্ডের তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতি ;—গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের অংশ গ্রহণের মূল কারণ—গ্রীসের উপর রুশ প্রাধান্য বিস্তারে বাধা দেওয়া ; জার নিকোলাসের তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব—মিশর ও ক্রীট ইংলণ্ডকে অধিকার করিতে দিবার প্রস্তাব—ইংলণ্ড কর্তৃক অগ্রাহ্য ; ইংলণ্ডের ভারত তথা পূর্বাঞ্চলের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন ; ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের অংশ গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধা দান করা। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাফল্য—পূর্বাঞ্চলে রুশ অগ্রগতি প্রতিহত। এই প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দুইটি পড়িতে হইবে।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য

(Napoleon III & the Second French Empire)

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮) ফলে ফ্রান্স এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব: লুই নেপোলিয়ন-এর উত্থান

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবও তেমনি তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর উত্থানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রথম জীবন (Early life of Napoleon III):

লুই নেপোলিয়ন (৩য় নেপোলিয়ন) ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হল্যাণ্ডরাজ লুই বোনাপার্টির পুত্র। তিনি

লুই নেপোলিয়ন-এর জন্ম (১৮০৮)

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াটারলু'র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে নেপোলিয়ন সাত বৎসরের বালক লুই বোনাপার্টিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া নাকি বলিয়াছিলেন "কে বলিতে পারে—এই শিশুর মধ্যেই হয়ত আমার পরিবারের ভবিষ্য নিহিত রহিয়াছে।"* নেপোলিয়ন-এর পতনের পর

সাত বৎসর বয়সে নির্বাসিত (১৮১৫)

বোনাপার্টি পরিবার নির্বাসিত হইলে লুই নেপোলিয়ন তাঁহার মাতার সঙ্গে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। মাতার নিকট হইতে নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা

বোনাপার্টির অনন্যসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে নেপোলিয়ন সম্পর্কে এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। নির্বাসিত অবস্থায়ও লুই নেপোলিয়ন মনে-প্রাণে এই কথা বিশ্বাস করিতেন

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা

যে, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পদাঙ্ক

সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইতালি ও ইংলণ্ড ভ্রমণ

অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইবেন। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইতালি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজসদৃশ আত্মসম্মান লইয়া সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন।

* "Who knows but that the future of my race may not lie with this boy"--*Napoleon.* vide Ketelbey. p. 162.

ইতালিতে অবস্থানকালে তিনি নেপোলিয়ন-এর বৃদ্ধা মাতা লেটিজিয়া বোনাপার্টির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তিনি ইতালির 'কার্বোনারি' (Carbonari) নামক সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য হন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি চার্টিস্ট্ আন্দোলনের (Chartist Movement) বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে স্পেশ্যাল কন্‌ষ্টেবল (Special Constable) হিসাবে সাহায্য করেন। কিন্তু এই সকল ভাগ্য-বিবর্তনের মধ্যেও তিনি ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করেন নাই। এমন কি, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্ট্রাস্‌বার্গ নামক স্থানে অল্প সংখ্যক সৈন্যসামন্ত যোগাড় করিয়া ক্ষমতা-লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি অকৃতকার্য হন এবং ফরাসী সৈন্য কর্তৃক ধৃত হন। তাঁহাকে আমেরিকায় নির্বাসিত করা হয়। অল্পকালের মধ্যেই লুই নেপোলিয়ন আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিতে সমর্থ হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ্পি (১৮৩০-৪৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টির দেহাবশেষ সেণ্ট্ হেলেনা হইতে প্যারিসে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলে ফরাসী জাতির মধ্যে নেপোলিয়ন-এর প্রতি এক অতি গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। সেই সুযোগে লুই নেপোলিয়ন বোলোন্ (Boulogne) নামক স্থানে সামরিক শক্তির সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। এবারও তিনি অকৃতকার্য হন এবং হ্যাম (Ham) নামক দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এখান হইতেও তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

ইতালিতে কার্বোনারি-এর সদস্য

ইংলণ্ডে স্পেশ্যাল কন্‌ষ্টেবল

স্ট্রাস্‌বার্গে ক্ষমতালাভের চেষ্টা (১৮৩৬)

আমেরিকায় নির্বাসিত

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বোলোন্ নামক স্থানে ক্ষমতালাভের বৃথা চেষ্টা : হ্যাম দুর্গে বন্দী

হ্যাম দুর্গ হইতে ছদ্মবেশে পলায়ন

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের উত্থান (Rise of the Second French Empire) :

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে লুই নেপোলিয়ন-এর ভাগ্যরবি উদিত হয়। লুই ফিলিপ্পির পতনের ফলে তাঁহার ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিবার কোন বাধা রহিল না। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অধীনে কার্যগ্রহণে

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন

আগ্রহ জানাইলে তাঁহাকে প্রথমে আইনসভা বা গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়। এই সভার সদস্য হিসাবে লুই নেপোলিয়ন নিজ ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিচয় দিতে সক্ষম হইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সুমধুর ব্যবহার, বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি তাঁহার গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিল। ঐ সময় 'নেপোলিয়ন' নামের মোহ লোককে পাইয়া বসিয়াছিল। লুই নেপোলিয়ন-এর নামের মধ্যে 'নেপোলিযন' শব্দটি ছিল বলিয়াই তিনি ফরাসী জাতির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। 'নেপোলিয়ন' নামধারী যে-কোন ব্যক্তিই তখন ফরাসী জাতির সমর্থন লাভের যোগ্য ছিল। জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর ফরাসী জাতি দৃঢ় শাসনব্যবস্থার অধীনে শান্তিতে বাস করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। লুই নেপোলিয়ন-এর পক্ষে দৃঢ় এবং স্থায়ী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইবে এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইল। স্বভাবতঃই লুই নেপোলিয়ন যখন নূতন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইলেন তখন পঞ্চান্ন লক্ষেরও অধিক ভোটে তিনি নির্বাচিত হইলেন।* ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লুই নেপোলিযন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত

'নেপোলিয়ন' নামের মোহ

ফরাসী জাতির শান্তিপূর্ণ জীবনের স্পৃহা

লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে লুই নেপোলিযনকে আইন-সভার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। পররাষ্ট্র-নীতি লইয়া আইনসভার সহিত তাঁহার মতানৈক্য দেখা দিল। আইনসভার অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ও রাজতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু তাঁহারা চাহিয়াছিলেন বুর্‌বোঁ, অন্ততঃ অর্লিযেন্স পরিবারের কোন বংশধরকে সিংহাসনে বসাইতে। ইহা ভিন্ন তাঁহারা বিপ্লবের ভয়েও অত্যন্ত ভীত ছিলেন। লেদ্রু-রোলিন নামক উগ্র-বামপন্থী নেতার নেতৃত্বে এক বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহা সহজেই দমন করা

রাষ্ট্রপতি ও আইন-সভার মধ্যে মতানৈক্য

* **Louis Napoleon five and half million Votes (55,00000) ; Cavaignac a million and a half (15,00000) ; Ledru-Rollin three hundred and seventy thousand (370,000) ; Lamartine seventeen thousand (17,000) only.**

হইল বটে, কিন্তু এই ভীতির ফলে আইনসভার বামপন্থী অনেক সদস্যকে সভার সদস্যপদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। ইহা ভিন্ন বামপন্থীদের প্রভাব কমাইবার উদ্দেশ্যে ভোটাধিকার হ্রাস করা হইল। ভোটদাতাকে ভোট দিবার পূর্ববর্তী তিন বৎসর একই স্থানে বাস করিতে হইবে—এই নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে এক বিশাল সংখ্যক ভোটদাতার ভোটাধিকার নাকচ হইল। যে-সকল শ্রমজীবী একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইত তাহাদের অনেকেই ভোটাধিকার হারাইল। এইভাবে আইনসভা পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজতান্ত্রিক হইয়া উঠিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার মতানৈক্য দিন দিন বাড়িয়া চলিল। আইন-সভার সদস্যদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হইলেও জনসাধারণের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। লুই নেপোলিয়ন দেখিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁহার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার চারিবৎসর কাল প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি পুনরায় যাহাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন সেই জন্য প্রজাতান্ত্রিক শাসনবিধির পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেন। আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এই শাসনবিধির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব ছিল, কিন্তু লুই-এর দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়া গেল না। তখন লুই জনসাধারণের সহায়তা লাভের আশায় এক কূটনৈতিক চাল চালিলেন। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। একই স্থানে তিন বৎসর বাস করিবার ভোটাধিকার লাভের যে নীতি কিছু দিন পূর্বে আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি নাকচ করিবার চেষ্টা করিলেন। আইনসভা ইহার বিরোধিতা করিলে লুই নেপোলিয়ন আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। থিয়ার্স, ক্যাভাইগ্‌নাক্‌ প্রমুখ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইল। লুই-এর বিরোধী পক্ষ প্যারিস নগরীতে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা করিলে অতি সহজেই তাহা দমন করা হইল।

আইনসভায় বামপন্থী প্রভাব দমনে চেষ্টা

শ্রমজীবীদের ভোটাধিকার হ্রাস : তিন বৎসর একই স্থানে বসবাসের নীতি

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের চেষ্টা

লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক জনসাধারণের সহায়তা লাভের চেষ্টা

আইনসভা ভঙ্গ

লুই নেপোলিয়ন এক নূতন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব জনসাধারণের নিকট

উপস্থিত করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দশ বৎসর পর্যন্ত নিজপদে বহাল থাকিবেন। আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইবে। ঊর্ধ্ব কক্ষের নাম হইবে কাউন্সিল-অব-ষ্টেট্। এই কাউন্সিলের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই সভার দায়িত্ব ছিল প্রয়োজনীয় আইনের প্রস্তাব বা খসড়া প্রস্তুত করা। নিম্নকক্ষ বা লেজিস্‌লেটিভ্ এ্যাসেম্ব্‌লী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটে নির্বাচিত হইবে। আইন পাস করা, বাজেট পাস করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজের দায়িত্ব থাকিবে এই সভার উপর। জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হইল সিনেট নামে প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একটি ক্ষুদ্র সমিতির উপর। বিপুল ভোটাধিক্যে এই নূতন শাসনতন্ত্র ফরাসী জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইল।* ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে লুই নেপোলিয়ন এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলেন। এই ঘটনার এক বৎসরের মধ্যে লুই নেপোলিয়ন 'তৃতীয় নেপোলিয়ন' উপাধি ধারণ করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাটপদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের মত গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। সিনেটের প্রস্তাবক্রমে তিনি সম্রাটপদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া জনসাধারণের মতের জন্য ভোট গ্রহণ করিলেন। 'নেপোলিয়ন' নামের মোহ এবারও তাঁহাকে জয়যুক্ত করিল।† বিপুল ভোটাধিক্যে ফরাসী জাতি লুই নেপোলিয়নকে তাহাদের সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিল। ফ্রান্সে দ্বিতীয়বার সম্রাট ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

নূতন শাসনতন্ত্র

দুই কক্ষযুক্ত আইন-সভা : কাউন্সিল-অব-ষ্টেট্ ও এ্যাসেম্ব্‌লী

সিনেট

জনসাধারণের মতানু-ক্রমে সম্রাটপদ গ্রহণ

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রকৃতি (Character of the Second French Empire) :

সম্রাট পদ গ্রহণের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। সিনেট, কাউন্সিল-অব-ষ্টেট্, এ্যাসেম্ব্‌লী প্রভৃতি সভা-সমিতিগুলি তখনও রহিল। সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যমাত্রেই সম্রাটের মনোনীত

সম্রাট শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী

* "There were 7,439,000 who voted *yes* and only 640,000 *noes*" Grant & Temperley, p. 269.

† 'It was submitted to a plebiscite, and 7.824,000 were returned as saying *yes* while only 253,000 said *no*." *Ibid*, p. 219.

ব্যক্তি হইবেন। বিচারপতি, বড় বড় শহর ও নগরের মেয়র প্রভৃতি সকলেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এ্যাসেম্বলীর কোন প্রকার আইনের প্রস্তাব আনয়নের ক্ষমতা রহিল না, এ্যাসেম্বলীর সদস্য নির্বাচনে সম্রাটের স্বপক্ষে সরকারী কর্মচারিগণ জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করিতে সর্বদা প্রস্তুত রহিলেন।

সিনেট, কাউন্সিল ও এ্যাসেম্বলী

এইভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে সম্রাটের স্বৈরাচারী শাসন স্থাপিত হইল। দৃশ্যতঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর শাসনব্যবস্থা প্রজাহিতৈষী বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের ধারণাই এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল। নেপোলিয়ন জনগণের মতানুক্রমে যেমন সম্রাটপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি শাসনব্যাপারেও জনসাধারণের মতামতের মূল্য দেওয়ার বাহ্যিক ইচ্ছার তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু এই বাহ্যিক গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার অন্তরালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচন প্রভাবিত করা, বিদ্যালয়গুলিতে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেওয়া, এ্যাসেম্বলী বা গণপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি একক প্রাধান্য স্থাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অধীনে কন্‌সালেট (Consulate) শাসনব্যবস্থায় যেরূপ একক প্রাধান্যের ব্যবস্থা ছিল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর অধীনেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

দৃশ্যতঃ প্রজাহিতৈষী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বস্তুতঃ স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কন্‌সালেট-এর অনুকরণ

একক প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্স ও ফরাসী জাতির উন্নতির কথা সর্বাগ্রে ভাবিতেন। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা যে গভীর ছিল তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিসাধনে সর্বপ্রথমই প্রয়োজন ছিল অপ্রতিহত একক প্রাধান্যের এবং এই একক প্রাধান্যের ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। সুতরাং তাঁহার শাসন নীতি-ই ছিল স্বৈরাচারী ক্ষমতার সহিত দেশ ও দেশবাসীর উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান করা; জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া একক প্রাধান্য স্থাপন করা।*

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর দেশ ও দেশবাসী প্রীতি

স্বৈরাচারের দেশ ও দেশবাসীর উন্নতির সামঞ্জস্য বিধান করা

* "Technically his power was based upon the will of the people as expressed in the plebiscite; actually it rested upon the army. In short the fundamental idea underlying the Napoleonic regime was that of inverted democarcy—Caesarism founded upon popular basis." Lipson, p.32.

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy of Napoleon III) ঃ

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর নীতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনী হইতে গৃহীত

তৃতীয় নেয়োলিয়ন তাঁহার জীবনের আদর্শ ও কার্য-নীতি নেপোলিযন বোনাপার্টির জীবনী হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার বহু পুর্বেই তিনি "নেপোলিয়ন-এর কল্পনা" (Napoleonic Ideas) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির শাসননীতির মূল কথার উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী-বিপ্লবের মুল্যবান দানগুলিকে স্থায়ী করা, এবং এই উদ্দেশ্যে অপ্রতিহত একক ক্ষমতা গ্রহণ করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা স্থাপন করা। তৃতীয় নেপোলিয়নও এই দুইটি নীতি অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার সহিত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেইজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন।

দুইটি মূল নীতি : (১) স্বৈরাচারী শাসনাধীনে ফরাসী বিপ্লবের সুফলগুলি রক্ষা করা, (২) স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করা

গণতান্ত্রিক কাঠামোর পশ্চাতে একক প্রাধান্যের স্থাপন

(১) তিনি গণতান্ত্রিক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখিয়া শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যগণ, বিচারপতিগণ, শহর ও নগরের মেয়রগণ সকলেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইলেন। এ্যাসেম্ব্লী বা গণপরিষদের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটেই হইবে স্বীকৃত হইল, কিন্তু নির্বাচন প্রভাবিত করা এবং এ্যাসেম্ব্লীর আইনের প্রস্তাব আনয়নের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া এ্যাসেম্ব্লীকে সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য করা হইল।

শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

(২) স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফরাসী জাতি শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা করিতে পারে সেই জন্য শিক্ষা বিভাগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিলেন।

(৩) সংবাদপত্রগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইল। সরকারী অনুমতি ভিন্ন কোন নূতন সংবাদপত্র প্রকাশ করা বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার মন্তব্য করা নিষিদ্ধ হইল। সামান্য ত্রুটির জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইত। সাধারণ পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু ছিল।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ

(৪) সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার আইনতঃ অব্যাহত রহিল বটে, কিন্তু সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার নিয়ন্ত্রণ

(৫) তৃতীয় নেপোলিয়ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক উন্নতিসাধন করিয়া ফরাসী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে চাহিলেন। তাঁহার স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের ফলে ফরাসী জাতি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার ক্ষতি তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যের দ্বারা পূরণ করিতে চাহিলেন। জনকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন কার্যাদি সরকারী পরিকল্পনার সর্বাগ্রে রহিল। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তিনি যে আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহা তাঁহার রচিত "দারিদ্র্যের অবসান" (*Extinction of Pauperism*) পুস্তকে প্রকাশ পাইয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্য তাঁহার উৎসাহে দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ধাবিত হইল। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া শিল্পপতিগণ যাহাতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিতে পারে সেই জন্য 'ক্রেডিট্ ফঁসিয়ার' (*Credit foncier*) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইল। বৃহৎ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ মেয়াদী প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইল। 'ক্রেডিট্ মোবিলিয়ার' (*Credit mobilier*) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্সের শাখা দেশের সর্বত্র স্থাপন করা হইল। দেশের সর্বত্র এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন শুরু হইল। রেলপথের প্রসার ও উন্নতি বিধান করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা বৃদ্ধি করা হইল। ডাকবিভাগও পূর্বাপেক্ষা বহু গুণে উন্নত হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য আশাতীতভাবে

কল্যাণকর কার্যের দ্বারা জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা

দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি

শিল্প ও বাণিজ্যের উৎসাহ : শিল্প-ঋণের ব্যবস্থা—ক্রেডিট্ ফঁসিয়ার, ক্রেডিট্ মোবিলিয়ার

ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স-এর শাখা স্থাপন

রেলপথ ও ডাকবিভাগের উন্নতি

শিল্প ও বাণিজ্যের আশাতীত উন্নতি নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, দ্বিগুণ শিল্পোৎপাদন

উন্নতি লাভ করিল। নূতন নূতন প্রয়োজনের তাগিদে নূতন নূতন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। কুড়ি বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের মোট শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণে পরিণত হইল।

শ্রমজীবীদের উন্নতি, দরিদ্রদের জন্য সস্তায় রুটির ব্যবস্থা

(৬) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে শ্রমজীবীদের মজুরীও শতকরা প্রায় চল্লিশভাগ বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু মোট আয়ের অধিকাংশই মুষ্টিমেয় শিল্প-পতিদের হস্তে সঞ্চিত হওয়ায় এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমজীবিগণের দুর্দশার তেমন লাঘব হইল না। কসাইদের একচেটিয়া কারবারের অধিকার নাকচ করিয়া প্রতিযোগিতার দ্বারা মাংসের দাম কমাইবার ব্যবস্থা করা হইল। দরিদ্রের নিকট বাজার দর অপেক্ষা সস্তায় রুটি বিক্রি করিবার ব্যবস্থা করা হইল। কোন প্রকার অজন্মা বা অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত লোকদের জন্য সাহায্যভাণ্ডার, সরকারী সাহায্যদান, বেকার সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী কারখানা স্থাপন ইত্যাদি নানাপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থা তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আমলে অবলম্বিত হইল।

দৈব দুর্ঘটনার সময় সরকারী সাহায্যদান, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, সরকারী কারখানা স্থাপন

(৭) প্যারিস ও অন্যান্য শহরগুলিতে নূতন নূতন প্রাসাদ ও অন্যান্য আধুনিক রুচি-সম্মত হর্ম্যাদি নির্মাণ করা হইল। প্যারিস তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলেই উহার আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে।

প্যারিস ও অন্যান্য শহরে প্রাসাদ ও হর্ম্যাদি নির্মাণ

(৮) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস করিয়া উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। ১৮৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর 'উদারনৈতিক সাম্রাজ্য' (Liberal Empire) নামে পরিচিত। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি উদারনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইতালির যুদ্ধে যোগদান করিয়া (১৮৫৯) তিনি ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। ইহা ভিন্ন, তিনি ছিলেন অবাধ বাণিজ্যনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি ইংলণ্ডের সহিত এক

উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন

ইতালির যুদ্ধ: যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি

বাণিজ্যিক চুক্তি (Cobden treaty) স্বাক্ষর করিয়া ইংলণ্ড হইতে আমদানির উপর শুল্ক কমাইয়া দিলেন। ইহাতে শিল্পপতিগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, অবাধ-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি আপনা হইতেই স্থাপিত হইবে। শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতিসাধনের ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। এই সকল কারণে ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইল। সুতরাং যাজক সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে তিনি জনসাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে জাতির সমর্থনলাভ করিতে চাহিলেন। এইজন্য তিনি সিনেট ও এ্যাসেম্ব্লীকে সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সমালোচনা করিবার অধিকার দিলেন। বাজেট পাস করিবার ক্ষমতাও এ্যাসেম্ব্লীকে দেওয়া হইল। ক্রমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে সমবেত হইবার অবাধ অধিকার, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইল। কিন্তু সম্রাট-বিরোধী জনমত দিন দিনই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর বিরোধী দলগুলি এই সুযোগ হারাইল না। প্রজাতান্ত্রিক দল, ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়, বুর্‌বোঁ রাজবংশের সমর্থকগণ, লুই ফিলিপ্পির পরিবারের (অর্লিয়েন্স পরিবার) সমর্থকগণ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমবেতভাবে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হইল।

অবাধ-বাণিজ্য নীতি : ব্যবসায়ী ও শিল্প-পতিদের অসন্তুষ্টি

সিনেট ও এ্যাসেম্ব্লীকে সরকারী নীতি ও কার্য-কলাপ সমালোচনার অধিকার দান

বাজেট পাসের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা স্থাপন

বিরোধী দলের সমবেত আক্রমণ

লুই নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতি (Louis Napoleon's Foreign policy) :

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর পররাষ্ট্র-নীতির একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের উপর তাঁহার আন্তর্জাতিক মর্যাদাই কেবল নির্ভর করিত না, তাঁহার আভ্যন্তরীণ নীতির সাফল্যও সম্পূর্ণভাবে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল।

পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের উপর আভ্যন্তরীণ নীতির সাফল্য নির্ভরশীল

ব্যক্তিগত ইচ্ছার দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৃতীয় নেপোলিয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন।* কিন্তু গৌরব-লিপ্সু ফরাসী জাতির সম্রাট হিসাবে আন্তর্জাতিক গৌরব অর্জন করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন ছিল; আর যুদ্ধ জয় করাই ছিল সেই গৌরব অর্জনের একমাত্র পন্থা। ইহা ভিন্ন, তৃতীয় নেপোলিয়ন একথাও জানিতেন যে, লুই ফিলিপ্পির পতনের একমাত্র কারণই ছিল তাঁহার শান্তিবাদী পররাষ্ট্র-নীতি। এই কারণে নিজের সম্রাট পদ রক্ষার জন্যই তৃতীয় নেপোলিয়নকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ব্যক্তিগতভাবে শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী

ভাবপ্রবণ, গৌরব-লিপ্সু ফরাসী জাতির জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতালাভের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই জনগণকে তাহাদের বিপ্লব-প্রসূত গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া একক প্রাধান্য রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণের দৃষ্টি ও চিন্তাধারা দেশের অভ্যন্তর হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়ার প্রযোজন ছিল। তাহাদিগকে তাহাদের দীর্ঘকালের কষ্ট-লব্ধ সুযোগ-সুবিধা যে নাশ হইয়াছে সে-বিষযে চিন্তা করিবার সুযোগ না দেওযাই ছিল তৃতীয় নেপোলিযনের উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রয়োজন ছিল খুব চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার পক্ষে তখনকার ফরাসী গৌরবের পুনরুদ্ধার করা সমীচীন ছিল। স্বভাবতই তৃতীয় নেপোলিয়ন ভাবপ্রবণ ফরাসী জাতিকে এক গৌরবোজ্জ্বল পররাষ্ট্র-নীতির দ্বারা চমৎকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম দিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন সাফল্য অর্জন করিলেন বটে, কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি তথা তাঁহার রাজত্বের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল।

জনগণকে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি দ্বারা ভুলাইয়া রাখিবার প্রয়োজন

নেপোলিয়ন বোনা-পার্টির উত্তরাধিকারী হিসাবে নেপোলিয়ন-এর যুগের গৌরব ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্য

প্রথম দিকে সাফল্য: ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট পরিবর্তন

*"He declared when he became Emperor that the Empire did not mean war—"*The Empire is Peace*"—'L' Empire, C'est La Paix' Louis Napoleon III's Bordeaux speech; Vide Lipson, p. 208, Riker; p. 256.

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের গ্রীক-খ্রীষ্টান ও ল্যাটিন-খ্রীষ্টান যাজকদের মধ্যে জেরুজালেম-এর পবিত্র স্থানগুলির আধিপত্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তৃতীয় নেপোলিয়ন ল্যাটিন-খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই প্রধানতঃ তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। অপরদিকে রাশিয়া গ্রীক খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সূত্রে ক্রমে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-৫৬) সৃষ্টি হইল। ব্যক্তিগত-ভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের ধর্ম-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ফরাসী ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইহা ভিন্ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জনের সম্ভাবনা ছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মস্কো অভিযানে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগও ছিল। প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিতে এবং ফরাসী জাতির সম্মুখে এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্রীয় সাফল্য অর্জনে সমর্থ হন।

গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের দ্বন্দ্ব : ল্যাটিন খ্রীষ্টানদের পক্ষে ফ্রান্স, গ্রীক খ্রীষ্টানদের পক্ষে রাশিয়া

ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের ইচ্ছাপূরণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন ও মস্কো অভিযানের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ

(২) তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যক্তিগতভাবে উদারপন্থী ছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদের দাবি স্বীকার করিতেন। একই জাতীয় এবং একই ভাষাভাষী জনসমাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের দাবি তিনি স্বীকার করিতেন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি যখন ইতালিতে গিয়াছিলেন তখন হইতেই তিনি ইতালিবাসীদের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। তিনি ইতালীয়দের কার্বোনারি নামক গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য হইয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়া ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তাদানে প্রতিশ্রুত হন। প্যারিসের সন্ধির

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর উদারনীতি

ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতি

অল্পকাল পরেই প্লোম্‌বিয়ারিস্‌-এর চুক্তি (Pact of Plombieres) স্বাক্ষর করিয়া তিনি পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে সমগ্র ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সাধনের যুদ্ধে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অবসানে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নেপোলিয়ন নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার পক্ষে যোগদান করিলেন। ফরাসী সাহায্যে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য আশাতীতভাবে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ম্যাজেণ্টা (Magenta) ও সোল্‌ফেরিনো (Solferino)'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইল। এই অপ্রতিহত বিজয় অভিযানের মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন এবং পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত কোন প্রকার পরামর্শ না করিয়াই অস্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাঙ্কা (Villafranca)'র সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর এইরূপ আচরণের পশ্চাতে যে কোন যুক্তি ছিল না এমন নহে। প্রথমতঃ, ভেনিশিয়া নামক স্থানে অস্ট্রিয়ার দেড়লক্ষ সৈন্য ছিল, ইহাদের সাহায্যে আরও এক লক্ষ সৈন্য অস্ট্রিয়া হইতে অগ্রসর হইতেছিল। নেপোলিয়ন-এর মোট সৈন্য অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়া গেলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না এই আশঙ্কাও ছিল; তদুপরি প্রাশিয়াও অস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার অগ্রগতি ও প্রচারকার্যে উৎসাহিত হইয়া রোমাগ্না বা রোমানা (Romagna) নামক স্থানটি পোপের অধীনতা অস্বীকার করিল। রোমানা, পার্মা ও মোডেনা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইতে চাহিল। পোপের আধিপত্য বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া ফরাসী যাজক সম্প্রদায় তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। তৃতীয়তঃ, ফরাসী জাতির দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই, এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেও ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ইতালি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা ফরাসী নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিলেন। এই সকল কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই যুদ্ধ ত্যাগ

প্লোম্‌বিয়ারিস্‌-এর চুক্তি

ম্যাজেণ্টা ও সোল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে জয়লাভ

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

কারণ: (১) অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি

(২) রোমানা নামক স্থানের বিদ্রোহ: ফরাসী ক্যাথলিকদের অসন্তুষ্টি

(৩) ফ্রান্সের নিকটে ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফরাসী প্রাধান্য ও নিরাপত্তার পরিপন্থী

করেন। প্লোম্‌বিয়ারিস্‌-এর চুক্তি অনুসারে ইতালীয় ঐক্যে সাহায্যদানের বিনিময়ে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর স্যাভয় ও নিস্‌ নামক স্থান দুইটি পাওয়ার কথা ছিল। নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করিতে এখন আর রাজী ছিলেন না বলিয়াই ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধিতে ঐ স্থান দুইটি দাবি করিলেন না। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, তিনি ইতালীয় ঐক্যের প্রথম এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সাহায্য করিয়াছিলেন। পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ও লোম্বার্ডি তাঁহার সাহায্যেই একত্রিত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ন-এর সহায়-তায় ইতালির ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ

তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ ইতালীয়দের, বিশেষত পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্যাভুরের মনে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করিল। সুতরাং তাঁহার ইতালীয় নীতি ফরাসী ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি, ফরাসী জাতির মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভীতি ও বিদ্বেষ এবং সর্বোপরি ইতালীয়দের ঘৃণার সৃষ্টি করিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তৃতীয় নেপোলিয়ন স্যাভয় ও নিস্‌ নামক স্থান দুইটির বিনিময়ে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত মধ্য-ইতালীয় রাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সমর্থন করিলেন। ইহার ফলে তিনি ইংলণ্ডেরও বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার ইতালীয় নীতির বিফলতা যতই প্রকট হইতে লাগিল তিনি ফরাসী জাতিকে ততই শাসনতান্ত্রিক উদারতা দেখাইতে লাগিলেন। এইভাবে পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতাজনিত বিদ্বেষ তিনি হ্রাস করিতে চাহিলেন।

ইতালীয় নীতির ফল: ফরাসী যাজক সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি, জাতির ভীতি ও বিদ্বেষ, ইতালীয়দের ঘৃণা

স্যাভয় ও নিস্‌ দখল: মধ্য-ইতালি পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত, পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা: শাসনতান্ত্রিক উদারতা

(৩) তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীয় ঐক্যের সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার অধীন পোলগণ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করিলে তিনি তাহাদিগকে সাহায্যদান করেন। ইহার ফলে রাশিয়ার সহিত তাঁহার বিরোধের সৃষ্টি হইল। ক্রমেই তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মমর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

পোল বিদ্রোহীদিগকে সাহায্যদান

(৪) পররাষ্ট্র-নীতির এইরূপ ক্রম-বিফলতার পরও তৃতীয় নেপোলিয়ন সাবধানতা অবলম্বন করিলেন না। ইওরোপ মহাদেশে তাঁহার বিফলতা

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। মেক্সিকো নামক স্থানে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিলে সেখানকার প্রজাতান্ত্রিক সরকার দুই বৎসরের জন্য বিদেশী বণিকদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের বণিকদের বহু অর্থ মেক্সিকো সরকারের নিকট প্রাপ্য ছিল। এই তিন দেশ মেক্সিকো সরকারকে প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে বাধ্য করিবার জন্য সেখানে সৈন্য প্রেরণ করিল। মেক্সিকো সরকার বিদেশী বণিকদের প্রাপ্য মিটাইতে রাজী হইলেন। কিন্তু এই সুযোগে নেপোলিয়ন মেক্সিকোর প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থলে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতাকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিলেন। তাঁহার সৈন্য প্রথম দিকে জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার চাপে নেপোলিয়ন মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলেন (১৮৬৭)। এই অভিযানে বিফলতার ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর প্রতি ফরাসী জাতীর বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। সীরিয়ার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা, কোচিন চীনে (Cochin China) ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন কোন কিছুই এই বিদ্বেষ হ্রাস করিতে সমর্থ হইল না।

মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা

সীরিয়ায় ক্যাথলিক স্বার্থরক্ষা ; কোচিন চীনে ফরাসী উপনিবেশ বিস্তার

(৫) তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় ঐক্যের সাহায্য করিতে গিয়া নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত শত্রু-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে তাঁহার অযথা ভয় ছিল। এই কারণে তিনি কেবলমাত্র প্রাশিয়ার মিত্রতা-ই কামনা করিতেন না, প্রাশিয়া উত্তর-জার্মানির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধ-শক্তি হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করুক ইহাই ছিল তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর ইচ্ছা। কিন্তু প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিসমার্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে তিনি নিরপেক্ষ রহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তিনি মধ্যস্থতা করিবেন। কিন্তু স্যাডোয়ার (Sadowa) যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয় তাঁহার

নেপোলিয়ন-এর জার্মান নীতি

স্যাডোয়ার যুদ্ধ (১৮৬৬) : নেপোলিয়ন-এর ভ্রম দূরীভূত

ভ্রম দূর করিল। প্রাশিয়ার অধীনে উত্তর-জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এই কথা তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার পরও তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তৎপর হইলেন না। ফলে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া দক্ষিণ-জার্মানির দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং নির্বান্ধব ফরাসী শক্তিকে সহজেই সেডান (Sedan)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফরাসী জাতি তৃতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল। ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটিল।

সেডানের যুদ্ধ, (১৮৭০) নেপোলিয়ন-এর পতন

ফ্রান্সে তৃতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার (Character and Estimate of Napoleon III) ঃ

তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্রে নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী জাতি বা ইওরোপের কেহই তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্রের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া অনেকেই নানাপ্রকার মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাকে রাজনীতিক, নির্বোধ, দুরাত্মা, প্রভৃতি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে তিনি ম্যাকিয়াভেলি-সুলভ (Machiavellian) রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিছক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার চরিত্রে নানাপ্রকার সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। দয়া, উদারতা, অমায়িকতা তাঁহার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এবং নিজস্ব দুর্বলতা তাঁহার চরিত্রকে এক কৃত্রিম রূপ দান করিয়াছিল। তাঁহার পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ক্ষমতার অনুপাতে অত্যধিক

চরিত্র

দুর্জ্ঞেয় চরিত্র

তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য

তাঁহার সদ্‌গুণ

পরিস্থিতির ফলে চরিত্রের কৃত্রিম রূপ পরিগ্রহ

উচ্চ ছিল। তিনি ফরাসী জনগণের মধ্যে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যধিক ভাবপ্রবণ; বাস্তবতার সহিত তিনি অনেক ক্ষেত্রেই যোগাযোগ রাখেন নাই।

ভাবপ্রবণতা ও অবাস্তবতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালের প্রথম দিকে তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য নেহাৎ কম ছিল না। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির সহিত স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্বের এক অভিনব সংমিশ্রণ তিনি সাধন করিয়াছিলেন। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রত্যেক শিক্ষালয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচন প্রভাবিত করা প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি ফরাসী জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের বিনিময়ে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন করেন। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কব্যবস্থা, রেলপথ, শিল্পপতিগণকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের ও শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বিপদকালে জনসাধারণের সাহায্যার্থে সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন, দরিদ্রদের জন্য অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনে এক যুগান্তর আনয়ন করেন। প্যারিস নগরী ও অন্যান্য বহু শহর তাঁহার আমলেই আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ সাফল্য: স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য

রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিনিময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি-সাধন

দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে তিনি প্রথম দিকে নিজ এবং ফরাসী দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি ভাবপ্রবণ, গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেন বটে, কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তাঁহার জনপ্রিয়তা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গৌরব অর্জন

হ্রাস পাইতে থাকে। তাঁহার উদার মনোবৃত্তির ফলেই ইতালির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ফরাসী স্বার্থের এবং নিজ সম্রাটপদের অনিশ্চয়তার কথা না ভাবিয়াই তিনি ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে সাহায্যদানে অগ্রসর হন। ইহার ফলে ফরাসী যাজক সম্প্রদায়ের এবং ফরাসী জাতির মধ্যে যাহাদের ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফরাসী স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বুঝিবার মত দূরদৃষ্টি ছিল—তাহাদের সকলের বিরাগভাজন হইলেন। অপর দিকে আকস্মিকভাবে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি স্থাপন করিয়া তিনি ইতালিবাসীদেরও ঘৃণার পাত্র হইলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্যাভয় ও নিস্ দখল করিয়া তিনি ইংলণ্ডের বিরাগভাজন হইলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির প্রতি পদক্ষেপেই তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস হইতে লাগিল। পোলদের বিদ্রোহে সাহায্যদান করিয়া তিনি অযথা রাশিয়ার বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। প্রাশিয়ার প্রতি মিত্রতার নীতি তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সেরই যে সমূহ ক্ষতির কারণ ছিল তাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি মেক্সিকোর সিংহাসনে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ম্যাক্সিমিলিয়নকে স্থাপনের জন্য অভিযান প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত বিফল হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার প্রতি ফরাসী জাতির বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি যখন মেক্সিকো অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে প্রাশিয়া স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া উত্তর-জার্মানির রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিরপেক্ষ থাকিয়া তাঁহার জীবনের বৃহত্তম ভুল করিয়াছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পরও তিনি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য কোন দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তৎপর হন নাই। ফলে সেডানের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের ফলে তাঁহাকে সম্রাটপদ ত্যাগ করিতে হয়।

তাঁহার অদূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতি

পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা, জনপ্রিয়তা হ্রাস

ভ্রান্ত জার্মান-নীতি

মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা

স্যাডোয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষতা বৃহত্তম ভুল

সেডানের যুদ্ধে পরাজয় (১৮৭০)

তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতাই তাঁহার পতনের কারণ

ছিল। ভাবপ্রবণ, গৌরবলিপ্সু ফরাসী জাতির নিকট চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য-ই ছিল আনুগত্যের একমাত্র শর্ত। সুতরাং পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার পতন ঘটাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি ফরাসী জাতির আনুগত্যের শর্ত

তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা যুদ্ধ-প্রিয় (Fire brand) ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তিনি না ছিলেন বিপ্লববাদী, না ছিলেন যুদ্ধ-নীতির সমর্থক। "বিপ্লবের নীতিকে অস্বীকার করিয়া তিনি বিপ্লবকালীন পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, আর যুদ্ধ না করিয়াও ইওরোপের পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।"* কারণ ভিয়েনার সন্ধি বোনাপার্টি নামধারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁহার উপরোক্ত নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া তাঁহাকে বারবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহেই কাটিয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বৈদেশিক নীতির পুনঃ প্রবর্তন করিতে গিয়া এবং ফরাসী জাতিকে চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি . চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধনীতি গ্রহণ ক্র ছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ঐক ঐক্যের যুদ্ধ, মেক্সিকো অভিযান, পোল-বিদ্রোহে সামরিক সাহার্থে প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ প্রভৃতিতে তিনি লিপ্ত ছিলেন। নেপের বোনাপার্টির নীতির পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টায় তিনি বিফল হইয়াছিলেন্ত সেইজন্য "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" (Little Napoleon) নাম অর্জন করিয়াছিক

'Fire brand'

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধ, মেক্সিকো অভিযান, পোলদের সামরিক সাহায্যদান, প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ

পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি কোন দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই। তথাপি ফরাসী ও ইওরোপের ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়নের দান নেহাৎ কম নহে। ফরাসী জাতির আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধান, ইতালির ঐক্যসাধনে

ফরাসী ও ইওরোপের ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়নের দান

* "He wished to accomplish a revolutionary foregin policy without calling on the spirit of revolution, and to remodel Europe without a war", Taylor, p. 25.

সহায়তা ও পরাধীন পোলগণের জাতীয়তা আন্দোলনে সাহায্যদান ইত্যাদি তাঁহার কীর্তি হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া থাকিবে। সুয়েজ ও পানামা খাল খননের পরিকল্পনা তাঁহারই মনে সর্বপ্রথম স্থান পাইয়াছিল।* এই দুইটি খাল খননের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যাপারেও তাঁহার দান ,কম ছিল না। ফরাসী জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবার মত বহু কিছু তিনি করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উদার নীতির প্রসারে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার অপরাপর সাফল্যের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

সুয়েজ ও পানামা খালের পরিকল্পনা

পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা তাঁহার সাফল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই

তাঁহার কৃতিত্ব বিচারে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহাকে বিসমার্কের ন্যায় দূরদর্শী, কূটকৌশলী রাজনীতিকের সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। কূটচালে তাঁহার নিকট নেপোলিয়ন কেন সেই সময়কার অপর যে কোন রাজনীতিকের পরাজয় স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এদিক দিয়া বিচার করিলে ঐতিহাসিকগণ তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনায় তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন একথা স্বীকার করিতেই হইবে।†

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of the failure of Napoleon III) ঃ

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত অক্ষমতা এবং সমসাময়িক কালের ফরাসী ও ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার অবাস্তব আদর্শবাদিতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার ভাবপ্রবণতা তাঁহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল

ব্যক্তিগত অক্ষমতা ও সমসাময়িক পরিস্থিতি

* "The Suez and the Panama canals were foreseen by him, and he contributed to the ultimate completion of both", Grant and Temperley p. 215.

† "Louis Napoleon Bonaparte, otherwise known as Napoleon III, emperor of the French, is a man to whom both history and historians have done scant justice". Riker, pp. 454—456.

একথা বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের মর্যাদায় ফ্রান্সকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার যে আশার সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই আশা তিনি পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া তিনি নিজের চরিত্র ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক কৃত্রিম রূপ দান করিয়াছিলেন।

(১) অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া তিনি তাঁহার উদারনীতির পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রান্সের স্বার্থের দিক দিয়া বিচারে ঐক্যবদ্ধ এবং সেই হেতু শক্তিশালী ইতালি গঠনে সাহায্য দান করা যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সেকথা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তৃতীয়তঃ, মেক্সিকো অভিযানের অদূরদর্শিতা এবং প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে (স্যাডোয়ার যুদ্ধ) নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি সর্বনাশাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধে আস্ট্রিয়ার পরাজয়ের পরও তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় কোন মিত্র-শক্তির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার চেষ্টা করেন নাই। এই সব অদূরদর্শিতার ফলে তিনি যে সকল ভুল করিয়াছিলেন তাহা-ই তাঁহার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।* চতুর্থতঃ, তৃতীয় নেপোলিয়ন আন্তরিকভাবে যুদ্ধ-নীতির বিরোধী ছিলেন। নিজে সম্রাট পদ গ্রহণ করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে 'সাম্রাজ্য অর্থ হইল শান্তি'—অর্থাৎ তাঁহার সম্রাট পদ গ্রহণ যুদ্ধনীতি অনুসরণের ইঙ্গিত নহে। 'অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন' তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী প্রজাতন্ত্রের স্থলে সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন করিয়া তিনি ফরাসী জাতির স্বাধীনতা যেমন হরণ করিয়া-ছিলেন তেমনি উহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁহাকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলে ফ্রান্স যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল অনুরূপ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে

(২) রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

(৩) ইওরোপে কোন মিত্রশক্তির সাহায্য লাভে অক্ষমতা

(৪) পরস্পর বিরোধী শান্তি ও যুদ্ধ নীতি

* "He lacked the foresight that would have saved him from some of his blunders, and he lacked the insight that would have enabled him to discern the merits and failings of others." Riker, p. 455.

বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রথম সাম্রাজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে সে আশা স্বভাবতই ফরাসী জাতির মনে জাগিয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ফরাসী জাতিকে পররাষ্ট্রক্ষেত্রে গৌরবের আসনে স্থাপন করিতে পারিলেই গৌরবলোভী ফরাসী জাতির সম্রাট হওয়া সম্ভব ছিল। এজন্য অন্তরে শান্তিবাদী হইলেও তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্য যুদ্ধ-নীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। ইহা-ই ছিল নেপোলিয়নের পরিস্থিতির ট্র্যাজেডি (Tragedy)। পঞ্চমতঃ, প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সের সম্রাটপদ গ্রহণের ফলে ফরাসী জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে ঘৃণা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় নেপোলিনের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হওয়ার পরও এই চিন্তা-শীল ব্যক্তিবর্গ তাঁহার শাসন বরদাস্ত করিতে রাজী ছিলেন না। বৈদেশিক যুদ্ধনীতিও তাঁহাদিগকে ভুলাইতে পারে নাই বা পারিত না, বলা বাহুল্য। এই শ্রেণীর বিরোধিতা তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।* ষষ্ঠতঃ, পোল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার উদার নীতির বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্যারিসের সন্ধির পর (১৮৫৬) হইতে রাশিয়ার সহিত তিনি যে মিত্রতানীতির অনুসরণ করিতেছিলেন উহার মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। অপর দিকে বিস্‌মার্ক পোল্যাণ্ডবাসীর বিদ্রোহে রাশিযাকে সাহায্য করিয়া রাশিয়াকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এইভাবে প্রয়োজনবোধে রাশিয়াকে মিত্র হিসাবে পাইবার পথ তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্ধ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে, নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ সেই সময়ের ইওরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেখিতে হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও কূটকৌশলী ছিলেন বিস্‌মার্ক। তাঁহার কূটকৌশলের সহিত আঁটিয়া উঠিবার মত শক্তি তৃতীয় নেপোলিয়ন কেন, অপর কোন ব্যক্তিরই ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্‌মার্কের সর্বাত্মক প্রাধান্য ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে

(৫) চিন্তাশীল ব্যক্তি-বর্গের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিরোধিতা

(৬) রাশিয়ার সহানুভূতিনাশ

(৭) বিস্‌মার্কের তুলনায় তৃতীয় নেপোলিয়নের ক্ষুদ্রত্ব

* "The conflict between the intellectual and influential classes and the *coup d 'etat* government still continued, and doubtless contributed eventually to the fall of the Second Empire" Fueter, p. 207.

বিচার করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের জন্য তাঁহার নিজ দায়িত্ব কতক পরিমাণে হ্রাস পাইবে একথা বলা বাহুল্য। সুতরাং তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ ছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

Questions & Hints

1. Discuss the circumstances in which the Second Empire came into existence. (C. U. 1949, 1953, 1955).

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এক-কক্ষযুক্ত গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়। ঐ সময়ে ফরাসী জাতির মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। 'নেপোলিয়ন' নামের তখন এক দারুণ সম্মোহিনী শক্তি ছিল। শুধু নামের জন্যই লুই নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তার সৃষ্টি হইল। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে বিপুল ভোটাধিক্যে লুই নেপোলিযন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন; (২) রাষ্ট্রপতি ও রাজতান্ত্রিক আইনসভার মধ্যে মতানৈক্য; (৩) আইনসভা কর্তৃক শ্রমজীবীদের ভোটাধিকার হরণ—তিন বৎসর একই স্থানে বাস করিবার নীতি; (৪) লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা—আইনসভার বিরোধিতা; (৫) লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা; (৬) আইনসভার বিলুপ্তি; (৭) নূতন শাসনতন্ত্র—রাষ্ট্রপতির কার্যকাল দশ বৎসর; দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা—কাউন্সিল-অব-স্টেট্, ও লেজিস্লেটিভ্ এ্যাসেম্ব্লী; সিনেট নামে এক বিশেষ সভা স্থাপন; (৮) সিনেটের প্রস্তাব অনুসারে সম্রাটপদ গ্রহণ—জনগণের ভোটে এই ব্যবস্থা সমর্থিত; ফ্রান্সে দ্বিতীয় সম্রাট ও সাম্রাজ্যের উদ্ভব। ৯৫-৯৮ পৃষ্ঠা]

2. (a) Describe the home and the foreign policy of Napoleon III. Why did he fail? (C. U. 1950, 1957, 1959).

(b) Describe the foreign policy of Napoleon III. (C. U. 1952).

[উত্তর-সংকেত : (a) (১) সূচনা : তৃতীয় নেপোলিয়নের কার্য-নীতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনী হইতে গৃহীত ; (২) আভ্যন্তরীণ : দুইটি মূলনীতি : স্বৈরাচারী শাসনাধীনে বিপ্লবের সুফল রক্ষা ; গণতান্ত্রিক কাঠামোর পশ্চাতে একক প্রাধান্য স্থাপন ; (ক) বাহ্যতঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া নিজ হস্তে শাসনক্ষমতা গ্রহণ ; (খ) শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, নিয়মানুবর্তিতা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষাদান ; (গ) সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ; (ঘ) সভা-সমিতি নিয়ন্ত্রণ ; (ঙ) জন-কল্যাণকর কার্যের দ্বারা জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণের ক্ষতিপূরণ,—দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ; শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, রেলপথ, পোস্ট, টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতির উন্নতি ; শ্রমজীবীদের উন্নতি ; দরিদ্রদের জন্য অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, দৈবদুর্ঘটনার সময় সরকারী সাহায্যদান ; (চ) প্যারিস ও অন্যান্য শহর ও নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ; (ছ) পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬০ হইতে উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন ; (৩) পররাষ্ট্র-নীতি : ব্যক্তিগতভাবে শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী—পরিস্থিতির চাপে যুদ্ধনীতি গ্রহণ ; নেপোলিয়ন বোনাপার্টির আমলের গৌরব ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প ; (ক) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—মর্যাদা বৃদ্ধি ; (খ) ইতালীয় ঐক্যের যুদ্ধ—যাজকসম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টি, ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফ্রান্সের স্বার্থের ও নিরাপত্তার পরিপন্থী—এই ধারণার ফলে ফরাসীদের বিদ্বেষ ; আকস্মিকভাবে যুদ্ধত্যাগে ইতালীয়দের ঘৃণার সৃষ্টি, স্যাভয় ও নিস্ দখল করায় ইংলণ্ডের বিরোধিতা, ফরাসী যাজকসম্প্রদায়ের বিরোধিতা ; (গ) পোলদের বিদ্রোহে সাহায্যদান—রাশিয়ার শত্রুতা অর্জন ; (ঘ) মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা—জনপ্রিয়তা হ্রাস ; (ঙ) জার্মান-নীতি ফ্রান্সের স্বার্থ-বিরোধী—স্যাডোয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষতা—সেডানের যুদ্ধে পরাজয়—তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন। ১০০-১১৩ পৃষ্ঠা]

(b) ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (a)-এর (৩) নং দ্রষ্টব্য]

3. How do you explain the downfall of Napoleon III ? (C. U. 1956). To what causes would you attribute the downfall of Napoleon III ? (C. U. 1952).

[উত্তর-সংকেত : (a) (১) সূচনা : তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি প্রথম দিকে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে ; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে

স্বৈরাচারী একক প্রাধান্য স্থাপন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, শহর ও নগরের সৌন্দর্যবর্ধন,—প্রভৃতি বহু কিছুতেই তাঁহার সাফল্য পরিলক্ষিত হয়; পররাষ্ট্র-নীতির প্রথম পর্যায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করিয়াও সেই পতনের পথ রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই; (২) পতনের কারণ: (ক) তৃতীয় নেপোলিয়নের অবাস্তব ধারণা; (খ) পরিস্থিতির চাপে চরিত্র ও কর্মপন্থা প্রভাবিত; (গ) অদূরদর্শী পররাষ্ট্র-নীতি; ইতালীয় নীতির ফলে যাজকসম্প্রদায়ের বিরোধিতা, ঐক্যবদ্ধ ইতালি গঠনের সহায়তা ফরাসী স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ফরাসী জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভীতি ও বিদ্বেষ; (ঘ) মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা—জনপ্রিয়তা হ্রাস; (ঙ) ভ্রান্ত জার্মান-নীতি—স্যাডোয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষতা—সেডানের যুদ্ধে পরাজয়; (চ) চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য ফরাসী জাতির আনুগত্যের একমাত্র মাপকাঠি—পররাষ্ট্র-নীতির বিফলতা আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উদারতা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই—সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন। ১১৩-’১৬ পৃষ্ঠা।]

সপ্তম অধ্যায়

ইতালির ঐক্য

(Italian Unification)

ভিয়েনা কংগ্রেসের পূর্বে ও পরে ইতালি (Italy before and after the Congress of Vienna) :

ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইতালি বহুসংখ্যক পরস্পর-বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের আত্মকলহে প্রায়ই বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইত। স্বভাবতঃই ইতালি উপদ্বীপে কোন প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বা জাতীয়তাবোধ জন্মায় নাই।

ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইতালি পরস্পর বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সাম্রাজ্যভুক্ত অবস্থায় ইতালিতে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপিত হয়; সমগ্র ইতালিতে একই প্রকার আইন-কানুন, একই প্রকার শাসন স্থাপিত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেস "ন্যায্য-অধিকার নীতি" (Principle of Legitimacy)'র প্রয়োগে উত্তর-ইতালিতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য পুনঃস্থাপন করে। টাস্কেনি, পার্মা ও মোডেনায় অস্ট্রিয়ার রাজপরিবার-সম্ভূত রাজগণ রাজত্ব করিতেন, ফলে এই সকল স্থানেও অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। দক্ষিণ-ইতালির সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্‌ রাজ্য বুর্‌বোঁ রাজবংশের অধীনে পুনঃস্থাপন করা হইয়াছিল। মধ্য-ইতালি পোপের অধীন ছিল। মধ্য-ইতালিস্থ পোপের রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ ইতালিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এই সকল দেশের প্রত্যেকটির স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমগ্র ইতালীয় জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এবং নেপোলিয়নের অধীনে থাকা-কালীন শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের অভিজ্ঞতা ইতালীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা মানুষ মাত্রেরই সমতা, সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বাধিকার

নেপোলিয়নের অধীনে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য-স্থাপন

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগে ইতালি পুনরায় শতধা বিভক্ত

স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের প্রভাবে ইতালীয়দের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের সৃষ্টি

প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েনা কংগ্রেস তাহাদের এই আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিলে তাহাদের মধ্যে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইল। 'ন্যায্য অধিকার' নীতি প্রয়োগ করিতে গিয়া ভিয়েনা কংগ্রেস ইতালিকে শতধা বিচ্ছিন্ন দেশে পরিণত করিল; 'ইতালি' নামটি নিছক ভৌগোলিক নামে (Geographical expression) পর্যবসিত হইল। প্রকৃত ক্ষেত্রে ইতালি বলিতে কোন একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ বুঝাইত না। ইতালি তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতালির লোম্বার্ডি, পার্মা, টাস্কেনি, মোডেনা, লুক্কা, পোপের রাজ্য পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া ও সিসিলি-ন্যাপল্‌স্—এই আটটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।* এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোনপ্রকার রাজনৈতিক যোগাযোগ বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষার চেষ্টা করা হইত না। একদেশ হইতে অপর দেশে কোনপ্রকার সামগ্রী রপ্তানি করিতে গেলে অতি উচ্চ হারে শুল্ক দিতে হইত। শিল্প বা বাণিজ্য বৃদ্ধির প[...] স্বভাবতই এই সকল ব্যবস্থা বাধাস্বরূপ ছিল। এইরূপ রাজনৈতি[...] অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমগ্র ইতালির ঐক্যের [...] সুদূরপরাহত ছিল সন্দেহ নাই। প্রত্যেক অংশের সরকা[...] ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু এই গভীর হতাশা সত্ত্বেও দক্ষিণ-ইতালির রাজ্যগুলির মধ্যে 'কার্বোনারি' (Cabonari) নামে গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি হইল। এই গোপন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল ন্যাপল্‌স্।

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ইতালীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত: 'ইতালি' ভৌগোলিক নামে পর্যবসিত

আটটি প্রধান অংশে

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের অভাব

'কার্বোনারি' নামক গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দিলে ন্যাপল্‌স্-এ উহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। কার্বোনারি'র সভ্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং বুরবোঁ বংশের রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ডের নিকট হইতে এক উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র আদায় করিল। কিন্তু দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ড (১৮১৫-৪৮) নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্য

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ন্যাপল্‌সে বিদ্রোহ: অস্ট্রিয়ার সাহায্যে দমন

* "We have no flag, no political name, no rank, among European nations. We have no common centre, no common fact, no common market. We are dismembered into eight states ....." Lipson P. 163.

লইয়া তিনি বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিলেন এবং উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিয়া পুনরায় স্বৈরাচারের প্রবর্তন করিলেন। ন্যাপল্‌সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাইড্‌মণ্ট্‌বাসীরাও প্রথম ভিক্টর ইমান্যুয়েল-এর নিকট হইতে এক শাসনতন্ত্র আদায় করিল। শেষ পর্যন্ত এখানেও অস্ট্রিয়ার সাহায্যে স্বৈরতন্ত্র পুনরায় স্থাপিত হইল।

পাইড্‌মণ্ট্‌-এর বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ার সাহায্যে দমন

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইতালির মোডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা ফ্রান্স হইতে সাহায্য লাভের আশা করিয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের ভয়ে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ্পি সাহায্য প্রেরণ করিতে পারিলেন না। অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপে ইতালির বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইল ।াপাতদৃষ্টিতে ১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ফলপ্রসূ না হইলেও এগুলির গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না এই দুই বিদ্রোহে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে ইতালিবাসী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইতালিকে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ইতালির জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। সুতরাং ঐ সময় হইতেই সমগ্র ইতালির জনগণ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল। একই ।।:শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলেই ইতালিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৮৩০
বিপ্লবের প্রভাব : মোডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমন

বিদ্রোহ বিফল হইলেও গুরুত্বপূর্ণ : অস্ট্রিয়ার na·াধান্যনাশে ইতালি- ’সী ঐক্যবদ্ধ

ভয়েন

ইতালিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাহাদের মানসিক প্রস্তুতির কার্যে যোসেফ্‌ ম্যাৎসিনির (Giuseppe Mazzini) দান ইতালির ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।

যোসেফ্‌ ম্যাৎসিনির অমর দান

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিবার ফলে ম্যাৎসিনিকে কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। ঐ সময় হইতে তিনি ‘ইয়ং ইতালি’ (Young Italy) নামে এক নূতন সমিতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধ, একনিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ প্রভৃতির আদর্শে ইতালির যুব-সমাজকে তিনি স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যসাধনের পথে

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ : ম্যাৎসিনির কারাদণ্ড ও নির্বাসন

পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ইতালির বহুসংখ্যক যুবক দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে অগ্রসর হইল। সমগ্র ইতালিতে ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার কর্মপন্থা যেমন ছিল সুস্পষ্ট তেমনি ছিল প্রেরণাদায়ক। তিনি দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিলেন: প্রথমতঃ, ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইলে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু এই যুদ্ধে ইতালিবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে একমাত্র নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিলেই তবে জয়যুক্ত হইতে পারিবে। তিনি বলিলেন যে, কেবলমাত্র একনিষ্ঠতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও সততার সহিত ইতালিবাসী যদি তাহাদের আদর্শের দিকে ধাবিত হয় তাহা হইলেই অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে—কেবলমাত্র শক্তির সাহায্যে নহে। তিনি বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণ বা কূটকৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন না। দুই কোটি ইতালিবাসী যদি তাহাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্ঠার সহিত যে-কোন দুঃখবরণে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে ইতালিতে আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে না—এই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালিতে যখন জাতীয় ঐক্যের আশা একপ্রকার নির্মূল হইয়া গিয়াছিল সেই সময়ে সুইট্জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং প্রধানতঃ ইংলণ্ডে নির্বাসিত অবস্থায় থাকিয়া তিনি সমগ্র ইতালির জনসাধারণের মধ্যে ইতালির ঐক্য যে অবাস্তব কল্পনা নহে সেই ধারণা জন্মাইতে সমর্থ হন। 'সমগ্র ইতালি ও সকল ইতালিবাসীদের নামে আন্দোলন করিও, অন্য কোন নামে নহে'—এই কথা তিনি ইতালিবাসীদের সর্বদা বলিতেন। এইভাবে সমগ্র ইতালি এবং সকল ইতালিবাসীদের মধ্যে এক জাতীয় জাগরণ তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইতালীয় ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি ম্যাৎসিনির একনিষ্ঠ আন্দোলনের ফলে সম্ভব হইয়াছিল।

'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন

ম্যাৎসিনির কর্মপন্থা: (১) অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করা, (২) আত্মনির্ভরতা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া সাফল্য অর্জন করা—বিদেশী সাহায্যে নহে

ইতালীয় ঐক্য অলীক কল্পনা নহে—এই ধারণার সৃষ্টি

ইতালীয় ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইতালিতে ব্যাপক বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু হইল, কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও

সংগঠনের অভাব হেতু অস্ট্রিয়া সহজেই উহা দমন করিতে সমর্থ হইল। এই বিপ্লবের ফলে ইতালিবাসী এই সত্যটি উপলব্ধি করিল যে, বিদেশী সাহায্য ভিন্ন অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করা সম্ভব হইবে না। পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ক্যাভুর সর্বপ্রথম এই কথা বুঝিতে পারিলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতা: বিদেশী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন—এই শিক্ষা লাভ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইতালীয় বিদ্রোহের অপর একটি গুরুত্ব ছিল। এই বিদ্রোহে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার স্যাভয় বংশীয় রাজা চার্লস্‌ এলবার্ট নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ইতালীয়দের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কাস্টোজ্জা (Custozza) এবং নোভারা (Novara)'র যুদ্ধে চার্লস্‌ এল্‌বার্ট অস্ট্রিয়ার হস্তে পরাজিত হন। ইহা ভিন্ন তিনি পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ায় এক উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। ইতালিবাসীদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনের ফলে স্যাভয় রাজপরিবার ইতালীয় ঐক্যের নেতৃত্বলাভে সমর্থ হয়। স্যাভয় রাজপরিবারের জাতীয়তাবোধের দৃষ্টান্ত সমগ্র ইতালীয় জাতিকে এক নিঃস্বার্থ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। নোভারা-এর যুদ্ধের পর (১৮৪৯) চার্লস্‌ এল্‌বার্টকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া এল্‌বার্টের পুত্র ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে স্বপক্ষে রাখিবার উদ্দেশ্যে খুব সহজ শর্তেই সন্ধি স্থাপনের সুযোগ দিয়াছিল। অস্ট্রিয়া এই সুযোগে ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে চার্লস্‌ এল্‌বার্ট কর্তৃক গৃহীত উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিতে জানাইলে তিনি এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার এই দৃঢ়তা এবং জাতীয়তাবোধ তাঁহাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। ইতালিবাসী ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে "সাধু রাজা" (Honest king) উপাধিতে ভূষিত করিল। পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার রাজপরিবার জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল এবং পাইড্‌-মণ্ট-সার্ডিনিয়া ইতালির জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকারীদের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল।

চার্লস্‌ এল্‌বার্ট কর্তৃক ইতালির জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

কাস্টোজ্জা ও নোভারার যুদ্ধে এল্‌বার্টের পরাজয়

চার্লস্‌ এল্‌বার্টের দৃষ্টান্তে ইতালীয়দের মনে নিঃস্বার্থ জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি

ভিক্টর ইমান্যুয়েলের দৃঢ় জাতীয়তাবোধ: 'সাধু রাজা' উপাধি

পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়া আন্দোলনকারীদের আশ্রয়স্থল

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর ইমান্যুয়েল কাউণ্ট ক্যাভুরকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত

করেন। ক্যাভুর বিশ্বাস করিতেন যে, পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া যদি ইতালিবাসীর জাতীয় জাগরণকে কার্যকরী করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে অনায়াসেই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হইবে। ক্যাভুর ম্যাৎসিনির ন্যায় অবাস্তব আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বমত-পোষক বাস্তববাদী। ম্যাৎসিনির ন্যায় তিনিও ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, বিদেশী সাহায্য ভিন্ন ইতালীয় ঐক্যসাধন বা স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নহে। এই বিষয়ে তাঁহার মত ছিল ম্যাৎসিনির মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাউণ্ট ক্যাভুর প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত (১৮৫২)

ক্যাভুরের মতবাদ ও কর্মপন্থা

ক্যাভুর পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইতালিকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্য যাহাতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভের উপযোগী হইতে পারে সেইজন্য তিনি তথায় এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। এইভাবে তিনি ইতালিবাসীদের মনে স্যাভয় পরিবারের শাসনের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসনের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন: স্যাভয় পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি

বিদেশী সাহায্যলাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল ইতালির সমস্যা সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সহানুভূতির সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে ক্যাভুর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক) যোগদান করেন। তিনি ছিলেন অসামান্য কূটকৌশলী। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগে তিনি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশের প্রতিনিধি হইয়াও প্যারিসের বৈঠকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানলাভে সমর্থ হন! এই বৈঠকে তিনি ইতালির স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং ইতালির সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান না করিতে পারিলে ইওরোপে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না, এই কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। ইংলণ্ড ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল এই কথা ইংরেজ প্রতিনিধি ক্ল্যারেণ্ডনের বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। ক্যাভুর উদারচেতা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি অর্জনে সমর্থ হন। ইতালির স্বাধীনতা এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়।

ক্যাভুর কর্তৃক ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ: ইতালীয় সমস্যা এক আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ

প্যারিসের সন্ধির অল্পকাল পরে (১৮৫৮) ক্যাভুর প্লোম্বিয়ারিস্ নামক স্থানে তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখানে উভয়ের মধ্যে স্থির হয় যে, আল্প্‌স্ পর্বত হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ইতালি স্বাধীন হইবে এবং এজন্য অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি, ভেনিশিয়া, পোপের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিবে এবং ফ্রান্স সামরিক সাহায্যদানের পুরস্কারস্বরূপ স্যাভয় ও নিস্ পাইবে। এই সকল শর্ত-সম্বলিত 'প্লোম্বিয়ারিস্ চুক্তি' (Pact of Plombieres) নামে এক চুক্তিপত্র উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইল (২১শে জুলাই, ১৮৫৮)।

প্লোম্বিয়ারিস্-এর চুক্তি (১৮৫৮)

ফ্রান্সের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ামাত্রই ক্যাভুর সামরিক প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলেন। অস্ট্রিয়া পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার এই সামরিক প্রস্তুতিতে বাধা দিল। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অস্ট্রিয়া দাবি জানাইলে ক্যাভুর উহা অগ্রাহ্য করিলেন। এই সূত্রে অস্ট্রিয়া পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৮৫৯)। ফ্রান্সের সামরিক সাহায্যে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া ম্যাজেণ্টা (Magenta) ও সোল্‌ফেরিনো (Solferino)'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। লোম্বার্ডি ও মিলান মিত্রশক্তির অর্থাৎ পাইড্‌মণ্ট ও ফ্রান্সের যুগ্ম বাহিনীর অধিকারে আসিল। মিত্রশক্তি যখন এইভাবে উত্তরোত্তর বিজয়লাভ করিতেছিল তখন আকস্মিকভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাঙ্কা (Villafranca) নামক সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি মিত্রশক্তি পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত এবিষয়ে কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা না করিয়াই সন্ধি স্বাক্ষর করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি ফরাসী ক্যাথলিক যাজকদের মনঃপূত ছিল না, ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের অতি নিকটে ঐক্যবদ্ধ ইতালি ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের পরিপন্থী হইবে—এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করেন। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি দখল করিল, ভেনিশিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনেই

অস্ট্রিয়া ও পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৯)

ম্যাজেণ্টা ও সোল-ফেরিনো'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়

তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ: ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

রহিল, ইতালির রাজ্যগুলি লইয়া পোপের সভাপতিত্বে একটি রাষ্ট্র-সঙ্ঘ স্থাপিত হইল ; মোডেনা ও টাস্কেনির ডিউকগণ যাঁহারা জনগণের বিদ্রোহের ফলে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া পাইবেন স্থির হইল।

ভিল্লাফ্রাঙ্কা সন্ধির শর্ত : পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার লোম্বার্ডি লাভ

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় ইতালিবাসীদের মনে তাঁহার প্রতি দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি হইল ; ক্যাভুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্যাভুর ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভিক্টর ইমান্যুয়েল ক্যাভুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন ; তিনি এক্ষেত্রে ক্যাভুর অপেক্ষা অধিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এইরূপ ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়াই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন সম্ভব হইবে। ভিক্টর ইমান্যুয়েল ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি মানিয়া লইলে ক্যাভুর বিরক্তিবশতঃ পদত্যাগ করেন।

নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা : ইতালিবাসীর ঘৃণা ; ক্যাভুরের পদত্যাগ

এদিকে টাস্কেনি, মোডেনা, পার্মা, রোমানা প্রভৃতি স্থান ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির শর্তাদি অগ্রাহ্য করিল। তাহারা তাহাদের পূর্বেকার স্বৈরাচারী শাসকগণকে পুনরায় গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। এইসকল স্থানের জনসাধারণ এক গণভোটের দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া এই গণভোট অনুসারে এই সকল স্থান অধিকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কারণ এইরূপ পন্থা অনুসরণ করিলে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু গোপনে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়া হইতে ঐ সকল স্থানের জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল। ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নও বুঝিলেন যে, জনগণের মত উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসকদের পুনঃ স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ইংলণ্ডও ফরাসী বা অস্ট্রিয়ার সৈন্যের সাহায্যে মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের বিরোধিতা করিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ক্যাভুর পুনরায় প্রধান মন্ত্রিপদে ফিরিয়া আসিলেন (১৮৬০)। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস্—এই দুইটি স্থান উৎকোচ-

টাস্কেনি, মোডেনা পার্মা, রোমানা কর্তৃক, ভিল্লাফ্রাঙ্কা সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য : পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা

ইংলণ্ড কর্তৃক সামরিক সাহায্যে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের বিরোধিতা


ইতালির ঐক্য
০ ৫০ ১০০ ১৫০
মাইল
সুইট্জারল্যাণ্ড
লোম্বার্ডি
১৮৫৯
ভেনেশিয়া
১৮৬৬
ট্রিয়েস্ট
অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য
পাইড্মণ্ট
পার্মা
১৮৬০
ভেনিস্
তুর্কী সাম্রাজ্য
ফ্লোরেন্স
নিস্
টাসক্যানি
১৮৬০
আড্রিয়াটিক সাগর
কর্সিকা
(ফরাসী)
রোম
১৮৭০
ন্যাপলস
১৮৬০
সার্ডিনিয়া
পালের্মো
মেসিনা
১৮৬০
সিসিলি
ভূমধ্য সাগর
পাইড্মণ্ট্-সার্ডিনিয়া (মূলরাজ্য)
নূতন অংশের সংযুক্তি:
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ
১৮৬৬ "
১৮৭০ "
ফ্রান্সকে প্রদত্ত (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ)
S. DASGUPTA

স্বরূপ দান করিতে রাজী হইলেন। নেপোলিয়নও মধ্যইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানের জনগণের ইচ্ছানুসারে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির নীতি মানিয়া লইলেন। গণভোটের দ্বারা মধ্য ইতালিস্থ টাস্কেনি পার্মা, মোডেনা, রোমানা, পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়া এখন লোম্বার্ডি, মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি, রোমানা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলে ইতালীয় ঐক্যের পথ বহুদূর অগ্রসর হইল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের স্যাভয় ও নিস্ প্রাপ্তি: মধ্য-ইতালীয় রাজ্যগুলির পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তি

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে সিসিলিতে তথাকার স্বৈরাচারী রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের (১৮৪৮-৬০) বিরুদ্ধে এক গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। গ্যারিবল্ডি নামক স্বনামধন্য জনপ্রিয় নেতা বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে সৈন্যসহ সিসিলিতে গমন করেন। গ্যারিবল্ডি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ সামরিক নেতা। তাঁহার নামে ইতালিবাসীদের মনে এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইত। গ্যারিবল্ডি তাঁহার সহস্র অনুচরসহ অনায়াসে সিসিলি অধিকার করিলেন। সিসিলি জয় করিয়া তিনি ন্যাপল্‌সে গমন করেন। সেখানে একপ্রকার বিনা-যুদ্ধেই তিনি ন্যাপলস্ অধিকার করিলেন। সিসিলি-ন্যাপল্‌সের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্ ন্যাপ্‌ল্‌স্ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। গ্যারিবল্ডি অতঃপর রোমনগরী দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। রোমনগরীতে তখন পোপের সাহায্যার্থে একদল ফরাসী সৈন্য মোতায়েন ছিল। রোম-নগরী আক্রমণ করিলে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে কূটকৌশলী ক্যাভুর দেখিলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডির অগ্রসর হওয়া যেভাবেই হউক রোধ করিতে হইবে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রোমনগরী এবং পোপের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ না করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন পোপের রাজ্যের অন্যান্য অংশ পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হওয়ার বিরোধিতা করিবেন না। তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার ধারণাই সত্য। কালক্ষেপ না করিয়া ক্যাভুর পোপের রাজ্য দখল

সিসিলিতে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ

গ্যারিবল্ডির সিসিলি

ন্যাপল্‌স্ অধিকার

ক্যাভুরের কূটকৌশল

ক্যাভুর কর্তৃক পোপের রাজ্য দখল

করিলেন পোপের রাজ্য দখল করিয়া ক্যাভুর কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যবাহিনী ন্যাপ্‌ল্‌সে প্রবেশ করিল। সেখানে এবং সিসিলিতে এক গণভোট গ্রহণ করা হইল। বিপুল ভোটাধিক্যে এই দুই স্থান পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হইল। রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন সমগ্র ইতালি স্যাভয় পরিবারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইল।

সিসিলি ও ন্যাপ্‌লসে গণভোট : পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তি

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে রোম ও ভেনিশিয়া পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইল। ভেনিশিয়ায় অস্ট্রিয়ার এক সামরিক বাহিনী উপস্থিত ছিল ; রোমে ছিল এক ফরাসী বাহিনী। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইলে একদিকে যেমন জার্মান ঐক্য আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়, তেমনি অপর দিকে অস্ট্রিয়া ইতালিকে ভেনিশিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করে। ঐ যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়ার মিত্রশক্তি ইতালি রোমনগরী লাভ করে ; ফ্রান্স রোম হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হয়। এইভাবে জার্মান ঐক্যের জন্য সংঘটিত দুইটি যুদ্ধের ফলে ইতালি ভেনিশিয়া ও রোম—এই দুইটি স্থান লাভ করে। ইতালিবাসীদের বহুকালের অভিপ্রেত জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা স্থাপিত হয়।

স্যাডোয়ার যুদ্ধ : ভেনিশিয়া লাভ (১৮৬৬)

সেডানের যুদ্ধ : রোমনগরী লাভ (১৮৭০)

ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা স্থাপিত

যোসেফ্‌ ম্যাৎসিনি (Giuseppe Mazzini) : ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়া নামক স্থানে যোসেফ্‌ ম্যাৎসিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক। বাল্যকাল হইতেই ম্যাৎসিনি নিজ দেশ ও দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবিয়া আকুল হইতেন। অন্যান্য ছাত্রেরা যখন বালক-সুলভ আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত, ম্যাৎসিনি তখন সেই আমোদ-আহ্লাদ ত্যাগ করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।

ম্যাৎসিনির বাল্য-জীবন

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি ছিল অপরিসীম। বালকসুলভ মনোবৃত্তির জন্যই তিনি একবার স্থির করিলেন যে, তিনি নিজ দেশের দুঃখ-দুর্দশার প্রতীক হিসাবে সর্বদা শোকব্যঞ্জক কালো পোশাক পরিধান করিবেন।*

তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি

প্রথম জীবনে সাহিত্যের প্রতি ম্যাৎসিনির বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার এই গভীর সাহিত্যানুরাগও স্বদেশসেবার কার্যে আহুতি দিয়াছিলেন। তিনি 'কার্বোনারি' (Carbonary) নামক বিপ্লবী সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'কার্বোনারি'র কর্মপন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তথাপি এই সঙ্ঘ দেশসেবার কার্যে নিযুক্ত ছিল, কেবলমাত্র সেইজন্যই তিনি এই সঙ্ঘের সভ্য হইযাছিলেন।

কার্বোনারিতে যোগদান

এই সঙ্ঘের সভ্য হওয়ার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। স্যাভোনা (Savona) নামক দুর্গে তাঁহাকে ছয় মাস বন্দী থাকার পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়। পরবর্তী দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ম্যাৎসিনি তাঁহার নির্বাসিত জীবন সুইট্জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেন। তিনি এই সকল দেশ হইতে স্বদেশের কল্যাণার্থে আন্দোলন চালাইতে থাকেন। 'কার্বোনারি'র ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থায় ম্যাৎসিনি বিশ্বাস করিতেন না। এইজন্য তিনি 'ইয়ং ইতালি' (Young Italy) নামক এক নূতন সঙ্ঘ বা সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতিতে চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়সের ইতালীয়দের গ্রহণ করা হইত।

স্যাভোনার দুর্গে বন্দী : মুক্তিলাভের পর নির্বাসিত

'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His aims & Policy) :

ম্যাৎসিনির উদ্দেশ্য ছিল শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন করা। তিনি ইতালিতে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালির স্বাধীনতা অর্জন ও ঐক্যসাধন ম্যাৎসিনির নিকট এক ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আত্মনির্ভরতা ও আত্মত্যাগের দ্বারা তিনি এই উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া

তাঁহার উদ্দেশ্য : ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যস্থাপন

* "In the midst of the noisy, tumultuous life of the students around me, I was sombre and absorbed and appeared like one suddenly grown old. I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country". *Mazzini's Autobiography,* Quoted by Hazen P. 145.

তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নীতি ছিল 'কার্বোনারি'র ধ্বংসাত্মক নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি স্থির করিলেন যে, (১) ইতালি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করিতে হইবে; ইতালির ঐক্য বা উন্নতির প্রথম শর্তই ছিল অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের অবসান করা। (২) অস্ট্রিয়াকে ইতালির আধিপত্য হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু ইতালিবাসীদিগকে নিজেদের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই এই যুদ্ধে অবতরণ করিতে হইবে। কূটনীতির বা বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। (৩) ইহা ভিন্ন ইতালিবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। কেবলমাত্র শক্তির সাহায্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে না। নিজশক্তিতে এবং নিজ আদর্শে বিশ্বাস থাকিলেই তাহারা সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমগ্র ইতালিবাসী যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এবং একাগ্রতা সহকারে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে তাহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

তাঁহার নীতি: (১) অস্ট্রিয়ার আধিপত্যনাশ, (২) অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ, (৩) আত্মনির্ভরশীলতা ও নিজ আদর্শে বিশ্বাস

ম্যাৎসিনি ইতালির যুবশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য যে আহ্বান জানাইলেন তাহাতে সমগ্র ইতালির যুবসমাজ অত্যাচার, অবিচার, কারাবাস প্রভৃতির ভয়ে ভীত না হইয়া দলে দলে তাঁহার 'ইয়ং ইতালি'র সঙ্ঘে যোগদান করিল। অল্পকালের মধ্যেই ইতালীয় উপদ্বীপের সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। গভীর হতাশায় নিমজ্জিত ইতালিবাসীদের মধ্যে এক নব চেতনা—এক ব্যাপক জাগরণের সৃষ্টি হইল। তিনি শতধা-বিচ্ছিন্ন ইতালি জাতিকে সমগ্র ইতালি এবং সমগ্র ইতালীয় জাতি সম্পর্কে চিন্তা করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই কথা-ই বুঝাইলেন যে, দুই কোটি ইতালিবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাদের দাবি কার্যকরী করিতে চাহিলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে তাহা দমন করা সম্ভব হইবে না। এইভাবে এক গভীর হতাশার মধ্যে ম্যাৎসিনি আশার সঞ্চার করিলেন।

'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন

ইতালিবাসীদের মনে এক নবচেতনার সৃষ্টি

ইতালীয় ঐক্য-আন্দোলনে ম্যাৎসিনির দান (Mazzini's contributions to Italian unity): প্রত্যেক বিপ্লবের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি বা চেতনার প্রয়োজন। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এইরূপ জাগরণ

সৃষ্টি করিয়াছিলেন ফরাসী দার্শনিকগণ। ইতালির ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে জাগরণের প্রয়োজন ছিল তাহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যোসেফ্ ম্যাৎসিনি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বার্থান্বেষী ও ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া কার্বোনারি ইতালিবাসীকে তাহাদের আদর্শে পৌঁছাইতে সমর্থ হইবে না। জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শে পেঁীছাইতে হইলে গঠনমূলক কর্মপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই কারণে তিনি 'ইয়ং ইতালি' নামে এক যুবসজ্ঘ স্থাপন করেন। দেশপ্রেমিক, ভবিষ্যৎদর্শী ম্যাৎসিনি তাঁহার 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলনের দ্বারা ইতালিবাসীদের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতা, দেশাত্ম-বোধ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রতি এক গভীর অনুরাগের সৃষ্টি করেন। ইতালির স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আদর্শ ইতালীয়দের এক নূতন ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ম্যাৎসিনি নিজে হইলেন এই গভীর জাতীয় অনুভূতির প্রতীক। তাঁহার আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও প্রেরণা ইতালিবাসীদের মধ্যে এক নব জাগরণের সৃষ্টি করিল।

ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি

স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য—ইতালিবাসীদের এক নূতন ধর্মস্বরূপ

ম্যাৎসিনির কর্মপন্থা অনুসরণ করিলে ইতালি হয়ত নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত না। তথাপি তাঁহার আদর্শ ও সংগঠন-শক্তির ফলে সমগ্র ইতালীয় জাতীর মধ্যে স্বাধীনতা ও ঐক্যের যে চেতনা ও স্পৃহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা না হইলে ইতালীয় জাতীয় ঐক্যসাধন সম্ভব হইত না। তিনি ইতালিবাসীর মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ম্যাৎসিনির কার্যের ফলেই ইতালীয় স্বাধীনতা ও ঐক্য সম্ভব হইয়াছিল

রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ম্যাৎসিনির মতবাদ অত্যন্ত চরমপন্থী ও অবাস্তব বলিয়া মনে করিতেন। অপর একদল তাঁহার স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা সমর্থন করিতেন, কিন্তু ইতালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা নিছক বাতুলতা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা ইতালিবাসীর এক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হইলেও সমগ্র ইতালির ঐক্যসাধন মোটেই সম্ভব ছিল না। ইহা ভিন্ন, ঐ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল। কোন কোন দল ছিল রাজতান্ত্রিক;

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল: ইতালীয়দের মতামত বিভ্রান্ত

অপর এক দল সমগ্র ইতালিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপনে ইচ্ছুক ছিল। ম্যাৎসিনি নিজে ছিলেন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। যাহা হইক, এইরূপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন আদর্শ যখন ইতালিবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল তখন ম্যাৎসিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং সর্বোপরি তাঁহার সংগঠনী শক্তির সাহায্যে সমগ্র ইতালিতে এক জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতির চেতনার সৃষ্টি করেন। এই চেতনার চরম পরিণতি ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য।

ম্যাৎসিনির প্রেরণার পরিণতি—ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য

কাউণ্ট্ ক্যাভুর (Count Cavour)ঃ কাউণ্ট্ ক্যাভুর ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পাইড্মণ্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সামরিক বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। উদার মতবাদ ও রাজনীতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের ফলে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে সামরিক চাকরি ত্যাগ করিতে হয়। তিনি সরকারি চাকরি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতির প্রতি অনুরাগ মোটেই কমিল না। তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বহুবার এই দুই দেশে ভ্রমণ করলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতি তাঁহার মনোগ্রাহী ছিল বলিয়া তিনি রাত্রির পর রাত্রি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে দর্শক হিসাবে বসিয়া থাকিয়া তথাকার গণতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিলেন। ফলে ইংরেজ শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার এক অতি উচ্চ ধারণা জন্মিল এবং নিজ দেশেও অনুরূপ শাসনব্যবস্থা স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিল। নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইলে তিনি বিপ্লবী পন্থায় আস্থা হারাইলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর পাইড্মণ্টে একটি উদার শাসনতন্ত্র ও পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইলে ক্যাভুর অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিয়ম-তান্ত্রিকতার মাধ্যমেই ইতালির উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইবে এই বিশ্বাস তাঁহার মনে

প্রথম জীবন: সামরিক বিভাগে যোগদান

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ

নিয়ম-তান্ত্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধা

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইড্‌-মণ্ট্‌ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত; ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত; ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী

বদ্ধমূল হইল। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইড্‌মণ্ট্‌ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইলেন। দুই বৎসর পর (১৮৫০) তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। ইহার আরও দুই বৎসর পর তিনি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন।

চরিত্র

ক্যাভুরের চরিত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান, বিবেচনা, নির্ভীকতা ও দৃঢ় সংকল্পের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া চলিবার শক্তি তাঁহার ছিল অতুলনীয়। কূটনৈতিক চালে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ক্যাভুরের উদ্দেশ্য ও নীতি (His aims and principles):

উদ্দেশ্য: স্বাধীনতা-লাভ ও ঐক্যসাধন

ম্যাৎসিনির ন্যায় ক্যাভুরেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইতালির স্বাধীনতা-অর্জন ও ঐক্যসাধন করা। কিন্তু তাঁহার কার্যপন্থা ছিল ম্যাৎসিনির কার্যপন্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহার নীতি ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী। ম্যাৎসিনি আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর জোর দিতেন; বিদেশী সাহায্য গ্রহণের তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ক্যাভুর বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র বিদেশী সাহায্য লইয়াই ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন সম্ভব। ম্যাৎসিনির ন্যায় তিনি অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন না। এই কারণে তিনি ইতালির সমস্যাকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিয়া ইওরোপীয় অপরাপর শক্তির সহানুভূতিলাভে সচেষ্ট হন।

ম্যাৎসিনি ও ক্যাভুর

তাঁহার নীতি: (১) অস্ট্রিয়ার আধিপত্য-নাশ, (২) পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য-আন্দোলনের নেতৃপদে স্থাপন, (৩) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে আদর্শ রাজ্যে পরিণত করা, (৪) আন্তর্জাতিক সাহায্যলাভ

ক্যাভুরের নীতি ও কর্মপন্থাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য হইতে ইতালিকে মুক্ত করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য-আন্দোলনের নেতৃত্ব পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে গ্রহণ করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, ব্যবসায়-বাণিজ্য—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উন্নতির দ্বারা পাইড্‌-মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে ইতালিব নেতৃত্বের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে—পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে এক আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে

হইবে, চতুর্থতঃ, বিদেশী সাহায্য লাভ করিয়া অস্ট্রিয়াকে ইতালি হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে এবং এজন্য ইতালীয় সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিতে হইবে।

ক্যাভুরের প্রচারকার্য

ইওরোপীয় দেশগুলির সহানুভূতি লাভের জন্য উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই নৈতিক সমর্থন পাওযার উদ্দেশ্যে ক্যাভুর প্রচারকার্য শুরু করিলেন। সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে তিনি ইওরোপীয় দেশসমূহের উদারনৈতিক চেতনাকে ইতালির স্বপক্ষে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের 'মর্ণিং পোস্ট্' (Morning Post), 'দি টাইমস্' (The Times) এবং ফ্রান্সের 'লা ম্যাটিন' (La Matin), 'লা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ বেল্‌গি' (L' Independence Belge) নামক সংবাদপত্রে তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিয়া ইতালির সমস্যাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। অতি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চালের দ্বারা এই যুদ্ধের সুযোগে তিনি ইতালির সমস্যা সমাধানের পথ প্রস্তুত করিলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

এই যুদ্ধে তিনি ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষে যোগদান করিলেন এবং যুদ্ধ শেষে পুরস্কার-স্বরূপ প্যারিসের সন্ধির আন্তর্জাতিক বৈঠকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির সহিত পাইড মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকেও সমান আসনে স্থাপন করিলেন। পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ক্যাভুর এই আন্তর্জাতিক শান্তি-সম্মেলনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের সমমর্যাদাপূর্ণ আসন গ্রহণ করিলেন। ক্যাভুরের উদ্দেশ্য ছিল ইতালিব সমস্যার প্রতি ইওরোপীয় দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে তাহাদের সাহায্য লাভ করা।

প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে অংশ গ্রহণ

কালক্রমে ক্যাভুরের কুটকৌশল সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের—বিশেষতঃ উদারচেতা ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে (১৮৫৮) ক্যাভুর ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিযনের সহিত প্লোম্বিয়ারিস্ (Pact of Plombieres)-এর চুক্তি সম্পাদন করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্যাভয় ও নিস্ নামক দুইটি স্থান লাভের বিনিময়ে তৃতীয়

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ

প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি: তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

নেপোলিয়ন আল্‌প্‌স্‌ পর্বত হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ইতালীয় দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনে এবং পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে লোম্বার্ডি নামক স্থানটি দখল করিতে সাহায্য দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অপর দিকে ক্যাভুর ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলেন। পামারস্টোন্‌ ও রাসেলের মন্ত্রিত্বকালে ইংরেজ পররাষ্ট্র-নীতিও ইতালির স্বাধীনতা ও একতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল।

প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তির পর ক্যাভুর পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার সামরিক সংগঠনে মনোযোগ দিলেন। এই সূত্রে অস্ট্রিয়ার সহিত পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল। তৃতীয় নেপোলিয়নের সামরিক সাহায্যে পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া উত্তরোত্তর জয়লাভ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নিজস্বার্থ বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন এককভাবে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি দ্বারা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি লাভ করিল বটে, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্যাভুর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে এই সন্ধি বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন। ভিক্টর ইমান্যুয়েল ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি গ্রহণ করিলে ক্যাভুর পদত্যাগ করেন।

অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ক্যাভুরের পদত্যাগ

কয়েকমাস পর (১৮৬০) ক্যাভুর দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণে রাজী হইলেন। ইতিমধ্যে মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি ও রোমানা পাইড্‌মণ্ড-সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করে। ক্যাভুর দেখিলেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়নের অমতে ঐ সকল স্থান অধিকার করিলে অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স উভয় শক্তিরই বিরাগভাজন হইতে হইবে। ইহা ভিন্ন কূট-কৌশলী ক্যাভুর ইহাও বুঝিলেন যে, স্যাভয় ও নিস্‌ স্থান দুইটি তৃতীয় নেপোলিয়নকে উৎকোচস্বরূপ না দিলে মধ্য-ইতালীয় রাজ্যগুলির সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। এজন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে এই দুইটি স্থান দান করিলেন এবং বিনা বাধায় মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি রাজ্যগুলি পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত একত্রিত করিয়া লইলেন। ইতালীয় ঐক্য বহুদূর অগ্রসর হইল।

ক্যাভুরের পুনরায় মন্ত্রিপদ-গ্রহণ

মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা, টাস্কেনি ও রোমানা পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ

অপরদিকে সিসিলিতে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দিলে গ্যারিবল্ডি তাঁহার 'সহস্র সৈন্য' লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বুর্বোঁ-বংশের রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের নিকট হইতে সিসিলি দখল করিলেন। সিসিলি হইতে তিনি ন্যাপ্‌লসে উপস্থিত হইলেন। ন্যাপল্‌স্‌ও অনায়াসে তাঁহার করতলগত হইল। ফার্ডিনাণ্ড দেশত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। গ্যারিবল্ডি অতঃপর রোম এবং পোপের অন্যান্য রাজ্যাংশ দখল করিতে অগ্রসর হইবার মনস্থ করিলে ক্যাভুর প্রমাদ গণিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, রোম ও ভেনিশিয়া আক্রমণ করিলে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। ইহা ভিন্ন রোম ও পোপের রাজ্য যদি ন্যাপল্‌স্ ও সিসিলির সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার পক্ষে সমগ্র ইতালি ঐক্যবদ্ধ করা হয়ত সম্ভব হইবে না। এইজন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত গোপনে আলাপ-আলোচনা করিয়া রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন পোপের রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। রোম নগরী আক্রমণ না করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের এই বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না। ইহার পর ক্যাভুর ন্যাপল্‌সে পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক গ্যারিবল্ডি শেষ পর্যন্ত কোন বাধা দিলেন না। ন্যাপল্‌স্ ও সিসিলিতে গণভোট গ্রহণ করা হইল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে এই দুইটি স্থান পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিলে সমগ্র ইতালি ঐক্যবদ্ধ হইল। কেবলমাত্র রোম নগরী ও ভেনিশিয়া তখনও বিচ্ছিন্ন রহিল। রোমে ফরাসী সৈন্য পোপের সাহায্যার্থে মোতায়েন ছিল এবং ভেনিশিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবার ফলে ইতালি ভেনিশিয়া লাভ করে এবং প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধের পর রোমনগরী লাভ করে।

গ্যারিবল্ডি কর্তৃক সিসিলি ও ন্যাপ্‌লস্ জয়

পোপের রাজ্য দখল

ন্যাপল্‌স্ ও সিসিলির সংযুক্তি

ক্যাভুরের কৃতিত্ব বিচার : (Estimate of Cavour) :

আধুনিক ইতালির প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন কাউণ্ট্ ক্যাভুর। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে তাঁহার দানই ছিল সর্বাধিক। কেটল্‌বি (Ketelbey)'র মতে ক্যাভুর তাঁহার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির চেষ্টাকে

আধুনিক ইতালির স্রষ্টা

ইতালির প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছিলেন। ম্যাৎসিনির প্রেরণা ও গ্যারিবল্ডির সামরিক শক্তি—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন ক্যাভুর। ক্যাভুর ম্যাৎসিনির আদর্শকে যদি বাস্তবে রূপদান না করিতেন, বা গ্যারিবল্ডির সামরিক বিজয়কে যদি তিনি সমগ্র ইতালির স্বার্থে নিয়োজিত না করিতেন তাহা হইলে ইতালির ঐক্যসাধন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। ইতালির সমস্যা সমাধানে ক্যাভুরকে অনেক সময়েই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি এবং কূটকৌশলের দ্বারা তিনি সেই সকল বাধা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ইতালির প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল অতি স্পষ্ট। সূক্ষ্ম কূটকৌশলের দ্বারা তিনি ইতালীয় সমস্যাগুলিকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও ফরাসীদেশের সাহায্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় দেশগুলির উদারনৈতিক চেতনা বিশেষতঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের উদারতার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন কূটকৌশলী রাজনীতিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। একমাত্র জার্মান রাজনীতিক ও প্রধান মন্ত্রী বিস্‌মার্কের সহিত তাঁহাকে তুলনা করা চলে।

ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির কার্যের সামঞ্জস্য বিধান

বাস্তববাদী দেশসেবক

ইতালীয় সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত

সমসাময়িক রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; একমাত্র বিসমার্কের সহিত তুলনীয়

রাষ্ট্রপরিচালক ও সংস্কারক হিসাবেও ক্যাভুর উদারতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রেলপথ প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ইতালিবাসীদের মধ্যে এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সামরিক সংস্কারের দিক দিয়াও তাঁহার উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। তিনি ইতালির সামরিক শক্তিকে আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করিয়াছিলেন।

সুদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালক ও সংস্কারক

Questions & Hints

1. Give in outline the story of the Unification of Italy in the 19th century. (C. U. 1957).

Sketch the story of the Italian Unification.

(C. U. 1946, 1958)

How did Italy which was a 'geographical expression' in 1815 become a fully united country in 1870? (C. U. 1952)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ফরাসী বিপ্লবের কয়েক শতক পূর্ব হইতেই ইতালি পরস্পর-বিবদমান কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়নের অধীনে সমগ্র ইতালিতে শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ও আইন-কানুনের সমতা স্থাপিত হয়। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেস 'ন্যায্য-অধিকার' নীতির প্রয়োগ দ্বারা ইতালিকে পুনরায় শতধা বিভক্ত করে। ইহা ভিন্ন স্থানীয় স্বার্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইতালির জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ছিল। (২) ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের প্রভাবে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি ; (৩) ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক ইতালীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত, ইতালি এক 'ভৌগোলিক নামে' পর্যবসিত ; (৪) ইতালি—লোম্বার্ডি, পার্মা, টাস্কেনি, লুক্কা, পোপের রাজ্য, মোডেনা, পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়া ও সিসিলি-ন্যাপল্‌স্‌—এই আটটি রাজ্যে বিভক্ত ; বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের অভাব ; (৫) কার্বোনারি নামে বিপ্লবী দলের সৃষ্টি,—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাপল্‌স্‌, পাইড্‌মণ্ট্‌ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোডেনা, পার্মা, ও পোপের রাজ্যের বিদ্রোহ অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমিত ;—বিদ্রোহ বিফল হইলেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইতালীয়রা অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশে ঐক্যবদ্ধ ; (৬) (ক) যোসেফ্‌ ম্যাৎসিনির দান—"ইয়ং ইতালি" আন্দোলন, (খ) তাঁহার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা, (গ) ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি ; (৭) পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার স্যাভয় রাজবংশের দান—কাস্টোজ্জা ও নোভারার যুদ্ধে এলবার্টের পরাজয়—ভিক্টর ইমান্যুয়েলের দৃঢ়তা—পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়া আন্দোলনকারীদের ভরসাস্থল ; (৮) ক্যাভুরের দান—(ক) তাঁহার মতবাদ ও কর্মপন্থা ; খ) পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের যোগ্য করিয়া তোলা ; (গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান—ইতালির সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত ; (ঘ) ইংলণ্ড বিশেষতঃ ফ্রান্সের সহানুভূতি লাভ ; (ঙ) প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি ;

(চ) অস্ট্রিয়া ও পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ—ম্যাজেণ্টা ও সোল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে ফরাসী সাহায্যপুষ্ট পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার জয়লাভ—তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্ধত্যাগ; ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি; পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়ার লোম্বার্ডি লাভ; (ছ) সাময়িকভাবে ক্যাভুরের পদত্যাগ: ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ; (জ) স্যাভয় ও নিস্‌ তৃতীয় নেপোলিয়নকে উৎকোচ দান করিয়া মধ্য-ইতালির মোডেনা, পার্মা প্রভৃতি স্থানের সহিত সংযুক্তি; (৯) গ্যারিবল্ডি কর্তৃক সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্‌ জয়; (১০) ক্যাভুরের কূটকৌশলে রোম ও ভেনিশিয়া ভিন্ন পোপের রাজ্য জয়; (১১) গণভোটে সিসিলি ও ন্যাপল্‌সের সংযুক্তি; (১২) স্যাডোয়ার যুদ্ধের ফলে ভেনিশিয়া ও সেডানের যুদ্ধের ফলে রোম লাভ—১৮৭০-১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির ঐক্য সমাপ্ত। ১১৯-'২৯ পৃষ্ঠা]

2. Estimate the services of Mazzini and Cavour to the cause of Italian Unification. (C. U. 1955)

Assess carefully the contributions made by (a) Mazzini, (b) Cavour, to the cause of the Unification of Italy. (C. U. 1949).

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: ইতালীর স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জনে ম্যাৎসিনি ও ক্যাভুরের দান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া রহিয়াছে। (২) ম্যাৎসিনি: (ক) ইতালি যখন ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত—ইতালিবাসী যখন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত ম্যাৎসিনি তখন আশার সঞ্চার করেন; (খ) 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলন; (গ) তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি; (ঘ) ইতালিবাসীদের মনে এক গভীর জাতীয় ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি: ইতালিবাসীদের মানসিক প্রস্তুতি; (ঙ) স্বাধীনতা ও একতার স্পৃহা এক ধর্মস্বরূপ; (চ) ম্যাৎসিনির চেষ্টায়ই বিভ্রান্ত ইতালীয়দের মনে এক জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল—আত্মপ্রত্যয় জাতীয় ঐক্য স্বাধীনতার স্পৃহা সৃষ্টি করিয়াছিল; (৩) ক্যাভুর: (ক) ক্যাভুরের আদর্শ ও ম্যাৎসিনির আদর্শের অনুরূপ; কর্মপন্থার পার্থক্য; (খ) বিদেশী সাহায্যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়; (গ) পাইড্‌মণ্ট্‌-সার্ডিনিয়াকে ইতালির নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য করিয়া তোলা; (ঘ) ক্যাভুরের প্রচারকার্য—আন্তর্জাতিক সহানুভূতি; ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি অর্জন; (চ) প্লোম্বিয়ারিসের চুক্তি—অস্ট্রিয়ার সহিত

যুদ্ধ—ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি—লোম্বার্ডি অধিকার; (চ) কূটকৌশলের দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতিলাভ—স্যাভয় ও নিস্ দান—মধ্য-ইতালির পার্মা, মোডেনা প্রভৃতির সংযুক্তি; (ছ) গ্যারিবল্ডির সামরিক বিজয়কে ইতালির ঐক্যের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ; পোপের রাজ্য দখল—ন্যাপল্‌স্ ও সিসিলির সংযুক্তি; আধুনিক ইতালির প্রকৃত স্রষ্টিকর্তা—ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির কার্যের সামঞ্জস্য বিধান—ম্যাৎসিনির প্রেরণা ও গ্যারিবল্ডির সামরিক বিজয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জন। ১২৯-'৩৮ পৃষ্ঠা]

3. "Cavour was the maker of modern Italy." Amplify. (C. U. 1947) "Cavour" said Lord Palmerston in the British House of Commons "left a name to paint a moral and adorn a tale." Discuss. What service did he render to the cause of the Italian unity ? (C. U. 1945)

[উত্তর-সংকেত: ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৩)-এর অনুরূপ; আভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি লাইন লিখিতে হইবে। ১৩৩-'৩৮ পৃষ্ঠা]

4. What part did (a) Mazzini, (b) Cavour, (c) Victor Emmanuel and (d) Garibaldi play in the history of the Italian Unification ? (C. U. 1951)

[উত্তর-সংকেত: (a), (b) ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ (সংক্ষেপে লিখিতে হইবে); (c) ভিক্টর ইমান্যুয়েল: নোভারার যুদ্ধের পর চার্লস এল্‌বার্টের সিংহাসন ত্যাগ। ভিক্টর ইমান্যুয়েল (২য়)-এর সিংহাসন লাভ: (ক) অস্ট্রিয়া কর্তৃক পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়ার উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা দাবি নাকচ—ইমান্যুয়েলের অসম্মতি; (খ) তাঁহার দৃঢ়তায় স্যাভয় পরিবার ও পাইড্‌মণ্ট্-সার্ডিনিয়াকে ইতালির নেতৃত্বে স্থাপন ও ইতালীয়দের শ্রদ্ধা অর্জন; (গ) ক্যাভুর কর্তৃক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সহায়তা; (ঘ) ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি গ্রহণ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দান; (d) গ্যারিবল্ডি: (ক) সিসিলি অভিযান—সিসিলি ও ন্যাপল্‌স্ জয়; (খ) রোম আক্রমণের উদ্যোগ—দক্ষিণ-ইতালির একতা অর্জন। ১১৯-'২৯ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

জার্মানির ঐক্য

(German Unification)

ফরাসী বিপ্লবের পুর্বে জার্মানি তুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি কেবল নামেই পবিত্র রোমান সম্রাটের অধীন ছিল, প্রকৃতক্ষেত্রে এগুলি ছিল স্বাধীন। নেপোলিয়ন যখন জার্মানি জয় করেন তখন তিনি জার্মানির অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবর্তে উনচল্লিশটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য গঠন করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলোপসাধন করিয়া জার্মানির ৩৯টি রাজ্য লইয়া কন্‌ফেডারেশন-অব-দি-রাইন (Confederation of the Rhine) নামে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন করেন। ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের সংগঠন এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর একতার ভাব জাগিয়া উঠে। সর্বোপরি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে (War of Liberation) জার্মানির জনগণ অংশ গ্রহণ করিবার ফলে সমগ্র জার্মানির মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মান জাতির ঐক্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির রাজ্যগুলিকে এক অসংবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘে পুনর্গঠিত করে এবং অস্ট্রিয়াকে এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান্যদান করে। 'ন্যায্য-অধিকার' (Legitimacy) নীতির প্রয়োগ দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করে। অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বাধীনে সমগ্র জার্মানির রাজ্যগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ডায়েট (Diet) বা সভা স্থাপিত হয়। এই ডায়েট-এর তুইটি কক্ষ ছিল—ক্ষুদ্রসভা ও সাধারণসভা। ক্ষুদ্রসভার মোট ১৭ জন সদস্যের মধ্যে এগারটি বৃহৎ রাজ্য হইতে এগার জন এবং বাকী ২৮টি রাজ্য হইতে মোট ৬ জন সদস্য গ্রহণ করা হইত। সাধারণ সভায় বৃহৎ রাজ্যগুলি চারিটি করিয়া ভোট, ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একটি করিয়া

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে জার্মানি তুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত

নেপোলিয়নের অধীনে ৩৯টি রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন

ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ন ও মুক্তিসংগ্রামের প্রভাব : জাতীয়তা ও দেশাত্ম বোধ

ন্যায্য অধিকার নীতির প্রয়োগ দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক জার্মানিকে পুনরায় অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন

ডায়েট-এর গঠনপদ্ধতি-

এবং অপরাপর রাজ্যগুলি দুই অথবা তিনটি করিয়া ভোটের অধিকারী ছিল। ক্ষুদ্রসভা ও সাধারণসভা লইয়া গঠিত ডায়েট কন্‌ফেডারেশন-অব-দি-রাইন নামক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনের যাবতীয় কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। ডায়েটের সদস্যগণের মধ্যে মতৈক্য যেহেতু একপ্রকার অসম্ভবই ছিল, সেইহেতু কোন প্রকারের পরিবর্তন ডায়েট হইতে আশা করা বৃথা ছিল। অস্ট্রিয়াকে এই ডায়েট-এর সভাপতিত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়ার সভাপতিত্ব

এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে সমগ্র জার্মানির উপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্যের সৃষ্টি হইল। এই প্রতিক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত উদারনৈতিক আন্দোলন দমন করা। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী জার্মান জাতির জনগণ যাহারা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল প্রাধান্যাধীনে থাকা আশ্চর্যজনক বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু ইহার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ, নেপোলিয়নের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে তাহাদের পক্ষে ঐ সময়ে কোন প্রকার সংগঠনকার্যে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ ও বিদ্বেষভাব থাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে কোন প্রকার সংস্কারের পরিকল্পনা কার্যকরী করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলোপ করিয়া জার্মানিকে প্রাশিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিল; অপর কয়েকটি অস্ট্রিয়ার অধীনে অধুনাবিলুপ্ত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিল, আবার অপর কয়েকটি এক ঐক্যবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্র স্থাপনে ইচ্ছুক ছিল। তৃতীয়তঃ, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান জাতিকে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিতে জার্মানির সাহিত্যিক ও মনীষিগণ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির চেষ্টা

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্য

জার্মান জাতির প্রতিক্রিয়াশীল শাসন মানিয়া চলার কারণ:

(১) জার্মানি জাতির শ্রান্তি

(২) জার্মান রাজ্যগুলির পরস্পর বিদ্বেষভাব

(৩) জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের (ক) লিপ্‌জিগ স্মৃতি অনুষ্ঠান

করিলে বলপূর্বক সেগুলিকে দমন করা হয়। বিশেষতঃ জেনা (Jena)'র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লিপ্‌জিগ-এর যুদ্ধজয়ের স্মারক অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়ার কুশপুত্তলিকা (effigy) পোড়াইয়াছিল। এই যুবকসুলভ মনোবৃত্তির প্রকাশকে মেটারনিক্‌ তথা সকল প্রতিক্রিয়াপন্থিগণ অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পর (১৮১৯) ফন্‌ কট্‌জেবু (Von Kotzebue) নামে একজন প্রতিক্রিয়াপন্থী নাট্যকারকে হত্যা করা হইলে মেটারনিক্‌, রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার এবং প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানিতে উদারনৈতিক আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাশিয়ার রাজা যে শাসনতান্ত্রিক সুযোগ জনসাধারণকে দিয়াছিলেন তাহা নাকচ করিলেন।

(খ) কট্‌জেবু হত্যা

কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি

জার্মানির প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজগণ কর্তৃক 'কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি' (Carlsbad Decrees) নামে কতকগুলি আইন পাস করিয়া উদারনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দমন ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা জার্মানির সর্বত্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইল। অতঃপর ডায়েট-এর অধিবেশনে 'কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি' একপ্রকার জোর করিয়াই পাস করা হইল। এই আইনসমষ্টির দ্বারা ছাত্রদের সঙ্ঘ, ব্যায়াম সমিতিগুলি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র—এই সন্দেহে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সংবাদপত্রগুলিকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের কার্যকলাপের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিবার জন্য 'কিউরেটর' (Curator) নামে এক শ্রেণীর গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হইল। এইভাবে জার্মানির সর্বত্র এক ভয়াবহ স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন স্থাপিত হইল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন

এমতাবস্থায় জার্মানির জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি হইল। উইমার (Weimar), বেভেরিয়া, উর্‌টেমবার্গ, ব্যাডেন প্রভৃতি স্থানে সামান্য পরিমাণ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরোধিতায় জার্মানিতে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী রহিল না। জার্মানির রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাশিয়াই ছিল প্রধান। স্বভাবতই প্রাশিয়ার বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া কোন রাজ্যই শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসাধনে সক্ষম হইল না।

উইমার, বেভেরিয়া, উর্‌টেমবার্গ, ব্যাডেন প্রভৃতি রাজ্যে গণতান্ত্রিক অগ্রগতি

প্রাশিয়ার বিরোধিতায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাহত

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির স্যাক্সনি, হেসি, হ্যানোভার প্রভৃতি রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের সহায়তায় এই সকল স্থানে পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসন স্থাপিত হয়। পরবর্তী আঠার বৎসর জার্মানির কোন স্থানেই উদারনীতির সাফল্য না ঘটিলেও পরোক্ষভাবে জার্মানির জাতীয় ঐক্যের পথ প্রস্তুত হইতেছিল। দুইটি বিভিন্নমুখী ধারা জার্মান জাতিকে ঐক্যের পথে লইয়া যাইতেছিল; একটি হইল প্রাশিয়ার জোল্‌ভারেন্ (Zollverein) নামক শুল্ক-সঙ্ঘ, অপরটি প্যান-জার্মানিজম্ (Pan-Germanism) বা জার্মান জাতির লোকমাত্রেরই একতাবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা।

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব: মেটারনিকের সহায়তায় স্বৈরতন্ত্রের পুনঃ স্থাপন

পরোক্ষভাবে জার্মানির জাতীয় ঐক্যের পথ সৃষ্টি

(১) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অপরাপর কয়েকটি ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যের মধ্যে এক শুল্ক (customs)-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা ছিল অসংহত। শুল্ক স্থাপন করিয়া ভিন্ন রাজ্য হইতে দ্রব্যাদি আমদানির পথ রুদ্ধ করা হইলেও ঐরূপ অসংহত ও অবিন্যস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে মাল আমদানি করা চলিতেছিল। এই কারণে প্রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার্থ এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে প্রাশিয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে "জোল্‌ভারেন্" (Zollverein) নামে এক শুল্ক-সঙ্ঘ (customs-union) স্থাপন করে। এই সঙ্ঘের সদস্য-রাজগুলির মধ্যে অবাধ-বাণিজ্য নীতির অনুসরণ করা হয়। ক্রমে ক্রমে এই সঙ্ঘে জার্মানির অপরাপর রাজ্যগুলিও যোগদান করে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সকল রাজ্যই এই শুল্ক-সঙ্ঘের সদস্য হয়। এই সঙ্ঘের নেতৃত্ব ছিল প্রাশিয়ার উপর।

জোল্‌ভারেন্ (১৮১৯)

প্রাশিয়ার নেতৃত্ব

জোল্‌ভারেন্-এর গুরুত্ব* ছিল প্রধানতঃ তিন প্রকারের: প্রথমতঃ, এই শুল্ক-সঙ্ঘের মাধ্যমে জার্মানির কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ, আদান-প্রদান ও একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, জোল্‌ভারেন্ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির শিল্পোন্নতির সহায়ক হইয়াছিল।

জোল্‌ভারেন্-এর গুরুত্ব

* "Race, religion, language, whatever their binding power, would not alone suffice to keep a nation together, or to bind it together if disunited. It was the happy idea of the Zollverein (customs-union) that made the unity of Germany under Prussian leadership inevitable". Phillips. p. 6.

ইহার ফলে এই শুল্ক-সঙ্ঘের সভ্যদেশগুলির অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ইহার অর্থনৈতিক একতা রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। জার্মান রাষ্ট্রগুলি এই সঙ্ঘে যোগদানের ফলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই প্রাশিয়া জার্মানির রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। জার্মানির অপরাপর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও প্রাশিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উপজাত হইয়াছিল।

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে বিশ্বাস

অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব ভিন্নও জার্মানির আত্মরক্ষা করিবার শক্তি আছে এই আত্মপ্রত্যয় জোল্‌ভারেনের সাফল্যের মধ্য দিয়াই জন্মিতে লাগিল। বস্তুত জার্মান জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত হইয়াছিল এই জোল্‌ভারেন্ বা শুল্ক-সঙ্ঘের স্থাপনে।

জার্মানির নব-জাগৃতি

(২) জার্মানির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিবর্তন যখন মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে ব্যাহত হইয়াছিল ঐ সময়ে জার্মান জাতির মধ্যে এক মানসিক পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবোত্তর জার্মানিতে সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনের এক অতি চমৎকার বিকাশ দেখা যায়। ফিচ্টি (Fichte), হেগেল (Hegel), স্টাইন্ (Stein), হসার (Hausser), বোহ্‌মার, (Bohmer), ডাহ্‌লম্যান (Dahlmann), প্রভৃতি মনীষিগণ জার্মানিতে এক জাগৃতির সৃষ্টি করেন। বন্, বার্লিন, মিউনিক্, লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল এই নব-জাগৃতির কেন্দ্র-স্বরূপ। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি করেন। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার স্থলে জার্মান জাতির মধ্যে এক স্বাদেশিকতার ভাব জাগরিত হয়।

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব: বেভেরিয়া, ব্যাডেন প্রভৃতি স্থানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির সর্বত্র এক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তামূলক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বেভেরিয়া, ব্যাডেন, সেক্সনি, হ্যানোভার, শ্লেজ্‌ভিগ্-হল্‌স্টেন প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমন কি অস্ট্রিয়াও এই বিপ্লবের প্রভাব হইতে রক্ষা পায় নাই। হ্যানোভার, স্যাক্সনি প্রভৃতি স্থানের রাজগণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার-সাধনে বাধ্য হন। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামও একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন।

জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারিগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত এক প্রতিনিধিসভা আহ্বান করেন। এই প্রতিনিধিসভা ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট (Frankfort Parliament) নামে পরিচিত। এই পার্লামেণ্টে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধিগণও উপস্থিত হইলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের প্রধান কাজ হইল সমগ্র জার্মানির জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অবলম্বন করা।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট (১৮৪৮-৪৯)

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট জার্মান গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত এবং চরম প্রকাশ বলিয়া বিবেচ্য। জার্মানির রাজনৈতিক ইতিহাস নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার এক অপূর্ব সুযোগ এই পার্লামেণ্টের নিকট উন্মুক্ত ছিল। জার্মানির প্রধান শত্রু অস্ট্রিয়া তখন নিজেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দমনে ব্যস্ত, প্রাশিয়া ও অপরাপর জার্মান রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকগণ তখন ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহ এড়াইয়া চলিতে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় সমগ্র জার্মানির জন্য একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন জার্মানির রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যসাধন সহজ ছিল সন্দেহ নাই। এইরূপ করিতে পারিলে জার্মানির ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হইত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা জার্মানির ঐক্য সাধনের প্রয়োজন আর থাকিত না। প্রথমেই ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট একটি অস্থায়ী সরকার (Provisional Govt.) স্থাপন করে। সমগ্র জার্মানির জন্য একজন ভাইকার (Vicar) বা প্রতিনিধি ও একটি মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করা হয়। জার্মানির রাজগণ এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন। আর্কডিউক জন ভাইকার পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের আইনজীবী ও অধ্যাপক সদস্যগণ জার্মান জাতির মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), জার্মানির রাজ্যসীমা প্রভৃতির উপর দীর্ঘ বক্তৃতায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রুত কার্য সম্পাদনের উপরই যখন তাঁহাদের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল তখন তাঁহারা নিজ নিজ মতবাদ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। এমন সময়ে শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ও হলস্টেন্‌ নামে জার্মান অধ্যুষিত ডেনমার্কের দুইটি ডাচি (Duchy) জার্মানির সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিল। ডেনমার্ক ইহাতে বাধা দিলে প্রাশিয়া শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হলস্টেনের পক্ষ অবলম্বন করিল। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টে জার্মান জাতীয়তার চরম অভিব্যক্তি

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের সুযোগ

সদস্যদের দীর্ঘ বক্তৃতায় অযথা কালক্ষেপ

ফলে প্রাশিয়া ডেনমার্কের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিতে বাধ্য হইল। এই দুইটি স্থান ডেনমার্কের অধীনেই রহিয়া গেল। ম্যাল্‌মো-এর চুক্তি (Convention of Malmoe) দ্বারা ডেনমার্ক ও প্রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেন ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের নিকট জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আবেদন জানাইলে পার্লামেণ্ট ম্যাল্‌মো-এর চুক্তির প্রতিবাদ জানাইল। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে এই চুক্তি নাকচ করিতে বলিলেন কিন্তু তিনি ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বাধ্য হইয়াই ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট ম্যাল্‌মো-এর চুক্তি অনুমোদন করিলেন। ফলে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট শহরে এক দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে মারামারিও শুরু হইল। পার্লামেণ্টের দুইজন সদস্যও প্রাণ হারাইলেন। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মিলিত ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট ক্রমেই জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য হারাইল। প্রাশিয়' ও অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্যে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট শহরের বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইল।

ম্যাল্‌মো-এর চুক্তি

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট শহরে গণবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ

অস্ট্রিয়ার ও প্রাশিয়ার সহায়তায় বিদ্রোহ দমন: ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট শহরের বিদ্রোহ দমনকালে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই পার্লামেণ্টের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিল। তাহারা এই সুযোগ গ্রহণে পশ্চাদ্‌পদ হইল না। দ্রুতগতিতে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নিজ নিজ দেশের বিপ্লবাত্মক সর্বপ্রকার আন্দোলন বলপূর্বক দমন করিতে লাগিল.

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ: এদিকে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সহিত অস্ট্রিয়ার কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে এবং জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কিরূপ শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে—এই দুই সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত হইল। অস্ট্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির অংশ হিসাবে রাখা হইবে অথবা জার্মানি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে এই প্রশ্ন লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা চলিল। অবশেষে ইহা স্থির হইল যে, জার্মানির কোন অংশ-ই অ-জার্মান রাজ্যের অংশ হিসাবে থাকিতে পারিবে না। অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্যাদি:

অধীন জার্মান অংশগুলির উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য থাকিবে না। জার্মানির অনেক স্থান তখন অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ পরিবারের অধীন ছিল। অস্ট্রিয়া এইরূপ মীমাংসায় স্বভাবতই রাজী হইল না। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই আপত্তির প্রত্যুত্তর দিল। এইভাবে জার্মান-অস্ট্রিয়ার সমস্যার সমাধান করা হইল।

(১) অস্ট্রিয়াকে জার্মান কনফেডারেশন হইতে বিতাড়নের প্রস্তাব গৃহীত

সমগ্র জার্মানির যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বরূপ কি হওয়া উচিত সেই সমস্যার সমাধান করা হইল প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাটপদ দান করিয়া। জার্মানিতে প্রাশিয়ার রাজা তথা প্রাশিয়াকে প্রাধান্য দানের পশ্চাতে প্রধান যুক্তি ছিল প্রাশিয়ার নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে প্রাশিয়ার কৃতিত্ব ও ক্ষতি স্বীকার।

(২) প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে সমগ্র জার্মানির সম্রাট-পদ দানের প্রস্তাব

এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনে যে দীর্ঘ এক বৎসর ব্যয়িত হইল ঐ সময়ে অস্ট্রিয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব-প্রসূত বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়। রাশিয়া হাঙ্গেরীর বিপ্লব দমনে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দান করে। ইতালিতে অস্ট্রিয়ার অধিকৃত স্থানগুলিতেও বিদ্রোহ দমন করা হয়। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার সাফল্যে এবং ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া ক্রমেই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট যখন তাঁহাকে জার্মানির সম্রাটপদ দান করিল তখন তিনি অস্ট্রিয়া ও জার্মানির অপরাপর রাজগণের আপত্তির ভয়ে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। অস্ট্রিয়া ও জার্মান রাজগণের আপত্তির প্রশ্ন ভিন্ন স্বৈরাচারী পন্থায় বিশ্বাসী ফ্রেডারিক নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটপদ গ্রহণে নিজেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র অনুমোদন করিলেন না। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বেভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, হ্যানোভার, স্তাক্সনি, ও ওয়ার্টেমবার্গ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্গও এই শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধিগণকে

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের অযথা কালক্ষেপ : প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ইত্যবসরে বিপ্লব দমন

ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক জার্মানির সম্রাটপদ প্রত্যাখ্যান

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের বিফলতা

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট ত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ দিলে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া গেল। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের বিফলতার জন্য প্রধানতঃ চতুর্থ ফ্রেডারিকই দায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও জার্মান ঐক্য সম্পর্কে তখনও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি হ্যানোভার, স্যাক্সনি, বেভেরিয়া ও ওয়ার্টেমবার্গ এই কয়েকটি রাজ্যের সহযোগে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আরফার্ট (Erfurt) নামক স্থানে এক জার্মান পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়া এই পরিকল্পনার বিরোধিতা শুরু করে। অস্ট্রিয়ার বিরোধিতার ফলে জার্মানির বেভেরিয়া, স্যাক্সনি প্রভৃতি অপরাপর রাজ্য যে-গুলি ফ্রেডারিকের সহিত প্রথমে সহোযোগিতা করিতেছিল সেগুলি পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। অস্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস পাইল না।

আরফার্ট সম্মেলন (১৮৫০)

অস্ট্রিয়া কর্তৃক আরফার্ট সম্মেলনের বিরোধিতা: সম্মেলনের বিফলতা

ভিয়েনা সম্মেলনের অব্যবহিত পরে জার্মানিতে যে-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল সেই পুরাতন শাসন-ব্যবস্থাই অস্ট্রিয়া জার্মানির উপর পুনঃস্থাপন করিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ওলমুজ-এর চুক্তি (Convention of Olmutz) দ্বারা প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। জার্মান জাতীয়তাবাদের এইভাবে অপমৃত্যু ঘটিল।*

ওলমুজের চুক্তি: জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত

ওলমুজের চুক্তি প্রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। এই অপমানের জন্য দায়ী ছিল প্রাশিয়ার সামরিক দুর্বলতা। সুতরাং পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্মানির ঐক্য সাধনে অকৃতকার্য হইয়া প্রাশিয়া সামরিক সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য: সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা

* "Federal Diet had been restored under Hapsburg patronage; the policy of *Status Quo*, which was the embodiment of Austrian statesmanship had prevailed; Austria had triumphed, and behind was the armed and reactionary Russia". Ketelbey. p. 262

প্রথম উইলিয়াম (William I) ঃ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম উইলিয়াম রাজা হইলেন (১৮৬১)। তিনি ছিলেন যেমন সাহসী, বাস্তববাদী ও বীরত্বপূর্ণ, তেমনি সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দেশপ্রেমিক।

প্রথম উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ

উইলিয়াম উদার নীতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি নিজ রক্ষণশীলতা ত্যাগ করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। প্রাশিয়ার স্বার্থবৃদ্ধি কিভাবে হইতে পারে সেই সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।* তিনি কখনও অবাস্তব আদর্শ অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। লোক-চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। রাজকীয় কর্মচারীদের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেককেই তিনি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের স্বাধীনতা দিতেন। বিসমার্কের সহিত নানা বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে নিজ মত অনুসরণে বাধাদান করেন নাই। তাঁহার আমল হইতেই প্রাশিয়ার প্রকৃত পুনরুজ্জীবন শুরু হইয়াছিল।

প্রথম উইলিয়ামের চরিত্র

প্রথম উইলিয়াম সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি প্রাশিয়াকে জার্মানির নেতৃত্বে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেই জন্য প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তির সম্প্রসারণ। সুতরাং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সামরিকবৃত্তি বাধ্যতামূলক করা হইল। কিন্তু উদারপন্থীরা সামরিক শক্তির সাহায্যে জার্মানির ঐক্য সাধনের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা জাতীয়তাবাদী জনমত গঠন করিয়া জার্মানির বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। প্রাশিয়ার জাতীয় প্রতিনিধিসভায় (Chamber of Deputies) উদারপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় তাহারা রাজা প্রথম উইলিয়ামের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ সাহায্য দানে অস্বীকার করিল। উইলিয়াম জাতীয় প্রতিনিধিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনের আদেশ জারী করিলেন। এইবার উদারপন্থী সদস্যদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও অধিক হইল। প্রথম উইলিয়াম

প্রথম উইলিয়ামের সহিত প্রাশিয়ার জাতীয় প্রতিনিধি-সভার বিরোধ

উইলিয়ামের পদত্যাগের ইচ্ছা

* "He had a natural gift of perceiving what was attainable and an unembarrassed clearness of view, which was shown, above all, in his almost unerring judgement of men." *Vide* Ketelbey, p. 234.

অনন্যোপায় হইয়া পদত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন, এমন কি, পদত্যাগ পত্র স্বাক্ষরও করিলেন। কিন্তু শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি অটো ফন্ বিস্‌মার্ক নামক এক অসাধারণ ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বিস্‌মার্কের প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ঐক্যের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল।

বিস্‌মার্কের নিয়োগ

বিস্‌মার্ক ও জার্মান ঐক্য (Bismarck & German Unification): ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিস্‌মার্ক প্রাশিয়ার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রাশিয়ার ইতিহাসের তখন এক সঙ্কট মুহূর্ত। রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে বিস্‌মার্কের নিজস্ব ধারণা ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি দৃঢ়। তিনি প্রথমেই রাজা প্রথম উইলিয়ামকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, পার্লামেন্টের সহিত দ্বন্দ্বে তিনি সর্বদা তাঁহার পার্শ্বে থাকিবেন এবং পরাজয় যদি ঘটেই তবে তিনি তাহা রাজার সহিত একসঙ্গেই বরণ করিবেন। বিস্‌মার্কের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাজা উইলিয়ামের মনে সাহসের সঞ্চার করিল। নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া তিনি পুনরায় রাজকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

প্রাশিয়ার জাতীয় জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে বিস্‌মার্ক কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ (১৮৬২)

বিস্‌মার্কের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

বিসমার্কের রাজনৈতিক মতবাদ এবং নীতি প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব। প্রাশিয়ার যাহা কিছু উন্নতি, রাজতন্ত্রের মধ্য দিয়াই সাধিত হইয়াছে,* সুতরাং রাজার ক্ষমতা কোন ভাবে ক্ষুণ্ণ করা প্রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা-ই ছিল বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য। এই জন্য প্রয়োজন ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করা। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণের বহু পূর্বেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা-ই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার কোন স্থান নাই। প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্‌মার্ক্ তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে বদ্ধপরিকর

বিস্‌মার্কের রাজনীতি

অস্ট্রিয়াকে জার্মানি হইতে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয়

* "Germany was made by an autocratic, not by a liberal government." Hazen. p. 213.

হইলেন। অস্ট্রিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব হইতে সরাইতে হইলে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। সুতরাং পূর্বাহ্নেই শক্তি সঞ্চয় করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আইনসভায় বক্তৃতা অথবা ভোটের দ্বারা—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে কোন সমস্যার-ই সমাধান সম্ভব নহে। একমাত্র সামরিক শক্তি ও দৃঢ়তার দ্বারাই ইহা সম্ভব।

সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস

প্রাশিয়ার প্রতিনিধি সভার বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাশিয়ার ডায়েট বা প্রতিনিধি সভার নিম্নকক্ষ প্রতি বৎসর সরকারী বাজেট অগ্রাহ্য করিয়া চলিল। ঊর্ধ্বকক্ষ অবশ্য বাজেট পাস করিয়া চলিল। ঊর্ধ্বকক্ষের বাজেট পাসকেই আইনতঃ গ্রাহ্য মনে করিয়া বিস্‌মার্ক কর আদায় করিয়া চলিলেন। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্র এইভাবে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইল। অবৈধ উপায়ে আদায়ীকৃত অর্থের দ্বারা প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হইল। সামরিক গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। সামরিক সংগঠন সম্পূর্ণ হইলে বিস্‌মার্ক তাঁহার "Blood and iron" নীতি প্রয়োগে অগ্রসর হইলেন সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি ডেনমার্ক (১৮৬৪), অস্ট্রিয়া (১৮৬৬) ও ফ্রান্সকে (১৮৭০) পরাজিত করিয়া জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন করিলেন।

ডায়েট-এর সহিত বিরোধ : ডায়েটের মতামত উপেক্ষিত

বিস্‌মার্কের 'Blood and iron' নীতির প্রয়োগ

শ্লেজ্‌ভিগ্-হল্‌স্টেন্ সমস্যা (Schleswig-Holstein Question)

জার্মানির ঐক্য সাধনে বিস্‌মার্কের সর্বপ্রথম সুযোগ আসিল শ্লেজ্‌ভিগ্-হল্‌স্টেন্ সমস্যার জটিলতার মাধ্যমে। শ্লেজ্‌ভিগ্ ও হল্‌স্টেন্ নামক দুইটি ডাচি (Duchy) আইনতঃ ডেনমার্কের অধীন ছিল, কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে এই দুইটি দেশ স্বাধীন-ই ছিল। হল্‌স্টেনের অধিবাসীমাত্রেই ছিল জার্মান। শ্লেজ্‌ভিগের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল জার্মান অপর এক-তৃতীয়াংশ ছিল ডেন্। ডেনমার্কের রাজা এই দুইস্থানের ডিউক ছিলেন। হল্‌স্টেন্ জার্মান কন্‌ফেডারেশনের অংশ ছিল এবং এই সূত্রে হল্‌স্টেনের ডিউক হিসাবে ডেনমার্কের রাজা ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে

ডেনমার্কের রাজার শ্লেজ্‌ভিগ্-হল্‌স্টেন্ দখলের চেষ্টা

হল্‌স্টেন্‌ ও শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ডেনমার্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তি দাবি করিল। প্রাশিয়া এই বিদ্রোহে হল্‌স্টেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চাপে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন প্রোটোকোল (London protocol) দ্বারা এই দুইটি ডাচির উপর ডেনমার্কের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। অবশ্য এই দুইস্থানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক পার্লামেণ্টের জাতীয়তাবাদী দল পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ব্যস্ততার সুযোগ লইয়া শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনের উপর এক নূতন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিল। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ফলে এই দুই স্থানের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল এবং শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেন ডেনমার্কের রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

ডেনমার্ক কর্তৃক শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনে নূতন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন

বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়ার সহিত যুগ্মভাবে ডেনমার্কের রাজা নবম খ্রীষ্টানকে (Christian IX) লণ্ডন প্রোটোকোলের (১৮৫২) শর্ত মানিয়া চলিতে এবং এই দুইটি ডাচিকে ডেনমার্কের রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ আলাদা রাখিতে জানাইলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতির ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার সহিত মিত্রতার জন্য তখন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিল। স্বভাবতই অস্ট্রিয়া বিস্‌মার্কের সহিত সামরিক চুক্তির প্রস্তাবে রাজী হইল। বিস্‌মার্ক মনে মনে জানিতেন যে, ডেনমার্ক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবে। ডেনমার্ক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেই তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল, কারণ এই সূত্রে তিনি ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, উপরন্তু অস্ট্রিয়ার সহিতও ভবিষ্যতে যুদ্ধসৃষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন।

বিস্‌মার্ক কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সহায়তা লাভ

ডেনমার্ক শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৬৪, ফেব্রুয়ারী)।

বিস্‌মার্কের সুযোগ

ঐ বৎসরই ডেনমার্ক ভিয়েনার চুক্তি দ্বারা (১৮৬৪, অক্টোবর) শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনের উপর অধিকার ত্যাগ করিল। বিস্‌মার্কের পক্ষে এত সহজে শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেন সমস্যা সমাধানে সমর্থ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, ঐ সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না এবং রাশিয়া পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ (১৮৬৩) দমনে প্রাশিয়ার সাহায্য পাইয়াছিল

ডেনমার্কের পরাজয় : ভিয়েনা চুক্তি

বলিয়া প্রাশিয়ার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। এই সুযোগে বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়ার সাহায্য লইয়া ডেনমার্ক হইতে শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেন নামক ডাচি দুইটি কাড়িয়া লইলেন। প্রথমে এই দুই স্থানের উপর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম অধিকার স্থাপিত হইল। কিন্তু এই দুই স্থানের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ছিল এই দুইটি স্থান প্রাশিয়ার রাজ্যভুক্ত করা, অপর পক্ষে অস্ট্রিয়া এবং শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনের অধিবাসিগণ চাহিয়াছিল এই দুইটি স্থান লইয়া রাইন কন্‌ফেডারেশনের অধীনে একটি পৃথক রাজ্য গঠন করিতে। এই ব্যাপার লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় বাধিয়া উঠিয়াছিল। প্রাশিয়ার রাজার চেষ্টায় অবশেষে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গেষ্টিন্‌-এর চুক্তি (Convention of Gastein) দ্বারা প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এ বিষয়ের আপোষ-মীমাংসা হইল। এই দুই স্থানের উপর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয় দেশেরই অধিকার স্বীকৃত হইল, তবে এগুলির শাসনভার অস্ট্রিয়ার উপর দেওয়া হইল। ল্যয়েনবার্গ (Lauenburg) নামক স্থানটি অবশ্য প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইল।

প্রথমে শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনের উপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম প্রাধান্য স্থাপন

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা লইয়া প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে মতভেদ

গেষ্টিন্‌-এর চুক্তি (১৮৬৫)

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেনের উপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার অধিকার স্বীকৃত

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ, ১৮৬৬ (Austro-Prussian War, 1866) ঃ

বিস্‌মার্ক গেষ্টিনের চুক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি এই চুক্তিকে "কাগজ দিয়া ফাটল বন্ধ করা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গেষ্টিন্‌ ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী হইবে মনে করিয়া লইয়াই বিস্‌মার্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কূটনৈতিক চালের দ্বারা তিনি প্রাশিয়া ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বে ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতালিকে ভেনিশিয়া প্রাপ্তির লোভ দেখাইয়া তিনি নিজপক্ষে টানিলেন। এইভাবে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিস্‌মার্ক যুদ্ধ শুরু করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টেন প্রশ্নটি জার্মান কন্‌ফেডারেশনের (Diet) বা

গেষ্টিন্‌-এর চুক্তিতে বিস্‌মার্কের অসন্তুষ্টি

বিস্‌মার্ক কর্তৃক কূটকৌশলে অস্ট্রিয়াকে নির্বান্ধব করণ

প্রতিনিধি সভার নিকট উপস্থিত করিল। বিস্‌মার্ক এই আচরণকে গেষ্টিনের চুক্তির পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং অস্ট্রিয়া গেষ্টিনের চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে নাই এই অজুহাতে হল্‌স্টেন্‌-এ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অস্ট্রিয়া কন্‌ফেডারেশন-অব-দি-রাইনের প্রতিনিধি সভা বা ডায়েট-এ প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। প্রাশিয়ার সেনানায়ক মল্‌ট্‌কি (Moltke)-এর সমরকৌশলে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই অস্ট্রিয়া স্যাডোয়া বা কনিগ্র্যাৎস্‌ (Sadowa or Koniggratz) নামক যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধকে এজন্য 'সাত সপ্তাহের যুদ্ধ' (Seven Weeks' War) বলা হয়। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অপরাপর ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্রগুলিও প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইল। স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইওরোপীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলির অন্যতম।

অস্ট্রিয়া কর্তৃক গেষ্টিন্‌-এর চুক্তি ভঙ্গের ফলে যুদ্ধ

স্যাডোয়া বা কনিগ্র্যাৎস্‌-এর যুদ্ধ (১৮৬৬)

স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর বিস্‌মার্ক তাঁহার দূরদর্শিতার চরম পরিচয় দান করেন। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের ইচ্ছা ছিল অস্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ দখল করা, কিন্তু বিস্‌মার্ক ইহাতে রাজী হন নাই। তাঁহার নীতি ছিল অস্ট্রিয়াকে বন্ধুভাবাপন্ন রাখা যাহাতে ভবিষ্যতে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সহায়তা লাভ করিতে পারে। ফলে প্র্যাগের (Prague) সন্ধি দ্বারা অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা (১) অস্ট্রিয়া ইতালিকে ভেনিশিয়া দান করিল। ভেনিশিয়া ভিন্ন অস্ট্রিয়ার অপর কোন রাজ্যাংশ হারাইতে হইল না। (২) অস্ট্রিয়া জার্মান কন্‌ফেডারেশন চিরতরে ত্যাগ করিল। জার্মান কন্‌ফেডারেশন সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। (৩) প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে উত্তর-জার্মান রাজ্যগুলি লইয়া উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপন অস্ট্রিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মেইন নদীর উত্তরের সকল জার্মান রাজ্য* প্রাশিয়ার অধীনে আসিল। জার্মান ঐক্য সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল। (৪) অস্ট্রিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল।

বিস্‌মার্কের দূরদর্শিতা

প্র্যাগের সন্ধি (১৮৬৬)

শর্তাদি

* "Duchies of Schleswig-Holstein, Kingdom of Hanover, Electorate of Hesse-Cassel, part of Darmstadt and the city of Frankfort". Lipson, p. 74.

স্যাডোয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব (Importance of the Battle of Sadowa) ঃ

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ইওরোপীয় ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, এমন কি, ইওরোপের ইতিহাসের গতিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। (১) এই যুদ্ধ মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য (Balance) সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া ক্ষুদ্র প্রাশিয়া রাজ্যকে এক অভুতপূর্ব সম্মান ও শক্তির অধিকারী করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সাফল্য সমগ্র ইওরোপে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং কূটনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক অতি উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়। (২) স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত হয়। বার্লিন মধ্য-ইওরোপীয় রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। (৩) এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া কাম্য ছিল না। ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্য-বদ্ধ জার্মানি ফরাসী স্বার্থের ও প্রাধান্যের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া প্রাশিয়াকে জার্মান ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফরাসী জাতি স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় বলিয়া মনে করে। শুধু তৃতীয় নেপোলিয়নের-ই নহে ফরাসী মর্যাদা ও প্রতিপত্তিও এই যুদ্ধের ফলে অনেকটা ক্ষুন্ন হইয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের এক ব্যাপক মনোবৃত্তি ফরাসী জাতির মধ্যে জাগিয়া উঠে। (৪) স্যাডোয়ার যুদ্ধে ইতালি প্রাশিয়ার পক্ষে ছিল। এই কারণে প্র্যাগের সন্ধি দ্বারা ইতালি অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে ভেনিশিয়া লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে ইতালীয় ঐক্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র রোম ও ট্রেন্টিনো (Trentino) তখনও ইতালীয় রাজ্যের বাহিরে ছিল। (৫) প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসেও এই যুদ্ধের

মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন : প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি

মধ্য-ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্র ভিয়েনা হইতে বার্লিনে স্থানান্তরিত

ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের নির্বুদ্ধিতা

ইতালি কর্তৃক ভেনিশিয়া লাভ

গুরুত্ব নেহাৎ কম ছিল না। এই যুদ্ধে জয়লাভ বিস্‌মার্কের নীতির সাফল্যের এক অতি চমৎকার নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়। বিস্‌মার্কের প্রতি জার্মানির সর্বত্র এক অতি গভীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। বিস্‌মার্কের ক্ষমতা প্রাশিয়া তথা জার্মান রাজ্যগুলির উপর অপ্রতিহত হইয়া উঠে। বিস্‌মার্ক জার্মান জাতির নিকট এক অতি উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। (৬) স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠে। প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ঐ সময় হইতে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। দুর্বল অস্ট্রিয়া-সরকার এই নূতন ভাবধারাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে স্যাডোয়ার যুদ্ধ তথা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ইওরোপীয় ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

বিস্‌মার্কের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত

প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধ, ১৮৭০ (Franco-Prussian War):

প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের মধ্যে নিহিত ছিল। প্রাশিয়ার উত্তর-জার্মান কন্‌-ফেডারেশনের উপর প্রাধান্য এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি মধ্য-ইওরোপের শক্তিসাম্য বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এই কারণে ফরাসী জাতির মধ্যে এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফ্রান্সের পরাজয়ের সমান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।* ফলে, ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়াছিল তাহাই ছিল ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবেই। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের-ই পরাজয় ঘটিয়াছে এই ধারণা ফরাসী জাতির মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। জার্মানগণ ফরাসী জাতির পক্ষে এইরূপ মনে করা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা

স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফ্রান্সের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি

* "It was France who was defeated at Sadowa." *Thiers, Vide* Ketelbey, p. 271.

করে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানিরও যে অভিযোগ না ছিল এমন নহে। ফরাসী রাজগণ নিজ স্বার্থের খাতিরেই জার্মানিকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া জার্মানি ফরাসী জাতির প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ বিদ্বেষভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

বিস্‌মার্ক এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, জার্মান ঐক্যসাধনে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য।* কারণ, প্রাশিয়ার সহিত তথা উত্তর-জার্মান কন্‌ফেডারেশনের সহিত দক্ষিণ-জার্মানির অংশগুলির সংযুক্তি ফ্রান্স কখনও সহজে ঘটিতে দিবে না। সুতরাং বিস্‌মার্ক যুদ্ধের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া কেবলমাত্র যুদ্ধটি যাহাতে উপযুক্ত সময়ে শুরু হইতে পারে সেবিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে চাহিলেন যাহাতে ফ্রান্স নিজেই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইরূপ ঘটিলে ইওরোপীয় জনসাধারণের মনে প্রাশিয়া আত্মরক্ষা করিতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে এই ধারণার সৃষ্টি হইবে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-জার্মানির রাজ্যগুলি উত্তর-জার্মানির সহিত যুক্ত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। এই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় ঐক্যের স্পৃহা জাগাইবার উদ্দেশ্যেও প্রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল।

বিস্‌মার্ক কর্তৃক ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়া বিবেচিত

বিস্‌মার্ক কর্তৃক ফ্রান্সকে আক্রমণকারী দেশ হিসাবে প্রমাণ করিয়া ইওরোপীয় জনমতের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা; দক্ষিণ-জার্মানিতে জাতীয়তা-বোধ ও ঐক্যের স্পৃহা জাগাইবার প্রয়োজনীয়তা

ঐ সময়ে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন গ্র্যামোণ্টের ডিউক (Duke of Gramont)। ইনি প্রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা ভিন্ন রাজনীতিক হিসাবেও তাঁহার দূরদৃষ্টি বা বিচক্ষণতা যে খুব বেশী ছিল এমন নহে। ফলে বিস্‌মার্কের অভীষ্টসিদ্ধির অসুবিধা হইল না। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের ফলে স্পেনের রাণী ইসাবেলাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্পেনবাসী প্রাশিয়ার রাজবংশোদ্ভূত

ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব গ্র্যামোণ্টের প্রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাব

* "A war with France lay in the logic of history"--*Bismarck*, *Vide* **Ketelbey, p. 270.**

যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিল। লিওপোল্ড দক্ষিণ-জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের যুবরাজ ছিলেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। লিওপোল্ড হোহেঞ্জলার্ণ পরিবার ভিন্ন নেপোলিয়ন বেনোপার্টির পরিবারের সহিতও আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত ছিলেন। স্বভাবতঃ প্রাশিয়া ও ফ্রান্স তাঁহার সিংহাসনলাভে কোনপ্রকার বিরোধিতা করিবে না বলিয়া স্পেনবাসীরা ভাবিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স ইহার বিরোধিতা করিল। প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল না এবং এই কারণেই স্পেনীয় সিংহাসনে হোহেঞ্জলার্ণ পরিবারের কেহ স্থাপিত হউক ইহা ফ্রান্স চাহিত না। এইরূপ পরিস্থিতিতে লিওপোল্ড নিজ দাবি প্রত্যাহার করেন। সাময়িকভাবে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। বিস্‌মার্ক কিন্তু এই পরিস্থিতি সহজ মনে গ্রহণ করিলেন না।

স্পেনের সিংহাসনে লিওপোল্ড হোহেঞ্জলার্ণের দাবি : ফ্রান্সের বিরোধিতা

স্পেনীয় সিংহাসনে লিওপোল্ডের দাবি প্রত্যাহার

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের দ্বারা জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ করা। সুতরাং তিনি স্পেন-সরকারকে পুনরায় লিওপোল্ডের সিংহাসন অধিকার সম্পর্কে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। স্পেনীয় সরকার পুনরায় লিওপোল্ডকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবার বিস্‌মার্কের কূটকৌশলে লিওপোল্ড স্পেনীয় সিংহাসন গ্রহণে রাজী হইলেন। ফ্রান্স এই ব্যবস্থা নাকচ করাইবার জন্য চেষ্টা শুরু করিল। স্পেনের সিংহাসনে হোহেঞ্জলার্ণ পরিবারের যুবরাজকে স্থাপন করিলে জার্মান শক্তি অপ্রতিহত হইয়া পড়িবে এবং ইওরোপীয় শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট হইবে; ইহা ভিন্ন ফরাসী নিরাপত্তার দিক দিয়াও এই ব্যবস্থা মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ফরাসী সরকার হোহেঞ্জলার্ণ উত্তরাধিকার প্রতিহত করিতে চাহিলেন। ফরাসী জাতির মধ্যে এই বিষয় লইয়া এক ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিউক-অব্-গ্র্যামোণ্ট্ হোহেঞ্জলার্ণ লিওপোল্ডের স্পেনীয় সিংহাসন-লাভে বাধা দানে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং এই সূত্রে প্রয়োজনবোধে

বিস্‌মার্কের চেষ্টায় লিওপোল্ডকে পুনরায় সিংহাসন গ্রহণে আমন্ত্রণ

ফরাসী বিরোধিতা

ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব গ্র্যামোণ্ট্ লিওপোল্ডের স্পেনীয় সিংহাসন-লাভে বাধা দানে কৃতসংকল্প

লাগিয়াছিলেন। গ্র্যামোণ্ট্ বেনিদিতিকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নিকট হইতে ভবিষ্যতে কখনও স্পেনীয় সিংহাসনে হোহেঞ্জলার্ণ উত্তরাধিকার সমর্থন করিবেন না এরূপ এক গ্যারান্টিপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লন। এমন কি প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের নিকট ফ্রান্স হইতে এক অপমানসূচক গ্যারান্টিপত্রের খস্ড়াও প্রেরণ করা হইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই এমস্ নামক স্থানে বেনিদিতি পুনরায় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গ্যারান্টিপত্রের উল্লেখ করিলে ফ্রেডারিক উইলিয়াম দৃঢ়তার সহিত সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য বেনিদিতির প্রতি তিনি ভদ্রতার কোন ত্রুটি করেন নাই।

স্পেনীয় সিংহাসনে ভবিষ্যৎ হোহেঞ্জোলার্ণ দাবি-ত্যাগের গ্যারান্টি-পত্র গ্রহণের জন্য বেনিদিতিকে প্রেরণ

এমস্-এ দ্বিতীয় সাক্ষাৎ: ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান

ফ্রেডারিক বেনিদিতির সহিত এই সাক্ষাতের কথা তারযোগে বিস্মার্ককে ঐ দিনই জানাইয়া দেন। ঐ দিন রাত্রিতে বিস্মার্ক যখন মোল্ট্কি ও রুন্ (Moltke and Roon) নামক দুইজন প্রাশিয়ার সেনানায়কের সহিত ভোজসভায় বসিয়াছেন এমন সময় রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের টেলিগ্রাম তাঁহার নিকট পৌঁছিল। বিস্মার্ক মোল্ট্কি ও রুন-এর সহিত পরামর্শ-ক্রমে এমস্ হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রামের কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন। বিস্মার্ক ও প্রাশিয়ার সামরিক নেতাগণ যে-কোন উপায়ে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট ছিলেন। এমস্-এর টেলি-গ্রামের কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিলে ফ্রান্সের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিবে এবং অভিপ্রেত যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে এইরূপ আশা বিস্মার্কের ছিল।* পরের দিন এমস্ টেলিগ্রাম-এর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রাশিয়ার সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। মূল টেলিগ্রামের কতক কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবার ফলে উহার অর্থের অনেক তারতম্য হইল।† ইহার এইরূপ অর্থ হইল যে, বেনিদিতি

এমস্ টেলিগ্রাম

বিস্মার্কের সুযোগ: এমস্ টেলিগ্রামের কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ

* "If I do this it will have the effect of a red rag upon the Gallic bull."—Bismarck. *Vide Ketelbey, p. 275.*

† Ems telegram despatched by Abeken, king William's Secretary :

"His Majesty writes to me : 'Count Beneditti spoke to me on the Promenade in order to demand from me finally, in a very importunate manner, that I should authorise him to telegraph at once that I had

প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে হোহেঞ্জলার্ণ পরিবার কোনকালেই স্পেনীয় সিংহাসনের দাবিদার হইবে না—এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে গিয়া একপ্রকার অপমানিতই হইয়াছেন।

এই টেলিগ্রাম প্রকাশের অভিপ্রেত ফল দেখা দিল। ফ্রান্সের সর্বত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। জনসাধারণের যুদ্ধোন্মত্ততা ও গ্র্যামোণ্টের যুদ্ধ ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। ১৫ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জার্মানিতেও এই যুদ্ধ এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। দক্ষিণ-জার্মানির জার্মানগণও এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে সমর্থন করিল না। ফরাসী সরকার কর্তৃক প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে হোহেঞ্জলার্ণ উত্তরাধিকার সমর্থন না করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের চেষ্টাকে তাহারা অন্যায় আচরণ বলিয়া বিবেচনা করিল। এই সূত্রে দক্ষিণ-জার্মানির জার্মানদের মধ্যেও এক জাতীয়তাবোধের উদ্রেক হই[illegible] বিস্‌মার্ক দক্ষিণ-জার্মানির জাতীয়তাবোধ এবং ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—একই কূট-নৈতিক চালে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন।

ফ্রান্স কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (১৫ই জুলাই, ১৮৭০)

দক্ষিণ-জার্মানিতে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

বিসমার্কের সাফল্য

bound myself for all future time never again to give my consent if the Hohenzollerns should renew their candidature. *I refused at last somewhat sternly, as it is neither right nor possible to undertake engagements of this kind a tout jamais. Naturally I told him that I had as yet received no news, and as he was earlier informed about Paris and Madrid than myself he could clearly see that my Government once more had no hand in the matter'. His Majesty has since received a letter from the Prince.* His Majesty *having told Count Benedetti that he was awaiting news from the Prince,* has decided *with reference to the above demand, upon the representation of Count Eulenburg and myself* not to receive Count Benedetti again, *but only to* (and) let him be imformed through an aide-de-camp that his Majesty *had now received confirmation of the news which Benedetti had already received from Paris, and* had nothing further to say to the ambassador. *His Majesty leaves it to your Excellency whether Benedetti's fresh demand and its rejection should not at once be communicated both to our ambassadors and to the press.*"

Italics-এ লেখা কথাগুলি বিস্‌মার্ক বাদ দিয়াছিলেন। *Vide Ketelbey, pp. 275-6.*

একাধিক কারণে ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করা অনুচিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ফরাসী সৈন্য যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত-ভাবে প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধে রওয়ানা হইবার মুহূর্তে তাহাদের সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিস্‌মার্কের কূট-কৌশলে ফ্রান্স তখন ইওরোপ মহাদেশে একেবারে নির্বান্ধব হইয়া পড়িয়াছিল।

ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণার অযৌক্তিকতা

এমতাবস্থায় যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সহজেই ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইতে লাগিল : উইসেনবার্গ (Weissen burg), স্পিকেরেন্ (Spicheren), ওয়ার্থ (Worth), গ্র্যাভেলোৎ (Gravelotte)-এর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইল।

ফরাসী পরাজয় : উইসেনবার্গ, স্পিকেরেন্, ওয়ার্থ, গ্র্যাভেলোৎ-এর যুদ্ধ

প্রাশিয়ার সেনাপতি মোল্ট্‌কির সমরকৌশলের নিকট ফরাসী সেনাপতি ম্যাকমেহন্ (MacMahon) পুনঃপুনঃ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের (Sedan) যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল পরের দিন ফরাসী সৈন্য জার্মান সৈন্যের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বয়ং বন্দী হইলেন। এই সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছিবামাত্র এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হইল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া ফরাসী জাতি পুনরায় ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল (সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৭০)। এই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকার আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভার্সাই-র সন্ধি নামে এক প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। অবশেষে ঐ বৎসর মে মাসে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট-এর সন্ধি (Treaty of Frankfort) দ্বারা দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স লোরেন (Lorraine) নামক স্থানের একাংশ, আলসেস্, মেৎস দুর্গটি ও স্ট্রাস্‌বার্গ প্রাশিয়ার নিকট হস্তা-স্তরিত করিতে বাধ্য হইল, ইহা ভিন্ন পাঁচশত কোটি ফ্রাঙ্ক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইল। তিনবৎসরের মধ্যে এই

সেডানের যুদ্ধ (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)

তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্দী

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান : ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্টের সন্ধি

শর্তাদি

ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে স্থির হইল এবং ততদিন পর্যন্ত প্রাশিয়ার এক সামরিক বাহিনী ফরাসী খরচে ফরাসী দেশে অবস্থান করিবে, এই ব্যবস্থাও করা হইল। ফ্রান্স পোপের সাহায্যার্থে রোমে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইল। দক্ষিণ-জার্মানি উত্তর-জার্মান কন্‌ফেডারেশনের সহিত যুক্ত হইল।

সেডানের যুদ্ধের ফলাফল (Results of the Battle of Sedan) ঃ

ফলাফল : (১) দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন

(২) ইতালি কর্তৃক রোম লাভ ; ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ

(৩) জার্মান ঐক্য সম্পন্ন : দক্ষিণ-জার্মানির উত্তর-জার্মান ফেডারেশনে যোগদান

(৪) জার্মানি এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত

(৫) ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে রাশিয়ার পুনঃ-প্রবেশ

প্রথমতঃ, এই যুদ্ধের ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটিল। দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসান হইয়া প্রজাতন্ত্রের পুনঃ স্থাপন হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স রোম হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলে ইতালি রোম দখল করে। ফলে ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। তৃতীয়তঃ, এই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল জার্মানির ঐক্য। জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ করিতে বিস্‌মার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন, এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। দক্ষিণ-জার্মানির রাজ্যগুলি—বেভেরিয়া, উর্টেমবার্গ প্রভৃতি উত্তর-জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সহিত সংযুক্ত হইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী জার্মানির সেনানায়ক ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম জার্মানির সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। চতুর্থতঃ, ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ইওরোপের ইতিহাসে এক শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। পঞ্চমতঃ, এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এবং প্রাশিয়াব জয়লাভের সুযোগ লইয়া রাশিয়া পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিল এবং প্যারিসের সন্ধি নাকচ করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিল।

বিস্‌মার্ক ও তাঁহার রাজনীতি (Bismarck & His political principles) ঃ

বংশ-পরিচয়

ওটো ফন্ বিস্‌মার্ক (Otto Von Bismarck) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্র্যাণ্ডেন্‌-বার্গের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ঐতিহাসিক ধারাকে প্রভাবিত করিবার শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে তিনিই ছিলেন ঊনবিংশ

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।* তিনি অভিজাত বংশের মর্যাদা সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়সুলভ সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। বন্ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি প্রাশিয়ার সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কিন্তু চাকরি জীবনের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া পিতার জমিদারি দেখিতে লাগিলেন। আট বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি জমিদারির প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইলেন। এই কয় বৎসর জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ ও জমিদারির উন্নতিসাধন ভিন্ন তিনি স্থানীয় অর্থাৎ গ্রাম্য রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ এবং নানাপ্রকার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে বিস্মার্ক প্রজাতন্ত্রের সমর্থন করিতেন কিন্তু প্রজাতান্ত্রিকদের অবাস্তব ধারণা ও কর্মপন্থা তাঁহাকে প্রজাতন্ত্রের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি তিনি তখনও নিজ মাতার উদারনৈতিক প্রভাব একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ রাজতান্ত্রিক হইয়া পড়েন। ধর্মের দিক দিয়াও পূর্বে তিনি ছিলেন নাস্তিক, কিন্তু ক্রমেই তিনি গোঁড়া প্রোটেস্টান্ট-এ পরিণত হন।

অভিজাত সম্প্রদায়-সুলভ সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা

বন্ ও বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ

বৈচিত্র্যহীন চাকরি-জীবন পরিত্যাগ—জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ

প্রথম জীবনে বিস্মার্ক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী—পরে প্রজাতন্ত্রের বিরোধী—ক্রমে ঘোর রাজ-তান্ত্রিকে পরিণত

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি প্রতিনিধিসভা (Prussian Diet) আহ্বান করেন। বিস্মার্ক এই সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চারি বৎসর বিস্মার্কের রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ-কাল বলা যাইতে পারে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নিজেকে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক বলিয়া প্রমাণিত করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রভাব রোধ করা ছিল তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ

রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক বিস্মার্ক

* "...Was the greatest man the age produced, greatest in the political manifestations of his powers and in the influence which his achievements have exercised in the history of the world." Ketelbey, p. 234.

তিনি পছন্দ করিতেন না, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার ঘৃণা তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

বিস্মার্কের রাজনৈতিক মতবাদ (Political principles of Bismarck):

১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে বিস্মার্কের রাজনৈতিক মতবাদ ও ধারণা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ লাভ করে। (১) তিনি রাজা অপেক্ষাও অধিকতর রাজতান্ত্রিক ছিলেন। রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁহার অন্ধ আনুগত্য তাঁহাকে রাজতন্ত্রের এক অসাধারণ শক্তিশালী সমর্থকে পরিণত করিয়াছিল। রাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমেই জার্মানির নিরাপত্তা ও উন্নতি বিধান সম্ভব—ইহা ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার রক্ষণশীল মনোবৃত্তি রাজতন্ত্রের কোনপ্রকার ক্ষমতা হ্রাস সহ্য করিতে পারিত না। (২) গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীরা তাঁহার নিকট বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর সমতুল্য ছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত প্রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা জড়িত হউক ইহা তিনি চাহিতেন না। (৩) বিপ্লবের প্রতিও তিনি ছিলেন বিরুদ্ধভাবাপন্ন। বিপ্লব দমনে তিনি স্বৈরাচারী অস্ট্রিয়া সরকারের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিলেন। বিপ্লব ও বিপ্লবের প্রভাব হইতে প্রাশিয়াকে তিনি মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। (৪) বিস্মার্ক সামরিক শক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি আসুরিক শক্তিতে আস্থাবান্ ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, প্রাশিয়ার উন্নতি একমাত্র সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি দ্বারাই সম্ভব—গণতন্ত্রের মাধ্যমে নহে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, 'জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সামরিক শক্তি দ্বারাই সম্ভব, বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নহে।' তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সামরিক শক্তি এবং "Blood and iron" নীতির অনুসরণই প্রাশিয়ার উন্নতির একমাত্র পন্থা।

(১) রাজতন্ত্রের শক্তি-বৃদ্ধি—উন্নতির একমাত্র পন্থা

(২) গণতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা

(৩) বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন

(৪) সামরিক শক্তিতে বিশ্বাস 'Blood and iron' নীতি

এই সকল মতবাদের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই প্রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতি বিস্মার্কের প্রকাশ্য অশ্রদ্ধায়। ইহা ভিন্ন ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট

পার্লামেণ্ট সমগ্র জার্মানির রাজমুকুট প্রাশিয়ার রাজাকে অর্পণ করিতে চাহিলে বিস্‌মার্ক উহা প্রত্যাখ্যান করার পক্ষপাতী ছিলেন। চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম সমগ্র জার্মানির ক্ষমতাহীন সম্রাটপদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে বিস্‌মার্ক আনন্দিত হন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক উইলিয়াম কর্তৃক আহূত আরফার্ট (Erfurt) সম্মেলন বিফলতায় পর্যবসিত হইলে বিস্‌মার্কই সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানিকে একতা-বদ্ধ করা। বিস্‌মার্কের রক্ষণশীলতা এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাস এত অধিক ছিল যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া যখন প্রাশিয়াকে ওলমুজ (Olmutz)-এর সন্ধি দ্বারা ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক স্থাপিত কনফেডারেশন-অব-দি-রাইন-এর শাসনতন্ত্র গ্রহণে বাধ্য করে, তখন তিনি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করেন। কারণ, এই শাসনতন্ত্রে রাজশক্তির প্রাধান্য ছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।*

বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি

১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিস্‌মার্ক নিজ ক্ষমতার পরিচয় দান করেন এবং রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের সুনজরে আসেন। চতুর্থ ফ্রেডারিক বিস্‌মার্কের রাজতন্ত্র-প্রীতিতে সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার উগ্র রাজতান্ত্রিকতায় তিনি খুব বেশী আস্থাবান্ ছিলেন না। তিনি বিস্‌মার্ক সম্পর্কে নিজ মন্তব্য এক স্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মন্তব্যটি এইরূপ: "দেশে যখন সামরিক শাসনের প্রয়োজন হইবে কেবল মাত্র তখনই তাঁহাকে (বিস্‌মার্ককে) মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।" † সুতরাং দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় ফ্রেডারিক বিস্‌মার্ককে মন্ত্রিপদে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তিনি

১৮৪৭-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিস্‌মার্কের রাজতন্ত্র-প্রীতিতে চতুর্থ উইলিয়ামের সন্তুষ্টি

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক ফ্রাঙ্কফোর্ট ডায়েট-এর সদস্য নিযুক্ত

* Bismarck's political ideas centred in his ardent belief in the Prussian monarchy". Hazen. p. 217.

"Prussia ought to unite with Austria in order to crush common enemy, the Revolution".—*Bismarck*, vide Hazen. p. 218.

"I look for Prussian honour in Prussia's abstinence before all things from every shameful union with democracy". – *Bismarck*, Ibid, p. 218.

"Not by speeches and majority votes are the great questions of the day decided—that was the great blunder of 1848 and 1849—but by blood and iron"—*Bismarck*, Ibid, p. 220,

† "Only to be employed when the bayonet governs unrestricted." Marginal note left by Frederick William IV. Vide Lipson. p. 67.

তাঁহাকে জার্মান কন্‌ফেডারেশনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার (Federal Diet) সদস্য নিযুক্ত করিলেন।

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে বিস্‌মার্ক (Bismarck as a member of the Federal Diet of Frankfort or Frankfurt) ঃ

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে বিস্‌মার্ক দীর্ঘ আট বৎসর যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন পরবর্তী জীবনে তাহা বিস্‌মার্ককে এক অপ্রতিহত রাজনৈতিক ক্ষমতা দান করিয়াছিল। যুদ্ধামোদী এবং উৎকট রক্ষণশীল বিস্‌মার্ক এক দূরদর্শী রাজনীতিকে পরিণত হইয়াছিলেন। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার সদস্য হিসাবে তিনি জার্মানির বিভিন্ন অংশের সদস্যদের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তাঁহাদের রাজনৈতিক ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট সভার সদস্য থাকাকালীনই তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন প্যারিস, ভিয়েনা এবং লণ্ডনেও কার্যব্যপদেশে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। এইভাবে ১৮৫১ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ এগার বৎসর বিস্‌মার্ক জার্মান এবং ইওরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে এক ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইওরোপের খ্যাতনামা রাজনীতিকদের মধ্যে একমাত্র ক্যাভুর ভিন্ন সকলের সহিতই তিনি ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। রাজনীতি-সংক্রান্ত কপটতা ও কূটকৌশল, মিথ্যাচার ও স্বার্থপরতা সম্পর্কে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট সভার সদস্য হিসাবেই তিনি জার্মানির ঐক্যের সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। জার্মানিতে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া—উভয় দেশেরই স্থান হইবে না, অর্থাৎ প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যে-কোন একটি জার্মানির নেতৃত্বে স্থাপিত হইবে অপরটিকে সেই নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে হইবে—এই ধারণা তাঁহার জন্মে।

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্টে দীর্ঘ আট বৎসর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ

জার্মানির রাজনীতিকদের সহিত পরিচয়

রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গমন

ইওরোপীয় রাজনীতিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট সভার সদস্য হিসাবে জার্মানির ঐক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তিনি জার্মানির ঐক্যসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এজন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অস্ট্রিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব হইতে বিতাড়িত করিবার প্রয়োজন ছিল। প্রাশিয়ার ডায়েট বা প্রতিনিধি সভা তাঁহার সামরিক সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থদানে অস্বীকার করিলে ক্রমে শাসনতান্ত্রিক এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার পিতার স্বহস্তে লিখিত বিস্‌মার্ক সম্পর্কে মন্তব্যটি দেখিতে পান এবং শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁহাকে মন্ত্রিসভার সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন।

প্রথম উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ (১৮৬১)

প্রাশিয়ার ডায়েটের সহিত বিরোধ

বিস্‌মার্ককে মন্ত্রিসভার সভাপতিপদে নিয়োগ

মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে বিস্‌মার্ক (Bismarck as the President of the Prussian Ministry) :

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর বিস্‌মার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রিসভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি জার্মানির ভাগ্য-নিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সঙ্কট মুহূর্তে বিস্‌মার্ক রাষ্ট্রভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অপর কোন রাজনীতিক এইরূপ অচল এবং সমস্যাকীর্ণ অবস্থায় এতটা সাহস দেখাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি প্রথমেই রাজা উইলিয়ামকে এই আশ্বাস দিলেন যে, তিনি রাজতন্ত্রের রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন এবং পতন যদি ঘটে তবে রাজার সহিত তিনি একই সঙ্গে তাহা বরণ করিবেন।*

প্রাশিয়ার সঙ্কট মুহূর্তে বিস্‌মার্কের দায়িত্ব গ্রহণ

বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ও নীতি (Bismarck's aims & policy) :

মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসাবে বিস্‌মার্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) প্রাশিয়ার অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা। জার্মানির ঐক্য সাধন করিতে গিয়া প্রাশিয়ার প্রাধান্যের বিলুপ্তি তিনি চাহিতেন না। ইতালীয় ঐক্য পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে সাধিত হইয়াছিল। বিস্‌মার্ক কিন্তু প্রাশিয়ার ঐরূপ আত্মবিলুপ্তির মাধ্যমে জার্মানির ঐক্যসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার রাজার অধীনে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে

উদ্দেশ্য :
(১) প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানির ঐক্যসাধন

* "I will rather perish with the king than forsake your Majesty in the contest with Parliamentary government"—*Bismarck*, vide Hazen, p. 216.

বদ্ধপরিকর ছিলেন। (২) জার্মানিকে একতাবদ্ধ করিবার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ-ই ছিল জার্মানির উপর হইতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জার্মানিতে প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার স্থান নাই—এই দুইয়ের একটিকে নতি স্বীকার করিতে হইবেই।† সুতরাং জার্মানির ঐক্য সাধনের অবশ্য গ্রহণীয় পদক্ষেপ হিসাবে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়নের প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আবার প্রয়োজন ছিল সামরিক শক্তির। বিসমার্ক ছিলেন সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত প্রভৃতি আসুরিক নীতির তিনি সমর্থক ছিলেন এবং গণতন্ত্রের তিনি ছিলেন অনমনীয় শত্রু। তিনি বলিতেন, "বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে—একমাত্র 'blood and iron' নীতি—অর্থাৎ সামরিক শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিস্‌মার্ক সামরিক শক্তি দ্বারাই প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতিবিধান করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

(২) জার্মানি হইতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের অবসান

'Blood and iron' নীতি

প্রতিনিধি সভা 'ডায়েট'-এর সহিত দ্বন্দ্ব (Conflict with the Diet) ঃ বিস্‌মার্কের "blood and iron" নীতি ডায়েটের উদারপন্থী সদস্য মাত্রেরই মনঃপূত হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রকার বাধা ও সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া বিস্‌মার্ক সামরিক সংগঠনের কার্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডায়েটের দুই কক্ষের উর্ধ্বকক্ষ ছিল রাজতান্ত্রিক। সরকারী বাজেট বা অর্থবিল (money bill) নিম্নকক্ষ প্রত্যাখ্যান করিত কিন্তু উর্ধ্বকক্ষ তাহা অনুমোদন করিত। বিস্‌মার্ক উর্ধ্বকক্ষের অনুমোদনের উপর নির্ভর করিয়াই প্রয়োজনীয় কর আদায় করিতে লাগিলেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্র তখনও চালু থাকিলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে উহার কোন মূল্য ছিল না। ইহা ভিন্ন প্রাশিয়ার প্রতিনিধি সভা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে গঠিত ছিল। স্বভাবতই বিস্‌মার্ক যখন এই সভার মতামত উপেক্ষা

প্রাশিয়ার ডায়েট বা প্রতিনিধি সভার সহিত বিরোধ

অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ : শাসনতন্ত্র মূল্যহীন

---

† "As early as 1853 he (Bismarck) said in a report to Berlin that there was not room in Germany for two powers, that one or the other must bend". Hazen, p. 219.

করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলিতে লাগিলেন তখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায় হইতে কোনপ্রকার প্রতিবাদ হইল না। উপরন্তু বিস্‌মার্ক অল্পকালের মধ্যেই এমন এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন যে, প্রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমেই অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

বিস্‌মার্কের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি

বিস্‌মার্ক অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাশিয়ার সামরিক সংগঠন সম্পূর্ণ করিলেন। প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রকে তিনি এক দুর্ধর্ষ এবং অপ্রতিহত সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের এই ক্ষমতা অটুট রহিয়াছিল।

প্রাশিয়ার রাজতন্ত্র সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

পোলগণের বিদ্রোহ, ১৮৬৩ (Polish rebellion): বিস্‌মার্ক প্রাশিয়ার শাসনকার্যের দায়িত্ব লাভের পর প্রথম আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পোলগণের বিদ্রোহে। রাশিয়ার অধীন পোলগণ রুশ আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় ঐ বৎসর এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করে। ইওরোপের অধিকাংশ দেশই তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু বিস্‌মার্ক পোলদের বিদ্রোহ দমনে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য দান করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। বিস্‌মার্কের এইরূপ আচরণের পশ্চাতে তিনটি বিশেষ কারণ ছিল: প্রথমতঃ, তিনি বিপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পোল্যাণ্ড স্বাধীন হইলে প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত পোল্যাণ্ডের রাজ্যাংশ ডান্‌জিগ এবং থর্ন দাবী করিবে। তৃতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া রাশিয়াকে মিত্রশক্তি হিসাবে লাভ করা প্রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। প্রাশিয়ার সাহায্যে রাশিয়া দৃঢ় হস্তে পোলগণের বিদ্রোহ দমন করিল।

পোল বিদ্রোহ (১৮৬৩

বিস্‌মার্ক কর্তৃক রাশিয়াকে সাহায্য দান: রাশিয়ার মিত্রতা লাভ

রাশিয়াকে সাহায্য দানের পশ্চাতে যুক্তি

বিস্‌মার্ক ও অস্ট্রিয়া (Bismarck & Austria): ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ঐ বৎসর অস্ট্রিয়ার সম্রাট জার্মান

কন্‌ফেডারেশনের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধনের জন্য ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট নামক স্থানে জার্মানির রাজগণের এক সভা আহ্বান করেন। জার্মান কন্‌ফেডারেশনের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া অস্ট্রিয়া জার্মানির উপর নিজ প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিস্‌মার্ক রাজা প্রথম উইলিয়ামকে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ব্যক্তিগত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব কায়েম করিবার চেষ্টা বিস্‌মার্ক কর্তৃক ব্যাহত

অস্ট্রিয়া কর্তৃক জার্মান কন্‌ফেডারেশনের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের চেষ্টা ব্যাহত

ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ (Danish, Austro-Prussian & Franco-Prussian Wars):

১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে বিস্‌মার্ক তিনটি যুদ্ধে প্রাশিয়াকে জয়যুক্ত করিয়া জার্মানির ঐক্য সাধন করেন।

১৮৬৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ:

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সহিত স্যাডোয়ার যুদ্ধ এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত সেডানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিস্‌মার্ক সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন। (বিশদ আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে)।

ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ: জার্মানির ঐক্য সাধন

বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্র-নীতি, ১৮৭১-৯০ (Bismarck's foreign policy, 1871-90):

১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বিস্‌মার্ক জার্মানির চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নবগঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতি ও পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সামরিক শক্তি ও যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী বিস্‌মার্ক ইওরোপ মহাদেশে শান্তি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধাবসানে অস্ট্রিয়ার প্রিন্স মেটারনিক্ যেমন অস্ট্রিয়ার স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শান্তিকামী হইয়া উঠিয়াছিলেন

(ক) বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য: ইওরোপের শান্তি বজায় রাখা

সেইরূপ বিস্‌মার্কও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বৎসর স্যাডোয়া ও সেডানের যুদ্ধের দ্বারা মধ্য-ইওরোপে যে নূতন শক্তি-সাম্যের (New Balance of power) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া চলিলেন। এই নূতন শক্তি-সাম্যের মূল কথা ছিল ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানির প্রাধান্য বজায় রাখা। কিন্তু ইহা বজায় রাখিতে হইলে ফ্রান্সকে দুর্বল, নির্বান্ধব অবস্থায় রাখা এবং অপর দিকে জার্মানির মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্সের মর্যাদা ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া-ই জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বভাবতই ফ্রান্স এই পরাভবের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিবে এই বিবেচনা করিয়া বিস্‌মার্ক কূটনৈতিক চালে ফ্রান্সকে ইওরোপ মহাদেশে মিত্রহীন করিয়া রাখিতে চাহিলেন।

(খ) নূতন শক্তি-সাম্য (New Balance of power) বজায় রাখা

(গ) ফ্রান্সকে দুর্বল ও মিত্রহীন রাখা: জার্মানির মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করা

সমগ্র ইওরোপে যাহাতে শান্তি বজায় থাকে, এবং জার্মানি যুদ্ধনীতি ত্যাগ করিয়া শান্তিকামী হইয়াছে সেই কথা ইওরোপীয় দেশগুলি যাহাতে বুঝিতে পারে সেজন্য বিস্‌মার্ক জার্মানিকে একটি "পরিতৃপ্ত দেশ" (Satiated country) অর্থাৎ জার্মানির পক্ষে রাজ্য বৃদ্ধির আর প্রয়োজন নাই—বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মোল্‌ট্‌কি (Moltke)-র ন্যায় সমরপ্রিয় নেতা এবং যুদ্ধোন্মত্ত প্রাশিয়াবাসীকে শান্তিনীতিতে বিশ্বাসী করিয়া তোলা বিস্‌মার্কের পক্ষেও সহজ ছিল না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোল্‌ট্‌কি এবং অপরাপর যুদ্ধপ্রিয় নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ প্রায় বাধাইয়া বসিয়াছিলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষতঃ রাশিয়ার চেষ্টায় এই পরিস্থিতি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এই ঘটনা ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রে বিস্‌মার্ক চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্রগুলি কার্যকরী করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জার্মানি 'Satiated' দেশ বলিয়া ঘোষিত

মোল্‌ট্‌কি ও প্রাশিয়াবাসীর যুদ্ধপ্রীতি

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেডানের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীভাব তেমন ছিল না। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তখন পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন, ইতালি ও অস্ট্রিয়া একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন; একমাত্র রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে প্রকৃত মিত্রতা তখন পরিলক্ষিত হয়। বিস্‌মার্ক স্যাডোয়ার

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা

যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে অস্ট্রিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল এবং সেই হেতু অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল না। অপর দিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বল্‌কান অঞ্চলের প্রাধান্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। বিস্‌মার্ক ইওরোপীয় দেশগুলির এইরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিনে রাশিয়া, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার এক যুগ্ম বৈঠক আহ্বান করিলেন এবং কূটকৌশলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া—দুইটি পরস্পর-বিরোধী দেশকে জার্মানির সহিত এক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ করিলেন।

'Dreikaiserbund' বা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' (১৮৭৩)

এই চুক্তি 'ড্রেইকাইজারবাণ্ড' (Dreikaiserbund) বা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেসের বৈঠক পর্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু বার্লিনের কংগ্রেসে বিস্‌মার্কের নেতৃত্বে ইওরোপীয় শক্তিগুলি রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্যান স্টিফানোর সন্ধির (Treaty of San Stefano) দ্বারা যে-সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিল তাহা হইতে বঞ্চিত করে। ফলে রাশিয়া বিস্‌মার্কের উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তিন সম্রাটের চুক্তি ত্যাগ করে।*

বার্লিন কংগ্রেসের পর 'তিন সম্রাটের চুক্তি' ভঙ্গ (১৮৭৮)

বিস্‌মার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানির শক্তি দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার সহিত দ্বি-শক্তি চুক্তি (Dual Alliance) স্বাক্ষর করেন (১৮৭৯)। এই চুক্তির দ্বারা অস্ট্রিয়া ও জার্মানি রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে 'দ্বি-শক্তি' চুক্তি বা Dual Alliance (১৮৭৯)

ইহার পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক গোপনে ফ্রান্সকে টিউনিস্ (Tunis) নামক স্থানটি দখল করিতে উৎসাহিত করেন। ফলে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়। এই বিরোধিতার সুযোগ লইয়া বিস্‌মার্ক ইতালিকে দীর্ঘকালের শত্রু অস্ট্রিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' (Dual Alliance) -তে যোগদানে স্বীকৃত করান। ফলে 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' (Triple Alliance)-তে পরিণত হয়।

'দ্বি-শক্তি চুক্তি' Dual Alliance 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' বা Triple Alliance-এ পরিণত (১৮৮২):

* Vide Ketelbey, p. 377.

ষোড়শ অধ্যায়

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগ, ১৯১৯-১৯৩৯

(Between the Two World Wars)

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল উহা প্রকৃতপক্ষে শান্তির যুগ ছিল না। উহাকে যুদ্ধবিরতি বা যুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই যুগে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল, অপর দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানা প্রকার বিবর্তন সাধিত হইতেছিল। বর্তমান জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে হইলে ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

১৯১৯-১৯৩৯ খ্রী: যুদ্ধবিরতির যুগ, শান্তির যুগ নহে

যুদ্ধের বীভৎসতা ও যুদ্ধপ্রসূত দারিদ্র্য ও দুর্দশা মানুষকে সাময়িকভাবে যুদ্ধের উপর বীতশ্রদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পকাল পরেই যুদ্ধের বীভৎসতার ছবি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়া পুনরায় মানুষকে যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ যুদ্ধের পর শান্তি এবং শান্তির পর যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বীভৎসতা সাময়িকভাবে মানুষের মনে যে শান্তিস্পৃহা জাগাইয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা: সাময়িকভাবে মানুষের শান্তি-স্পৃহা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স (The League of Nations):

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিবার প্রথম চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of Europe) গঠনে। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতি, ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবহেতু এই প্রতিষ্ঠান তেমন কার্যকরী হয় নাই। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার নামে

কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ: আন্তর্জাতিক শান্তির প্রথম চেষ্টা

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রকাশ রুদ্ধ করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার অবশ্য একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা তাঁহার পবিত্র চুক্তিতে কার্যকরী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তব জগতের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলিয়াই পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) কোন প্রকৃত সাফল্য লাভ করে নাই। যাহা হউক, কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ গঠনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের স্বীকৃতি আমরা দেখিতে পাই।

ইহা ভিন্ন প্যারিস সম্মেলনে (১৮৫৬) ক্রিমিয়ান যুদ্ধপ্রসূত সমস্যার সমাধান ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেস রুশ-তুর্কী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া ৪০ বৎসরেরও অধিককাল ইওরোপ মহাদেশকে যুদ্ধ হইতে মুক্ত রাখিবার সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হেইগ কন্‌ফারেন্স (Hague Conference) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিল। উপরোক্ত চেষ্টাসত্ত্বেও যুদ্ধ সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, তথাপি স্থায়ী শান্তি স্থাপনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমেই অধিকভাবে উপলব্ধ হইতেছিল এই সকল চেষ্টার মধ্যে উহা প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপের অনুকরণে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স (League of Nations) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে। মানব ইতিহাসের সকল স্তরেই পশুশক্তির উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই পশুশক্তি জগতের সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া আরও জটিলতর কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিয়া থাকে। এই কারণে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স মানুষের যুদ্ধের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করিয়া মানুষকে প্রকৃত শান্তিকামী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এই শান্তির মনোবৃত্তি গঠনের জন্য তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দদফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর উপর লীগ-অব-ন্যাশন্‌স স্থাপনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স

ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদির মধ্যেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের শর্তাদি (covenant)* সন্নিবিষ্ট ছিল। এই কভেনাণ্ট-এর মূল সূত্র ছিল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধির শর্তাদি আন্তরিক এবং সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা।

মূল উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা

এই কভেনাণ্ট-এর দশম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য-দেশগুলির মধ্যে যদি কোন পরস্পর বিবাদ দেখা দেয় তাহা হইলে সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য তাহারা লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে এবং মধ্যস্থতার অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যে কোন-প্রকার সামরিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না। ষোড়শ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, কোন সদস্য-দেশ যদি লীগের কভেনাণ্ট উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ সৃষ্টি করে তাহা হইলে অপরাপর সদস্য-দেশগুলি সেই যুদ্ধ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিন্ন করিবে। প্রযোজনবোধে সদস্য-দেশগুলি লীগের কভেনাণ্ট রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সামরিক নৌ এবং বিমান বহরের সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত থাকিবে।

পরস্পর বিবাদে লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ

লীগের কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একটি সাধারণ সভা (Assembly), একটি কাউন্সিল (Council) ও একটি স্থায়ী দপ্তর (Secretariat) গঠন করা হইল। এই দপ্তরের কার্যাদি পরিচালনার জন্য একজন সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি

লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সংগঠন

---

* The High Contracting Parties,

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security,

By the acceptance of obligations not to resort to war, by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

By firm establishment of the understanding of international law as actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,

"Agree to this Covenant of the League of Nations." Preamble to the Covenant of the League of Nations, Langsam, p. 124.

আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ গঠন করা হইল। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্জারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থল হইল।

বিভিন্ন অংশের কার্যাদি

সাধারণ সভা লীগের কভেনান্টে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সদস্য-দেশ তিন জন প্রতিনিধি সেই সভায় প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু সদস্য-দেশের একটির বেশি ভোট দিবার অধিকার ছিল না। কাউন্সিলে পাঁচটি দেশের স্থায়ী সদস্য ছিল—গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান। এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি ভিন্ন অন্যান্য সদস্য-দেশ হইতে আরও চারজন সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। কাউন্সিল ছিল লীগ-অব-ন্যাশন্সের কার্যনির্বাহক সভার ন্যায়। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় ভারপ্রাপ্ত ছিল। এই বিচারালয়ে কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের বিচার হইত। আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-সংক্রান্ত সমস্যা-সমাধানে সহায়তা দান করা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লীগ-ত্যাগ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট লীগ-অব-ন্যাশন্স গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কিণ সরকার লীগ-অব-ন্যাশন্সে যোগদানের চুক্তি অনুমোদন না করায় আমেরিকা কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল।

লীগ-অব-ন্যাশন্সের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার কার্যাদি (Activities of the League of Nations for World peace):

লীগ-অব-ন্যাশন্সের পক্ষপাতিত্ব

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ব্যাপারে বা আন্তর্জাতিক সমস্যা-সমাধানে সর্বদাই যে ন্যায় ও সততার আদর্শ মানিয়া চলা হইয়াছিল এমন নহে। একাধিক ক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্যাশন্সের কার্য গৃহীত নীতি-বিরোধী হইয়াছিল। (১) মেক্সিকোর বিরুদ্ধে নিকারাগুয়া (Nicaragua)-র অভিযোগ, (২) চীনদেশের উপর ব্রিটেন যে অন্যায়মূলক চুক্তি বলপূর্বক চাপাইয়াছিল সেই প্রশ্নের মীমাংসা, (৩) ইঙ্গ-মিশরীয় বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্যাশন্সের সিদ্ধান্ত

পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ছিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌স আন্তর্জাতিক শান্তি যাহাতে নষ্ট হইতে পারে এইরূপ বহু বিবাদের মীমাংসা করিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(১) ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ একটি 'সীমা নির্ধারণ কমিশন' (Boundary Commission) নিযুক্ত করে। এই কমিশন যখন কার্যে রত ছিল ঐ সময়ে তুরস্কের অধীন কুর্দ নামে এক দুর্ধর্ষ জাতির লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তুর্কী সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিতে আরম্ভ করিলে কুর্দগণ ইরাক-তুরস্কের সীমান্তে পলাইয়া আসে এবং সেখান হইতে তুর্কী সৈন্যদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স একটি দ্বিতীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং এই সকলের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ইরাক ও তুরস্কের সীমা নির্ধারিত হয়। ব্রিটেন, তুরস্ক ও ইরাক এই নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত করে (১৯২৬)।

ইরাক ও তুরস্কের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

(২) গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সর্বদাই পরস্পর আক্রমণ ও সীমা লঙ্ঘন চলিতেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক সেনানায়ক ও তাঁহার একজন অনুচর এইরূপ এক ঘটনায় প্রাণ হারাইলে গ্রীস বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করে। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স এই বিষয়ে তদন্তের পর গ্রীসকে সৈন্য অপসারণে এবং বুলগেরিয়ার সীমা-লঙ্ঘনের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করে। গ্রীস অবশ্য এই সকল মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে ইতালি যখন গ্রীসের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল তখন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স এইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বলিয়া গ্রীস স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা

(৩) লিথুনিয়ার সরকার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' (State of War) ঘোষণা করিলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে নাই। এই দুই দেশে তথাপি মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের তৎপরতায় দূর হইয়াছিল।

লিথুনিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ সৃষ্টিতে বাধাদান

(৪) (ক) লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কর্তৃত্বাধীনে প্রধানতঃ জার্মান আক্রমণ হইতে

ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'জেনিভা প্রটোকোল' (Geneva Protocol or Protocol for the Pacific settlement of International Disputes) নামে একটি দলিল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই দলিলের মূল কথা ছিল, কোন সামরিক দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার চারদিনের মধ্যে লীগের কাউন্সিল কোন্ পক্ষ আক্রমণকারী তাহা স্থির করিবে এবং লীগের অপরাপর সদস্যগণ আক্রান্ত দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সামরিক সহায়তা দানে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ব্রিটেনের ডোমিনিয়নগুলি এই প্রটোকোল স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বভাবতই ইহা পরিত্যক্ত হয়। শান্তিরক্ষার চেষ্টা হিসাবে জেনিভা প্রটোকোল-এর ইঙ্গিতের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। (খ) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি (Locarno Pact) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি ও বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী সীমারেখা যাহা ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল উহার নিরাপত্তা স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইতালি এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন জার্মানির সহিত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে মধ্যস্থতার দ্বারা উহার নিষ্পত্তি করা হইবে এই শর্তও স্বীকৃত হইয়াছিল। লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করিবার পর জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশন্সের স্থায়ী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

জেনিভা প্রটোকোল

লোকার্ণো চুক্তি: জার্মানিকে লীগের সদস্যহিসাবে গ্রহণ

(৫) লীগ-অব-ন্যাশন্স সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের বিবাদ, জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের বিবাদ, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল বিবাদের মীমাংসায় সামরিক শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় নাই, একমাত্র সার্বিয়ার ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, Mandated স্থানসমূহ এবং ডান্‌জিগ, সার অঞ্চল, দার্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাস প্রণালী-সংক্রান্ত নানা বিষয়েও লীগ-অব-ন্যাশন্স গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন, আফিং, ক্রীতদাস ব্যবসায়, শ্রমিক সমস্যা প্রভৃতি নানাবিষয়ে এবং অস্ট্রিয়াকে অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার

লীগের অপরাপর কার্যাদি

করিবার ব্যাপারে লীগের দান নেহাৎ কম নহে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ২৬টি বিবাদের বিচার করিয়াছিল।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations):

উপরোক্ত কার্যকারিতা সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স প্রকৃত সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা ছিল। প্রথমতঃ, এই প্রতিষ্ঠানেব কার্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চলিতেছিল। স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন দেশেরই তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিযা তুলিবাব প্রয়োজন কেহ তেমন উপলব্ধি কবে নাই। দ্বিতীযতঃ, জাতীয স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনোবৃত্তি তখন কোন দেশেরই ছিল না। জাতীয স্বার্থের খাতিরে স্বভাবতই প্রত্যেক দেশ লীগের শর্তাদি ও লীগেব মূল নীতির অবমাননা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। তৃতীয়তঃ, কযেকটি সাধারণ বিষয় ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হওযার প্রয়োজন—এই নীতিব ফলে কোন একটি দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওযার সম্ভাবনা থাকিলেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হইযা উঠিত; চতুর্থতঃ, লীগ-অব-ন্যাশন্‌সেব নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার মত কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকায লীগেব পক্ষে শান্তিবক্ষা করা সম্ভব ছিল না। লীগের নিজস্ব কোনপ্রকার সামরিক শক্তি না থাকায় লীগেব সিদ্ধান্ত সুপারিশ হিসাবে মনে করা হইত এবং উহা গ্রহণ করা-না-করা দেশগুলির নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। ফলে, ইতালি কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইলে লীগ ইতালিকে নিরস্ত করিবার যে চেষ্টা করিযাছিল তাহা ইতালি সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে জাপানকে লীগ কোনভাবেই নিরস্ত করিতে সমর্থ হয নাই। পঞ্চমতঃ, লীগের সাফল্যের একমাত্র উপায় ছিল সদস্য-দেশগুলির আন্তরিক এবং নৈতিক সাহায্য ও সহায়তা। কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থ জড়িত থাকিলে কোন দেশই আন্তর্জাতিক

লীগের ব্যর্থতার কারণ: (১) পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান

(২) জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থের পরাজয়

(৩) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা

(৪) লীগের সামরিক শক্তির অভাব

(৫) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আন্তরিক সহায়তার অভাব

শান্তি বা লীগের নীতি মানিয়া চলিবার প্রশ্নের ধার ধারিত না। এই সকল কারণে ক্রমেই লীগ দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে লাগিল। ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৫), জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল (১৯৩৮) প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই লীগ কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল।

নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা : ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স ও বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স

(৬) সামরিক নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একটি মূল নীতি ছিল। এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ যুদ্ধজাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়, কিন্তু ইংলণ্ড ছোট যুদ্ধজাহাজের ও ফ্রান্স সাবমেরিণের সংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী হয় নাই। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের জন্য এক বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য অন্ততঃ ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অধিকার দাবি করে। অপরপক্ষে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য ফ্রান্স জার্মানি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। এই সূত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে জার্মানি এই অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহার অল্পকাল পরেই ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করিয়া দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। ফ্রান্স ও জার্মানির বিরোধের ফলে পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

নিরস্ত্রীকরণ নীতির ব্যর্থতা

যুদ্ধোত্তর ইতালি : ফ্যাসিজম-এর উত্থান (Post-War Italy : Rise of Fascism) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিকক্ষেত্রে শতধা বিচ্ছিন্ন ইতালি ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক একতালাভে সমর্থ হইলেও জাতীয় জীবনে কোনপ্রকার উল্লেখ-যোগ্য উন্নতিসাধন ইতালির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ

হইলেও বিভিন্ন অংশের স্থানীয় স্বার্থপরতা ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ইতালীয় জাতিকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধা দিল। জাতীয় মর্যাদা বা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কিছুই ইতালীয় জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। ইতালীয়গণ ছিল যেমন স্ব স্ব প্রধান তেমনি হুজুকপ্রিয়। অধ্যবসায় ও নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা তাহাদের ছিল না। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী করিবার পক্ষে যে সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির কিছুই তাহাদের ছিল না।

ঐক্যবদ্ধ ইতালির জাতীয়তাবোধ ও মর্যাদাবোধের অভাব

জাতির এইরূপ অক্ষমতার সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল মিলিত হইলে ইতালিতে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির যে স্বার্থনাশ হইয়াছিল এবং ইতালিকে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইযাছিল সেই তুলনায় প্যারিস শান্তি সম্মেলন হইতে ইতালি অতি সামান্য ক্ষতিপূরণই পাইয়াছিল। ফলে, ইতালীয়দের মনে প্যারিস শান্তি সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতালীয় জাতির মনোভাব যখন এইরূপ তখন যুদ্ধোত্তর সমস্যা-প্রসূত অভাব-অনটন, বেকারত্ব ও আর্থিক দুরবস্থা এক দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। জিনিসপত্রের মুল্যবৃদ্ধির ফলে মজুরী বাড়াইবার জন্য ধর্মঘট লাগিয়াই ছিল। এইরূপ পরিস্থিতি সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। ফলে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল যে, রাশিয়ার ন্যায় ইতালিও উগ্র সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা সকলেরই মনে জাগিতেছিল। 'লেনিন দীর্ঘজী[illegible]হউন' (Long live Lenin), 'রাজতন্ত্রের ধ্বংস হউক' (Down wi[illegible] the king) প্রভৃতি ধ্বনি ইতালির আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত [illegible]ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ইতালির দুর্দশা

সমা[illegible]ন্ত্রিক প্রচারের প্র[illegible]

[illegible]প্লবী পন্থায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগ্রহ [illegible]রিলক্ষিত হইতে লাগিল। কৃষকগণ জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ [illegible] বহুস্থানে বলপূর্বক জমিদারের জমি কৃষকরা দখল করিয়া লইল। শহ[illegible]ায় শিল্পপতিগণ মজুরী হ্রাস না করিলে এবং শ্রমিকরা অধিক সময়

কাজ না করিলে কারখানা চালু রাখা অসম্ভব বলিয়া জানাইলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কারখানা-পরিচালনার ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শ্রমিক ও কৃষকরা তাহাদের কর্মপন্থার ভুল বুঝিতে পারিল। জোরজবরদস্তি দ্বারা কারখানা বা জমি দখল করা গেলেও সেগুলি পরিচালনা করা তত সহজ নয়। অনভিজ্ঞ কৃষক ও শ্রমিকগণ ক্রমেই বুঝিতে পারিল যে, কৃষক-মজদুর সরকার স্থাপন ও পরিচালন তেমন সহজ হইবে না। প্রচলিত পার্লামেণ্টারী প্রথা যেমন দেশের নানাবিধ জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নাই, কৃষক-মজদুরদের পরিচালিত সরকারও শাসনকার্যে অনুরূপ অক্ষম হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া ইতালিবাসী পুনরায় একটি কার্যকরী সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শিক্ষিত সমাজ ও যুব সমাজ ইতালির আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সরকারের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নূতন কোন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হউক এই ইচ্ছা দেখা দিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) দলের উত্থান অতি সহজ হইল। জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার এবং শাসন-ব্যবস্থায় সংহতি আনিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বেনিটো মুসোলিনি।

কৃষক ও শ্রমিকদের বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন

কৃষক-মজদুরদের অকৃতকার্যতা

সরকারের প্রতি শিক্ষিত ও যুব সমাজের অশ্রদ্ধা

মুসোলিনির নেতৃত্ব

বেনিটো মুসোলিনি (Benito Mussolini) :

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমানা (Romagna) নামক স্থানে বেনিটো মুসোলিনির জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কর্মকার। তাঁহার মাতা ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী। মাতার ইচ্ছানুসারে বেনিটো মুসোলিনি শিক্ষা সমাপন করিয়া নর্মাল ট্রেনিং পাশ করেন এবং স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। মুসোলিনির উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া পূর্ণ হওয়ার কোন উপায় ছিল না, সুতরাং শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করিয়া সুইট্জারল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে জ্ঞানার্জনে তিনি রত থাকেন এবং বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কিছুকাল থাকিবার পর এক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ সুইট্জারল্যাণ্ডের সরকারের বিরক্তির উদ্রেক

বাল্যজীবন

হইয়া উঠিল। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সরকারী আদেশে মুসোলিনি সেই দেশ ত্যাগ করিয়া ইতালিতে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ

ইতালিতে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ পূর্ণ উদ্যমেই চালাইতে লাগিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ট্রিপোলি-টানিয়া দখলের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি প্রকাশ্য-ভাবে তাহার বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এজন্য তাঁহাকে অল্পকালের জন্য আটক রাখা হয়। পর বৎসর (১৯১২) মুসোলিনি Avanti নামে এক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও মুসোলিনি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে মুসোলিনি ইতালির পক্ষে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই উচিত বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতালীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। সমাজতান্ত্রিকগণ যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে ছিলেন না। সুতরাং মুসোলিনি যুদ্ধে যোগদানের যুক্তি সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে Avanti নামক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক পদ হইতে বিতাড়িত করা হয়। মুসোলিনি নিজে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য Il Popolo d' Italia নামে এক একটি পত্রিকার সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধে সৈনিক [illegible] গ্রহণ করেন। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সামরিক দায়িত্ব [illegible]হইলেন এবং সরকারের সহায়তায় পুনরায় Il Popolo d' It[illegible]কার সম্পাদনা করিয়া যুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হই[illegible] এই সময়েই তাঁহার বাগ্মিতা জনসাধারণের উপর এক গভীর প্রভ[illegible]ার করে।

[illegible] খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি সেনাবাহিনী হইতে যুদ্ধশেষে কর্মচ্যুত সৈনিকদের এবং [illegible]রাপর যাঁহারা দেশের মঙ্গলসাধনে আগ্রহান্বিত এইরূপ ব্যক্তিদের স[illegible]ন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন এক বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

[illegible] কার্যাদি

সমাজের প্রতি স্তর হইতেই সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ, শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রম, উত্তরাধিকার কর, মূলধনীদের উপর কর, চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, [illegible] বিলোপ, জাতীয়সভা আহ্বান, গোলাবারুদের কারখানা জাতীয়করণ রেলপথ প্রভৃতি কোন কোন শিল্প শ্রমিকদের পরিচালনাধীনে স্থাপন

প্রভৃতি দাবি করিয়া এক দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। এই দাবি বিশেষভাবে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈনিকদের জন্যই প্রচার করা হইতে লাগিল। মুসোলিনি যে সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহার নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন উহার অধিকাংশ সভ্যই Fasci'd azione নামে এক সংঘের সহিত জড়িত ছিল। এই নাম হইতেই ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ফ্যাসিস্ট্ দলের উৎপত্তি

মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ দল আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় শাসনব্যবস্থা তখন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় দেশে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ফ্যাসিস্ট্ দল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব নিজ হইতেই গ্রহণ করিল। যেখানেই কোনপ্রকার অরাজকতা বা গোলযোগ দেখা দিল সেখানেই ফ্যাসিস্ট্ দল বলপূর্বক তাহা দমন করিতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ বিপ্লব-বিরোধী ফ্যাসিস্ট্গণ সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্দিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল। এই আক্রমণাত্মক নীতি 'Squadrism' নামে পরিচিতি ছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট এক শতেরও অধিক খণ্ডযুদ্ধ এই সকল বিরোধী দলের মধ্যে ঘটিয়াছিল।।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ দলের সহিত ফ্যাসিস্ট্দের বিরোধ

যুদ্ধোত্তর ইতালির শাসনভার ছিল প্রথমে মন্ত্রী নিটি (Nitti ... র মন্ত্রী গিওলিটি (Giolitti)-এর অধীনে। কিন্তু ইঁহারা ... র অরাজকতা দমন করিতে সমর্থ হইলেন না ... ১৫ পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশের যুদ্ধোত্তর দু ... কান উপশম করিতে তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। ... স্থায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ দল দেশে শা ... রাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্দের বিরুদ্ধে সন্ত্রা ... দ শুরু করিলে সরকার অসহায়ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নিটি ও গিওলিটির মন্ত্রিত্ব

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট্ দল সামরিক কুচ্কাওয়াজ করিত এবং ক ... শাক (Black shirt) পরিত। সামরিক ভ ... ও সামরিক কুচ্কাওয়াজ তাহাদিগকে সমাজত ... কমিউনিস্ট্দের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া ছিল। স্বভাবতই এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ফ্যাসিস্ট্দলই জয়লাভ করিল। ঐ

ফ্যাসিস্ট্ দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি

ফ্যাসিস্ট্ দল ক্রমেই এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এদিকে ইতালীয় সরকারের দুর্বলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সরকার পক্ষ মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইলেন।

মুসোলিনির 'Coup d'etat'

মুসোলিনি এই সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। তিনি এইভাবে শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল ইতালীয় সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট্ বাহিনী সহ রোম দখল করিলেন। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল মুসোলিনিকে বাধা দান করিয়া দেশে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করিতে চাহিলেন না। তিনি মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন।

ফ্যাসিস্ট্ দলের ক্ষমতা লাভ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মুসোলিনি তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া ইতালির শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতেই মুসোলিনিই ইতালীয় রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন, তাঁহার উপাধি হইল Il Duce। রাজা স্বভাবতই ক্রমে নেপথ্যে সরিয়া গেলেন।

ফ্যাসিস্ট্ দলের শাসনক্ষমতা লাভের পশ্চাতে জনমতের সক্রিয় সহয়তা না থাকিলেও, জনমত উহার বিরোধী ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রচলিত শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতায় অতিষ্ঠ হইয়া [illegible] এবং ফ্যাসিস্ট্ দল জনস্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে [illegible]। সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফ্যাসিজমের [illegible]ী ছিল। সুতরাং মুসোলিনি যখন শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন ত[illegible]াতির সমর্থন যে তাহার পশ্চাতে ছিল একথা বলিলে অত্যুক্তি হই[illegible]।*

[illegible]লিনির ঘোষণা হইতেই ফ্যাসিস্ট্ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা [illegible]রা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন আভ্যন্তরীণ [illegible]শৃঙ্খলা স্থাপন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা

* "It is fairly evident that Fascism would not have succeeded if it had [illegible]njoyed the passive approval of a large, perhaps, preponderant [illegible]tion of pubiic opinion." Riker, p. 757.

বৃদ্ধি-ই হইবে ফ্যাসিস্ট্ শাসনের মূল উদ্দেশ্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তি রাষ্ট্র তথা সমষ্টির স্বার্থরক্ষার্থে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিবে। সমষ্টি ভিন্ন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থ স্বীকৃত হইবে না। অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত হইবে; শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিতে পারিবে না এবং এইজন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের পরিদর্শনাধীনে থাকিবে। শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতা বা Laissez faire নীতি স্বভাবতই রহিল না। ধর্মের দিক দিয়াও মুসোলিনি ঐক্য নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ফ্যাসিজম্ তথা মুসোলিনির উদ্দেশ্য ও নীতি: আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন—পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদা-অর্জন

ধর্মবিষয়ে ঐক্য নীতি

আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী: (১) শান্তি ও শৃঙ্খলার-ই তখন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ছিল। মুসোলিনি সৎ বা অসৎ উপায়ে পার্লামেন্টে সমাজতান্ত্রিক দলের বিরোধিতা দমন করিলেন। প্রয়োজন-বোধে গোপন হত্যা, পদচ্যুতি ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিয়া সরকারের বিরোধী দল বা ব্যক্তিমাত্রেরই দমন সম্ভব হইল। ১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট্ দল ভিন্ন অপরাপর সকল রাজনৈতিক দলের অস্ম- হইল।* এইভাবে দেশে সরকারের বিরোধী কোন শক্তি দেশের অরাজকতা দূর হইল। রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা মুসোলিনি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দিকে দিলেন। (২) ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী বাজে ও ব্যয় সমান করা সম্ভব হইল। ইহার পর হইতে বৎসর সরকারী আয় হইতে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা সরকারী ত সঞ্চিত হইতে লাগিল। (৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী শি শুরু হইল। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি ক্যাল বোর্ড স্থাপন করা হইল। এই বোর্ড নূতন নূতন কা

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন

সরকারী বাজেটে উদ্বৃত্ত

শিল্পোন্নয়ন

* "All parties must end, must fall. I want to see a panorama of ru about me—the ruins of other political forces—so that Fascism may st alone, gigantic and dominant.' —Mussolini Quoted by Langsam, p. 34

স্থাপন এবং পুরাতন কারখানাগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করিতে লাগিল। দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণদান, জনকল্যাণকর সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ, শ্রমিকদের মোট শ্রমের ঘণ্টা হ্রাস ইত্যাদি নানা উপায়ে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হইল। (৪) শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী স্থির করিয়া দেওয়া হইল। জিনিস-পত্রের দাম বাঁধিয়া দিয়া এবং গম, তুলা, তামাক প্রভৃতির চাষের উন্নতিসাধন করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রা যেমন পূর্বাপেক্ষা সহজ করা হইল, বিদেশ হইতে আমদানির প্রয়োজনও তেমনি হ্রাস করা সম্ভব হইল। (৫) বিদেশ হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন করিয়া, নূতন জমি আবাদ এবং খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে নানাপ্রকার উৎসাহ দান করিয়া দেশকে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইল। (৬) ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সরকারী সাহায্যে জাহাজ-কোম্পানি খোলা হইল। বলকান অঞ্চল, রাশিয়া ও অপরাপর দেশের সহিত সমুদ্রপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করিয়া সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের প্রসারসাধন করা হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজ প্রস্তুতের তিনটি কারখানাকে একত্রিত করিয়া এক বিশাল কারখানায় পরিণত করা হইল। ইতালীয় জাহাজ কারখানাগুলি নিজ দেশ, এমন কি রাশিয়া, তুরস্ক, গ্রাস ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিতে লাগিল। (৭) ইলেক্‌ট্রিক ও রেডিও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর ... রে শুল্ক স্থাপন করিয়া ইতালীয় মোটর শিল্পের উন্নতিসাধন করা হ... (৮) বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়া ইতালির অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান করা হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বপ্র... স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহা ভিন্ন সিল্ক, রেয়ন প্রভৃতি শি...ায় অপরাপর দেশ অপেক্ষা ইতালি অগ্রণী হইয়া উঠে। (৯) প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকে। রাষ্ট্রের সহায়তায় শিল্পোন্নয়নের ফলে ... শিল্পের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া পড়ে। ...) ইতালীয়দের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। ফ্যাসিস্ট

মজুর শ্রেণীর উন্নতি সাধন

খাদ্যদ্রব্যাদির উৎপাদনে উৎসাহ দান

জাহাজ-নির্মাণ

...াটাকাস্

...নাইন্সেন্...বী...ও
...স্বরীকৃ... স্ক...
...পা... কা...

...অধী...
জল... সিল্ক,
রেয়ন ...াদন

...বাণিজ্য-

সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করিয়া শিক্ষার প্রসার সাধন করেন। কিন্তু এই শিক্ষার মূলনীতি ছিল ফ্যাসিস্ট্ সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা। সুকুমার শিল্পেরও উৎসাহ ফ্যাসিস্ট্ সরকার দিয়াছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল তিনটি: "Believe, Obey, Fight"। (১১) ধর্মের ব্যাপারে মুসোলিনি দীর্ঘকালের রাষ্ট্র ও পোপের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া চার্চকে ফ্যাসিস্ট্ সরকারের সমর্থকে পরিণত করেন। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য বিধান করা ছিল মুসোলিনির নীতি।

শিক্ষার বিস্তার; শিক্ষার নীতি—'Believe, Obey, Fight'.

পোপের সহিত ধর্ম-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা

(১২) ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট্ সিণ্ডিক্যালিজম্ (Fascist Syndicalism) নামে অর্থনীতি-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন।* পূর্বেকার পার্লামেণ্ট-এর পরিবর্তে তিনি 'কর্পোরেশন' ও 'ফ্যাসিও' (Fascios)-এর প্রতিনিধিবর্গের এক চেম্বার বা সভা স্থাপন করেন। এই সভার মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৮২। ফ্যাসিও নামক ফ্যাসিস্ট্ দলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মোট এক-তৃতীয়াংশ এবং কর্পোরেশন নামক বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য লইয়া এই চেম্বার গঠন। ১

'ফ্যাসিস্ট্ সিণ্ডিক্যালিজম্' (১৯৩৯)

কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্যে মজুর ও মালিক উভয় শ্রেণীর অন্তর্- করা হইত। এইভাবে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত .. দ্বারা গঠিত চেম্বারের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করিয়া মুসোলি- মতবাদের প্রত্যুত্তর দিলেন। এই চেম্বারের বিভিন্ন কমিটি ছিল। র কমিটি সরকারকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিত। আইন-প্রণয়নে অবশ্য সরকারের হাতেই রাখা হইয়াছিল।

* "He (Mussolini) has established civil and political or industry on its feet, increased production and the general prosp the country, completed and projected vast land reclamation undertaken public works of many kinds, introduced social measures of great variety—at the price of an efficient and a repressive autocracy,. of a censorship of public opinion, and abolition of Parliamentary government and of economic freedo bargain." Ketelbey, p. 453.

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ফ্যাসিস্ট্ সরকারের জনকল্যাণকর কার্যাবলীর স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। শিল্প, কৃষি, জাতীয় উন্নয়ন প্রভৃতি দিক দিয়া ফ্যাসিস্ট্ সরকারের দান নেহাৎ কম ছিল না। জাতীয়তাবোধও এইরূপ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তথাপি ফ্যাসিস্ট্ শাসনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। স্বমত প্রকাশের অধিকার এই শাসনাধীনে কাহারোই ছিল না। সর্বদা সন্দেহ এবং গোয়েন্দার তদন্তের ভয়ে ভীত থাকিয়া জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছিল বলা বাহুল্য। সরকারী মতের বিরোধিতা কিংবা সরকারী মত ভিন্ন অপর যে-কোন মত প্রকাশ করা বিপজ্জনক ছিল।* শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করিবার নীতি ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তির সর্বনাশ সাধন করিতেছিল। জনকল্যাণকর হইলেও সর্বাত্মক স্বৈরাচার চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ঘৃণা অর্জন করিয়াছিল। মুসোলিনির আমলে বহু সহস্র ইতালিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল।

ফ্যাসিজমের গুণ

ফ্যাসিজমের অপগুণ

প্যারিসের সম্মেলনে ইতালি ট্রেন্‌টিনো বা টাইরল এবং উহার নিকটবর্তী [illegible] ভাষাভাষী প্রায় দুই লক্ষেরও অধিক অস্ট্রিয়ানকে ইতালির অধীনে [illegible]য়। তদানীন্তন ইতালীয় সরকার এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ [illegible] প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসোলিনি এই সংখ্যালঘু [illegible]স্পূর্ণভাবে ইতালীয় করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন।† এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ইতালীয় ভাষা জোর করিয়া চাপান হইল। উচ্চ কর্মচারিপদ মাত্রেই ইতালীয়দের দেওয়া হইল। নদীর নাম, স্থানের নাম ইত্যাদি সব কিছু [illegible] করিয়া ইতালীয় নামে অভিহিত করা হইল। এমন কি পারিবারিক [illegible]তালীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইল। এইভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের [illegible]ভাষার উপর আঘাত করিলে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তীব্র প্রতিবাদ [illegible]। মুসোলিনি অস্ট্রিয়া ও জার্মানিকে ইতালির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে

জার্[illegible] [illegible]টাকাস' নাইন্[illegible] [illegible]হরীকৃত [illegible] সংখ্যালঘু [illegible] উপর [illegible] অধী[illegible] জল[illegible] রেয়ন [illegible] সর্বপ্র[illegible]

[illegible] "Fascism tolerates no difference of opinion."—*Mussolini*. Vide, [illegible]r, p. 759.

[illegible] "We shall make them (the German-speaking Austrian) Italians" [illegible] *Mussolini*, Vide, Langsam, p. 352.

হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ট্রেন্‌টিনো বা টাইরলের জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়ানদের বিষয় লইয়া কোনপ্রকার আন্দোলন করিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। অপর দিকে হিট্‌লার জার্মানির কর্তৃত্ব লাভ করিলে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইল (১৯৩৯)। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, টাইরলের জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসিগণ ইচ্ছা করিলে জার্মানিতে চলিয়া যাইতে পারিবে।

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত চুক্তি

পররাষ্ট্র-নীতি: মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস্ট্ সরকারের পররাষ্ট্র-নীতির মূল কথাই ছিল আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। মুসোলিনি ইতালিকে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত করিতে চাহিলেন। ফ্যাসিস্ট্‌গণ ও তাহাদের নেতা মুসোলিনি যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসোলিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধনীতি জাতির শক্তির প্রাচুর্যের প্রমাণস্বরূপ। এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফল হিসাবেই জল, স্থল ও বিমানবাহিনী অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হইল। মুসোলিনি স্বয়ং এই তিন ... অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য: ইতালির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

স্থল, জল ও বিমান-বাহিনী বৃদ্ধি

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী ফ্যাসিস্ট্-নেতা মুসো... প্যারিস সম্মেলন কর্তৃক ইতালির প্রতি যে ... হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ... ইহা ভিন্ন তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া ইতালির প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। প্রয়োজনীয় ... বাহিনী গঠন করিয়াই মুসোলিনি তাঁহার নীতি কার্যকরী করিতে ... হইলেন।

প্যারিস সম্মেলন কর্তৃক অবিচারের প্রতিকার: সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মনে... দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধে ফ্রান্সের অসংখ্য লোকক্ষয় হইয়াছিল। এই ... বিদেশীদের ফ্রান্সে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ফরাসী সরকার উৎসাহ দি... এদিকে ইতালির আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং প্রধ... জীবিকা অর্জনের জন্য বহু সংখ্যক ইতালিবাসী ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করি...

লাগিল। ফরাসী সরকার এই সকল ইতালীয়কে ফরাসী নাগরিকত্ব দান করিয়া আরও ইতালীয়দের ফ্রান্সে চলিয়া আসিবার উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে ফ্রান্সের সহিত ইতালির মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ইহা ভিন্ন প্যারিস সম্মেলনে ইতালি যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পায় নাই সেইজন্যও ইতালি ফ্রান্সকেই দায়ী মনে করিত। ফরাসী-অধিকৃত স্যাভয়, নিস্, কর্সিকা ও টুনিশিয়া প্রভৃতি স্থানের উপর ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালির দাবি-ই অধিক এই কথাও ইতালীয়গণ মনে করিত। এই সকল কারণে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমেই প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। ইতালির সহিত ফ্রান্সের মিত্রদেশ যুগোস্লাভিয়ার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে ইতালি ও ফ্রান্স যুদ্ধে প্রায় অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিয়াছিল। উভয় সীমান্তেই সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুই দেশে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয় নাই।

ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে মনোমালিন্য

মুসোলিনি পূর্ব-ইওরোপে ইতালির ক্ষমতা দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ (Dodecanese Islands), ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাইউম্ (Fiume) ইতালির অধিকারে আসে। ইহা ভিন্ন মধ্য [illegible]পের বিভিন্ন দেশের সহিত ইতালি সামরিক, বাণিজ্যিক ও [illegible]ক্ত স্থাপনে সমর্থ হয়।

পূর্ব-ইওরোপে ইতালির শক্তি বৃদ্ধি

[illegible] ইতালি আফ্রিকায় অধিকার বিস্তারে মনোযোগী হয়। প্যারিস [illegible]লি উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পায় নাই স্মরণ করিয়া ইংলণ্ডের উদ্‌যোগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে টাঞ্জিয়ার নামক স্থানের শাসনভার (Mandate) ইতালিকে দেওয়া হইল। সাইরেনেইকা (Cyrenaica) ও মিশরের মধ্যে সীমা নির্ধারণ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে উহার সমস্যা [illegible]স্বপক্ষে মীমাংসিত হইল। এইভাবে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি বলপূর্বক রাজা হেইলি সেলাসির (Haile Selassie) রাজ্য আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইলেন। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স ইতালিকে নিরস্ত করিতে [illegible]হইল না। মুসোলিনি এক ঘোষণা দ্বারা ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, [illegible]ওপিয়া ও ইরিট্রিয়া ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইলেন।

[illegible] সমস্যা

[illegible]য়া দখল

ফ্রান্স ও ইতালির দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমে ইতালি ও ইংলণ্ডের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আবিসিনিয়া দখল করিবার পর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত ইতালির মনোমালিন্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলে মুসোলিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য জার্মানির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। জার্মানি ইতিপূর্বেই জাপানের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল। ইতালির সহিত জার্মানির চুক্তি সম্পাদিত হইলে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এই 'তিন দেশ' (Axis Powers) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একই পক্ষে থাকিয়া মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ইতালীয় সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য টুনিস্ দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। ফ্রান্সের দৃঢ়তায় অবশ্য তিনি টুনিস্ দখল করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ঐ বৎসর মুসোলিনি আল্‌বানিয়া দখল করিয়া ইতালির রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে আল্‌বানিয়ারও রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

জার্মান-জাপান ও ইতালির মিত্রতা

আল্‌বানিয়া দখল

রাশিয়া (Russia)

রুশ-বিপ্লব, ১৯১৭ (The Russian Revolution)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক অতি [illegible] ঘটনা সন্দেহ নাই। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জী[illegible] অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই [illegible] পৃথিবীর বিস্ময় ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে।

রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতে দুইটি মূল কারণ বিদ্যমান ছিল: (১) [illegible] শাসন-পরিচালনার অক্ষমতা, (২) রুশ জনস[illegible] চিন্তাধারার উপর পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রভাব। [illegible] মূল কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাপর প্রত্যক্ষ ও [illegible] কারণের আলোচনার মাধ্যমেই রুশ-বিপ্লবের [illegible] গতি অনুধাবন করা সহজ হইবে।

রুশ-বিপ্লবের মূলতঃ দুইটি কারণ: (১) জারতন্ত্রের অক্ষমতা, (২) জনসাধারণের মানসিক চেতনা

বলা বাহুল্য কোন বিপ্লবই কোন একটি বা একই প্রকার কারণে [illegible] হয় না। বিপ্লবের পশ্চাতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ, নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক নানাপ্রকার [illegible] থাকে। রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতেও অনুরূপ কারণ ছিল সন্দেহ নাই।

নানাবিধ কারণের ফলে বিপ্লব সংঘটিত

মূল কারণে এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে আমরা ফরাসী-বিপ্লবের কারণগুলির আভাস পাইয়া থাকি।

(১) রাজনৈতিক : জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা : দ্বিতীয় নিকোলাস

জারতন্ত্রের শাসনপরিচালনার অক্ষমতা জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (১৮৯৪-১৯১৭) সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসন যেমন ছিল স্বৈরাচারী তেমনি ছিল অকর্মণ্য। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল একেবারে অসহনীয়। রাশিয়ার প্রজা-হিতৈষী জারগণ দেশের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় নিকোলাসও ব্যক্তিগতভাবে দেশপ্রেমিক ও প্রজাবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বৈরাচারের প্রধান ত্রুটি-ই হইল এই যে, যখনই রাজা বা জারের কর্মকুশলতার অভাব দেখা দিবে তখনই উহার পতন ঘটিবে। ফরাসী বিপ্লব হইতেও এই শিক্ষা-ই পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রজাহিতৈষণা ও দেশপ্রেম তাঁহার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতাকে জয় করিতে পারিল না। তিনি ছিলেন ভীরু, কাপুরুষ, তদুপরি অব্যবস্থিতচিত্ত। তিনি ছিলেন তাঁহার রাণী আলেকজান্দ্রার সম্পূর্ণ করায়ত্তে। রাণী আলেকজান্দ্রা ছিলেন রাস্পুটিন (Rasputin) নামক এক সাইবেরিয়াবাসী [illegible] প্রভাবাধীন। রাস্পুটিনের প্রভাব শাসনকার্যে এবং শাসন-নীতিতেও প্রতিফলিত হইত। ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর ন্যায় দ্বিতীয় নিকোলাসও নিজ রাণীর সর্বনাশাত্মক প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। [illegible]জের ন্যায় তিনিও স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অত্যধিক [illegible]অধীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। নিকোলাস বাধ্য হইয়াই ডুমা (Duma) নামে এক পার্লামেণ্ট বা জাতীয় সভা স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় [illegible]লাসের পক্ষে স্বৈরাচারী শাসন চালু রাখার কোন অসুবিধা হইল না। পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষ ছিল 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি' (Social Democratic Party)। এই [illegible]লের একাংশের নাম ছিল 'বল্‌শেভিক্'। ক্রমে এই বল্‌শেভিক্‌গণই

[illegible] (ডুমা) গঠন

[illegible]ভিক্ দল

শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই দলের শক্তি ও সংগঠন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

(২) সামাজিক: মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভাব—কৃষক শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য

সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অব্যবস্থা ও অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ। কয়েকটি বৃহৎ শহর ভিন্ন অপর কোথাও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া কিছু ছিল না। প্রতি এক হাজার রুশের মধ্যে ১৭ জন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, ১২৫ জন ছিল ব্যবসায়ী ও শহরের বাসিন্দা এবং অবশিষ্ট আট শতেরও অধিক ছিল কৃষক। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার 'সার্ফ' প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'মির' নামক যে গ্রাম্য সমিতির উপর জমির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা এক অত্যাচারী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছিল। গ্রামের কৃষকদের ভূসম্পত্তি সমগ্র গ্রামবাসীর যুগ্ম সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং প্রয়োজন হইলেও কোন কৃষক নিজ জমি বিক্রয় করিতে পারিত না। এই অসুবিধা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর দূর করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কৃষকদের সুবিধা না হইয়া বরঞ্চ অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেক কৃষকই স্বাধীনভাবে জমি চাষ করিতে সক্ষম হইল না, কেহ কেহ [illegible] করিয়া দিল। এইভাবে কৃষকদের দুরবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইল।

(৩) অর্থ নৈতিক: কৃষক শ্রেণীর দুর্দশা

শ্রমিকদের দুরবস্থা

শ্রমজীবীদের অবস্থাও কৃষকদের অপেক্ষা মোটেই ভাল [illegible] শিল্পোন্নতির আনুষঙ্গিক ফ্যাক্টরী-প্রথার যাবতীয় অসুবিধা তাহাদি[illegible] করিতে হইত। অত্যাচারী ও প্রাচীনপন্থী স[illegible] অধীনে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কোন আশা [illegible] কোনপ্রকার ধর্মঘট করা বা ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ ছিল। বহু ট্রেড্ ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল [illegible] জীবিগণ এই অসহনীয় অবস্থায় নীরবে কাল[illegible] করিতেছিল। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও সাম্যবাদী [illegible] এইভাবে অত্যাচারিত ও দুর্দশাগ্রস্ত পঁচিশ লক্ষ [illegible] মজুরের উপর স্বভাবতই গভীর প্রভাব বিস্তার করি[illegible] লাগিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় রাশি[illegible] মজুর সম্প্রদায় ধর্মঘট ইত্যাদি করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা[illegible]

শ্রমিক সম্প্রদায়—সমাজতান্ত্রিক প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে রুশ শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ

পরিচয় দান করিয়াছিল। সরকারী অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া তাহারা মস্কো, সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ প্রভৃতি বড় বড় শহরে ধর্মঘট ও মারামারি করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে রুশ শ্রমিক-সমাজ অধিকতর সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও রুশগণ ইওরোপের অপরাপর দেশ হইতে পশ্চাদ্‌পদ ছিল। কৃষক ও মজুর শ্রেণী-গঠিত রুশ জনসাধারণ ছিল অশিক্ষিত।

(৪) শিক্ষা-বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক

সমগ্র ইওরোপের মধ্যে রাশিয়ায় অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ভড্‌কা (Vodka) নামক একপ্রকার মদ সকলেই পান করিত। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মাদক পানীয় প্রভৃতির ফলে রুশ জনসাধারণ—অর্থাৎ কৃষক ও মজুর শ্রেণী—অতিশয় নিম্ন-স্তরের জীবন যাপন করিত। সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য স্বভাবতই তাহাদের মনোগ্রাহী হইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠিত হইলে ক্রমেই ইহার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দলের একাংশ বল্‌শেভিক্ নামে পরিচিত ছিল। 'বল্‌শেভিক্' (Bolshevik) কথাটির মূল অর্থ হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপর পক্ষে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দল 'মেন্‌শেভিক্' (Menshevik) নামে পরিচিত ছিল। এইভাবে ...চেতনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল।

...টাকাস' ...নাইজেশন ...হরীকৃত ...গোর্কি, ...গেনিভ, ...অধীন ...প্যাভ্‌লভ্ ...ভস্কির ...বাকুনিন ও ...সের প্রভাব

...ক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক কারণ থাকিলেই বিপ্লব সৃষ্টি হইবে ...থা নাই। এই সকল অভাব-অভিযোগের উপর জনসাধারণের দৃষ্টি পতিত হওয়া চাই। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ফরাসী দার্শনিকগণ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন অনুরূপ মানসিক প্রস্তুতি বিপ্লব-মাত্রেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। রাশিয়ার জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি করিলেন রুশ সাহিত্যসেবী গোর্কি, টলস্টয়, ডস্‌টিয়েভ্‌স্কি, তুর্গেনিভ, আইভান প্যাভ্‌লভ্ প্রভৃতি। এই সকল সাহিত্যসেবীর রচনার প্রভাবে জনসাধারণের ...ক চেতনা বৃদ্ধি পাইল, ফলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি তাহাদের ... দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। বাকুনিন ও কার্ল মার্কসের গ্রন্থপাঠের ফলে ...য়ার জনসাধারণ, এমন কি অভিজাত ও মালিক শ্রেণীর মধ্যেও অত্যাচারী ...রতন্ত্রের অবসানের আগ্রহ দেখা দিল।

এইভাবে রুশ-বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। দেশের সর্বত্র জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ এবং এই বিদ্বেষ ক্রমে প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত হইল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোগাড্ শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে দাঙ্গা শুরু হইল। ক্রমে এই দাঙ্গা বিপ্লবে রূপলাভ করিল। শ্রমিকগণ কারখানার কাজ ত্যাগ করিয়া ধর্মঘট শুরু করিল। এই ব্যাপক দাঙ্গা ও ধর্মঘট দমনের জন্য সরকার সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী ধর্মঘটী শ্রমিক বা দাঙ্গাকারীদের দমন না করিয়া বিপ্লবাত্মক কার্যের সহায়তা করিতে লাগিল। এইভাবে জারতন্ত্রের অবসান যখন অবশ্যম্ভাবী তখন সৈনিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ 'সোভিয়েট' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই 'সোভিয়েট'-এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবকে সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত করিয়া দেশে কার্যকরী ও জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। এই সময়ে অকর্মণ্য জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ডুমা বা পার্লামেন্ট শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী করে। জারতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্ব শূন্য জারপদে কাহাকেও বসান হইল না, সুতরাং বাহ্যতঃ রা প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল।

(৬) প্রত্যক্ষ কারণ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ পরাজয়— জনসাধারণের দুর্দশা

জারতন্ত্রের পতন : অস্থায়ী সরকার গঠন

অস্থায়ী সরকারের সমস্যা (Problems of the Provi Government) :

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ফলে জনসাধারণের হাতে শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হয় নাই। ইহার দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল।

অস্থায়ী সরকার পার্লামেন্টের (ডুমা) সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বা প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা সোভিয়েট-এর হস্তে। অস্থায়ী সরকারের নেতা অধ্যাপক মিলিন্‌কভ্

নৈতিক সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক রাশিয়ার নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে যোগদানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। কিন্তু এই সকল উদারনৈতিক সংস্কারের ফলেও দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি ঘটিল না। ঐ সময়ের প্রধান প্রয়োজনই ছিল অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। অর্থনৈতিক কারণই ছিল রুশ-বিপ্লবের প্রধান কারণ, কিন্তু এবিষয়ে দ্রুত কোন উন্নতি সাধিত না হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। ইহা ভিন্ন অস্থায়ী সরকার অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে সোভিয়েট-এর সদস্যগণ ছিলেন প্রোলিট্যারিয়েট শ্রেণীভুক্ত। স্বভাবতই উদার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে রুশ-বিপ্লবের অগ্রগতি সম্ভব হইল না। সোভিয়েট ও অস্থায়ী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এই সরকারের পতন ঘটাইল। সরকার পক্ষ চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য দেশের ভূমি-সংক্রান্ত আইন-কানুন অনুকরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-বিধান করিতে। অথচ জনসাধারণের দাবি ছিল 'শান্তি, খাদ্য ও জমি'। যুদ্ধ এবং [illegible]ল দেশে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে দ্রুত উন্নতিসাধনের সুযোগ ছিল না। জনসাধারণেরও ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার অবস্থা ছিল না। ফলে, ব্যাপকভাবে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধর্মঘট, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধত্যাগ প্রভৃতি শুরু হইল। [illegible]শে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। এই সুযোগে পোল ও ফিন্‌গণ [illegible] রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিল।

অস্থায়ী সরকারের উদার নীতি; অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে বিলম্ব: জনসাধারণের অসন্তুষ্টি

[illegible]র্টাকাস' [illegible] নাইজেরিয়া [illegible] রুশ [illegible] কৃষি [illegible]

[illegible]ন সময়ে মেন্‌শেভিক্‌ দলের নেতা কেরেন্‌স্কি শাসনব্যবস্থা হস্তগত [illegible]। তিনি চাহিয়াছিলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন ও গণতান্ত্রিক সংস্কারসাধন করিতে। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মেন্‌শেভিক্‌দের বিরোধী পক্ষ বল্‌শেভিক দলের নেতা লেনিন, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা চাহিয়াছিলেন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া

[illegible] দলের নেতা [illegible] কর্তৃক [illegible]ব্যবস্থা হস্তগত

প্রোলিটারিয়েটদের শাসন স্থাপন করা। যাহা হউক কেরেন্‌স্কি সাময়িকভাবে সাফল্যের সহিতই আভ্যন্তরীণ শাসন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া চলিলেন। কিন্তু বল্‌শেভিক্‌দের প্রচারকার্যে প্রভাবিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দেশের অভ্যন্তরেও প্রোলিটারিয়েট শাসন স্থাপনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দিলে জার্মানবাহিনী সহজেই রুশ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রিগা (Riga) নামক স্থানটি দখল করিয়া লইল। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই কেরেন্‌স্কির জনপ্রিয়তা সমূলে বিনষ্ট হইল; বল্‌শেভিক্‌ দল এই সুযোগে দেশের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিল। এইভাবে রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন হইল (নভেম্বর ৬, ৭, ১৯১৭)।

কেরেন্‌স্কির শাসন-ব্যবস্থার পতন : বল্‌শেভিক্‌ শাসন স্থাপন

বল্‌শেভিক্‌ শাসন (Bolshevik Government) ঃ

বল্‌শেভিক্‌ সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই সম্মুখীন সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়কার প্রধান সমস্যাগুলি ছিল : (১) বিপ্লবকে স্থায়ী করা এবং বিপ্লবের পশ্চাতে জন-সাধারণের সমর্থন লাভ করা, (২) মার্কসবাদকে কার্যকরী করা, (৩) বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান করা।

বল্‌শেভিক্‌ সরকারের সমস্যা

নব-প্রতিষ্ঠিত বল্‌শেভিক্‌ সরকারের নেতা ছিলেন ট্রট্‌স্কি... তাঁহারা বিপ্লবের সুফলগুলি যাহাতে স্থায়ী হয় সেই চেষ্টা করি... জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন, ম... সমতা স্থাপন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য দূ... জন্য জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান মাত্রেরই রাষ্ট্রায়ত্ত... ন্যায্য-বণ্টন (Fair Distribution) ব্যবস্থা প্রচলন করিতে মনোযোগী হইলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কাহারও কিছু র... সমষ্টির কল্যাণের জন্য সম্পত্তি মাত্রেরই জাতীয়করণ করা হইল... শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতির কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দি... সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল। সরকারী ঋণ... করিয়া সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন... হইল। দেশে শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোন পার্থক্য র... না। প্রত্যেকের শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক করা হইল। স...

সম্পত্তি জাতীয়করণ

শ্রেণী ও শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপন

রুশ জাতি হইল শ্রমিকের জাতি এবং রুশ রাষ্ট্র হইল শ্রমিকের নিয়োগ-কর্তা। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা রাষ্ট্র-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া শোষণমুক্ত শ্রেণীভেদহীন এক সমাজের স্থাপনা করা হইল। সর্বসাধারণ্যে বল্‌শেভিক্ সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল।

বিদ্রোহ দমন : বহু ব্যক্তির প্রাণনাশ

কিন্তু সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহারা স্বভাবতই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ বলপূর্বক দমন করা হইল। এই সূত্রে বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণনাশ করা হইয়াছিল। ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাসও ঐ সময়ে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বল্‌শেভিক্ সরকার শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনই ছিল তখনকার সর্বপ্রধান সমস্যা। বৈদেশিক যুদ্ধে শক্তি এবং সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধানের জন্য বল্‌শেভিক্ সরকার জার্মানির সহিত ব্রেস্ট্-লিটভস্কের (Brest-Litvosk) সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়াকে বহু স্থান ত্যাগ করিতে হইল, কিন্তু জাতির স্বার্থের খাতিরে ব[illegible] সরকার সেই পন্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পিটার-[illegible]র্তীকালে যে সকল স্থান রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল [illegible]ব কিছুই এই সন্ধির শর্তানুসারে ফিরাইয়া দিতে হইল (ম্যাপ [illegible])। বৈদেশিক যুদ্ধের এইভাবে অবসান ঘটাইয়া বল্‌শেভিক্ [illegible]মাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যে অধিকতর মনোযোগ দিতে পা[illegible]লেন।

বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান : ব্রেস্ট্-লিটভস্কের সন্ধি

[illegible]টাকাস' [illegible] জার্মানাইজেন [illegible] স্বীকৃত [illegible]

অধী[illegible] বল্‌শেভিক্ সরকারের সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদ আসিল বাহির হইতে। [illegible]গণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র স্থাপিত হউক এই ইচ্ছা করিত। তাহাদের প্রচারের আন্তর্জাতিক আবেদন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। যুদ্ধের ফলে প্রত্যেক দেশেই তখন অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। এমতাবস্থায় সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য এবং রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের সাফল্য [illegible]পর দেশের জনসাধারণকেও প্রভাবিত করা স্বাভাবিক ছিল। ইওরোপীয়

জল[illegible] রেয়ন [illegible] সর্বপ্র[illegible] [illegible] আবেদন : [illegible] শক্তিবর্গের [illegible]

শক্তিবর্গই এই কারণে প্রমাদ গণিল। তাহারা রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ বিপ্লব-বিরোধী দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার গোপন চেষ্টা করিতে লাগিল। এই বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেরেনস্কি, করনিলভ, ডেনিকিন্ ও র‍্যাঙ্গেল। ইংলণ্ড, জাপান ও ফ্রান্স রুশ-বিপ্লব দমন করিবার জন্য রাশিয়ায় সৈন্য পাঠাইতেও দ্বিধাবোধ করিল না। কিন্তু বল্‌শেভিক্ সরকারের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকায় এই অপচেষ্টায় রাশিয়ার কোন ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হইল না। রাশিয়ার কৃষক-মজুরদের সহায়তা এবং বিপ্লব-বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যের অভাব বল্‌শেভিক্ সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিল। বিদেশী আক্রমণ স্বভাবতই বিফলতায় পর্যবসিত হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশকর্তৃক রুশ-বিপ্লব দমনের চেষ্টা ঐ সকল দেশের জনসাধারণ সমর্থন না করায় ক্রমেই সৈন্য পাঠাইয়া রুশ-বিপ্লব দমনের আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ সৈন্য রাশিয়া হইতে অপসারণ করিল। বল্‌শেভিক্ বিপ্লব-বিরোধী দলগুলিকে দমন করা বল্‌শেভিক্ সরকারের পক্ষে তখন আর কঠিন হইল না রুশ-বিপ্লব স্থায়ী এবং সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। বিদেশী ... অবশ্য বল্‌শেভিক্ সরকারকে স্বীকার করিলেন না। ক্রমে ... বল্‌শেভিক্ সরকার ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বীকৃতি-লাভে ...

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান কর্তৃক রুশ-বিপ্লব দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ

বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ : রুশ-বিপ্লবের জয়

লেনিন, ১৯১৭—'২৪ (Lenin): ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব... নেতা ট্রট্স্কি ও লেনিন কেরেনস্কি শাসনের অবসান ঘটাইয়া বল্‌... সম্পন্ন করেন।

ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ্ সর্বসাধারণ্যে লেনিন নামেই পরি... ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল কাজান প্রদেশের সিন্‌বিরস্ক্ ... জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উ... পরিবার হিসাবে খ্যাত ছিল। লেনিনের ভ্রাতা ... জারের ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জারকে হত্যা করি... ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার অপর ও দুই ভগিনী পুলিশের নজরবন্দী ছিলেন। লেনিন নিজেও পুলিশের ... এড়াইতে পারেন নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া ক...

লেনিনের বাল্যজীবন ও শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই এক ছাত্র-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণের ফলে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পর অবশ্য তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র অবস্থায়ই তিনি মার্কস্‌-এর 'ক্যাপিট্যাল' পাঠ করিয়া একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পন্থাতেই রুশ জাতির প্রকৃত মুক্তিসাধন সম্ভব, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। লেনিন একটি বিপ্লবী দলের সভ্য হন এবং এই অপরাধে তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

নির্বাসন-দণ্ড ভোগের পর তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গমন করেন। কেবলমাত্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক রুশ-বিপ্লবের সময়ে তিনি অল্পকালের জন্য রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জার্মানি, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া তথাকার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের সহিত পরিচিত হন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সোশিয়েলিস্ট্‌ ডিমোক্রেটিক দলের অধিবেশন: [illegible]শেভিক ও [illegible]টাকাস্‌' [illegible]

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রুশ 'সোশিয়েলিস্ট্‌ ডিমোক্রেটিক' দলের এক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে লেনিন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সুদৃঢ় সংগঠন এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব-মুক্ত প্রোলিটারিয়েট-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তি দেখাইলেন। অপর এক দল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, এমন কি যে-কোন [illegible]ব্যক্তিকেই সোশিয়েলিস্ট্‌ ডিমোক্রেটিক দলের সভ্য করিবার [illegible]। ভোটে লেনিনের মতই গৃহীত হইল। এই সময় হইতেই [illegible]ত বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 'বলশেভিক্‌' নামে পরিচিত হইলেন। হ[illegible]ক্ষ 'মেনশেভিক্‌' বা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইল।*

[illegible] জীবনে দারিদ্র্যের কষ্ট কোনদিনই অনুভব করেন নাই, কিন্তু তিনি [illegible]তি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত কর্মক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সুদৃঢ় সংকল্প তাঁহাকে বিপ্লবী দলের নেতৃপদের যোগ্য করিয়াছিল। তিনি নিজ নীতি অনুসরণে কোন বাধা-বিপত্তিই মানিতেন না, [illegible]নবোধে তিনি কূট কৌশলেরও সাহায্য গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন

* [illegible]olsheviki from *bolshinstvo*, meaning 'majority', *Mensheviki* from [illegible]*hinstvo*, meaning 'minority', vide Langsam, p. 542.

না ধনতন্ত্র তাঁহার নিকট পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সর্বনাশাত্মক ব্যবস্থা বলিয়া মনে হইত বিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্রের অবসান-সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ঘটিলে জার্মান সরকারের সহায়তায় তিনি রাশিয়ায় ফিরিয়া আসেন। জার্মান সরকার লেনিনের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন মনে করিলে ভুল হইবে। জার্মান সরকার চাহিয়াছিলেন যে, লেনিন স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু করিলে রাশিয়ার বিপ্লবী অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানির জয়লাভের আশাও বৃদ্ধি পাইবে।

লেনিনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (.৯১৭)

রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া লেনিন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তায় অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সম্পন্ন করেন। এই বিপ্লবে ট্রট্স্কি ছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

বল্‌শেভিক্ বিপ্লব

বল্‌শেভিক্ শাসনব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন লেনিন। তাঁহার আমলে রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বহুবিধ মৌলিক পরিবর্তন ঘটিল। সম্পত্তি জাতীয়করণ নীতি কার্যকরী ক[illegible] গিয়া বল্‌শেভিক্ সরকারকে এক দারুণ সমস্যার স[illegible] হইল। কৃষকগণ জমিদারের সম্পত্তি[illegible] যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিল বটে, কিন্তু সেই জমি নিজ স[illegible] রাখিবার জন্যই তাহারা ব্যস্ত হইল। তাহারা নিজ নিজ জমি[illegible] প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন ফসল নিজ হস্তে রাখিয়া নিজ নিজ[illegible] আয় বৃদ্ধি করিতে চাহিল। উদ্‌বৃত্ত ফসল স[illegible] হাতে ছাড়িয়া দিতে তাহারা মোটেই রাজী[illegible] সরকার এ বিষয়ে জোর করিলে কৃষকগণ উৎপাদন হ্রাস করি[illegible] ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে[illegible] লোক খাদ্যাভাবে মারা গেল। ঐ সময়ে[illegible] সাহায্য, বিশেষতঃ আমেরিকার সাহায্যে বহু লোকের প্রাণ বাঁচিল।

বল্‌শেভিক্ সরকারের অর্থনৈতিক সমস্যা

কৃষির অবনতি

দুর্ভিক্ষ

শিল্পক্ষেত্রেও একইরূপ দুরবস্থা দেখা দিল। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান[illegible] জাতীয়করণ করা হইয়াছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় তখন শিল্প প্রতিষ্ঠান

দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠন-ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে শিল্পোৎপাদনে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। উৎপন্নের পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় প্রস্তুত সামগ্রীর দাম দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

শিল্পের অবনতি

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন রেলপথও প্রায় অচল হইয়া পড়িতেছিল। রেল-ইঞ্জিনের শতকরা ৬০ ভাগ যুদ্ধকালীন পরিবহনের চাপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলে, দেশের একস্থান হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য বা শিল্প-সামগ্রী অপর স্থানে পরিবহনের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে, জিনিষপত্রের দাম ভীষণভাবে বাড়িয়া গেল। এদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলেও মূল্যস্তর সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল। কৃষকগণ তাহাদের উদ্‌বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে শিল্প-সামগ্রী অথবা ধাতু-নির্মিত মুদ্রা দাবি করিল। কাগজী মুদ্রা গ্রহণে তাহারা রাজী হইল না। সরকার আইনের বলে কৃষকদের নিকট হইতে উদ্‌বৃত্ত শস্য গ্রহণের চেষ্টা করিলে সরকারের প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষি ও শিল্পের এইরূপ দুরবস্থায় জনসাধারণ স্বভাবতই বল্‌শেভিক্ শাসন-বিরোধী হইয়া উঠিল। 'সোভিয়েট সরকারের পতন হউক' এই ধ্বনি দে[illegible] র উত্থিত হইল।*

পরিবহন-ব্যবস্থা অচল

মূল্যস্তর বৃদ্ধি

[illegible]টাকাস্'

[illegible]হার 'খাঁটি কমিউনিজম্' (Pure Communism)-পরীক্ষা তেমন সফল হইল না দেখিয়া এক নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করিলেন। ইহা ১৯২১ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ('New Economic Policy', 1921—[illegible]EP) পরিস্থিতির খাতিরে যতদূর পর্যন্ত কমিউনিজম্ কার্যকরী রাখা [illegible]ল কেবলমাত্র ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।† এই নূতন [illegible]ক ব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এক কার্যকরী সংমিশ্রণ বলা [illegible]রে।

জাইনেন[illegible] [illegible]রীকৃ[illegible] কৃষি [illegible] [illegible] জল[illegible] রেয়ন সর্বপ্র[illegible] [illegible]

* [illegible]ies of 'Down with the Soviet Government', became more and [illegible]equent and vehement in 1920 at the meetings of the workers and [illegible]nts". Langsam, p. 567.

† "As much communism as the exigencies of the situation would [illegible]t, and no more". Lenin, vide Langsam, p. 568.

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় (১) কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা হয়। এই কর মিটাইবার পরও যদি কোন কৃষকের হাতে উদ্‌বৃত্ত শস্য রহিয়া যায় তাহা হইলে উহা খোলা বাজারে বিক্রয় করিবার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়। (২) ব্যক্তিগতভাবে খুচরা কারবার চালনার অসুবিধা দূর করা হয়। কয়েকটি বিশেষ নীতি মানিয়া চলিলে যে-কেহ এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তবে মূল্য-স্তর যাহাতে কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করা না হয় সেজন্য সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ক্রেতাদের সমবায় সমিতি স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হয়। (৩) ২০ জন শ্রমিকের নিম্নসংখ্যক শ্রমিক যে-সকল কারখানায় কাজে খাটান হইত সেগুলিকে মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৪) ব্যাঙ্ক ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করা হয়। (৫) বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করিবার জন্য বিদেশী মূলধনীদিগকে মুনাফা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাহাদের মূলধনের গঠিত শিল্প নির্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয়করণ করা হইবে না এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (৬) সরকারী খাদ্যভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয়ের পরও প্রয়োজনবোধে খোলা বাজার হইতে অধিক পরিমাণ শস্য ক্রয়ে[illegible] দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরী ক্রমবর্ধমান হারে বাঁধিয়া[illegible] র (৭) শ্রমিক মাত্রেরই বাধ্যতামূলকভাবে ট্রেড্ ইউনিয়নের স[illegible] র পরিত্যক্ত হয়। (৮) শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য স[illegible] গঠন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সংযোগ ও সমবায়ের [illegible] কান প্রস্তুত করা হয়। [illegible] স্থায় [illegible] াইয়া

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (NEP) মূলনীতি

এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে কৃষি, শিল্প প্রভৃ[illegible] দ শুরু দ্রুত উন্নয়ন শুরু হইল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আরও বেশি উৎসাহ[illegible] উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে জমি ভাড়া দেওয়া বা প্র[illegible] াশাক এবং শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ বলিয়া ঘোষণা কা[illegible] ও ফলে, অনেকে অপরের জমি ভাড়া করিয়া ফসল উৎপাদন শুরু করিল। [illegible] ব্যবস্থার ফলে পুনরায় কৃষকদের মধ্যে গরীব, সচ্ছল ও অর্থশালী এই শ্রেণীর উৎপত্তি হইল। এই কারণে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার গরীব কৃষকদি[illegible]

জাতীয় উন্নয়নে সরকারী উৎসাহ দান

করদান হইতে অব্যাহতি দিলেন। মোট ৩৫% কৃষক ইহাতে করভার হইতে মুক্ত হইল। অপর ৫৩% ভাগের উপর অতি সামান্য পরিমাণ কর স্থাপন করা হইল। অবশিষ্ট ১২% ভাগের উপর অত্যধিকভাবে করভার স্থাপন করা হইল। এই শেষোক্ত কৃষকগণ 'কুলাক্' (*Kulaks*) নামে পরিচিত ছিল। 'করভার পুনর্বণ্টনের ফলে কৃষকদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য অনেকটা দূর হইল।

কৃষকদের আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা NEP গ্রহণের ফলে বল্‌শেভিক্ শাসনের প্রথম দিকে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তাহা বহুপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দ্রুত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় এক শতেরও বেশি বিদেশী প্রতিষ্ঠান রাশিয়ায় শিল্প-গঠনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইল। NEP যখন চালু ছিল তখন সরকারী ব্যুরো (Bureaus) মারফৎ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার এক পরিসংখ্যান (Statistics) গ্রহণ করা হইল। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রথম রুশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

NEP-এর সুফল

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে লেনিন শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রেস্ট্-লিটভস্কের ...টাকাস্' ...শিয়ার রাজ্য কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও দেশের ও জনগণের ...তিনি তাহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

...নাইনের ...গ্রাসী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ...টারন্যাশনাল' বা কমিণ্টার্ণ (The Third International or ...rn)-এর অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট্ ...র কেন্দ্র হইল মস্কো। সোভিয়েট সরকার এবং কমিণ্টার্ণ ইওরোপীয় ...হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইলেন, এমন কি পৃথিবী সর্বত্র কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন; কমিউনিস্ট্ নীতি এবং কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে জারতন্ত্রের ...শিয়া তুরস্ক ও চীন দেশে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিল ...সবই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল। রুশ সরকার এশিয়ার পরাধীন দেশগুলিকে ...্যবাদের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। পারস্য ও আফগানিস্তানে ...দূতগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী প্রচারকার্য চালাইলে এক ব্রিটিশ মিশন

রাশিয়ার নিকট পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে রুশ দূতগণের অপসারণ দাবি করিলেন।* ইহা ভিন্ন অপরাপর বহু দাবিও উত্থাপন করা হইয়াছিল। রুশ-বিপ্লবকে বিফলতায় পর্যবসিত করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী সৈন্যগণ যখন রাশিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল তখন যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল সেজন্যও ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইল। সোভিয়েট সরকার প্রত্যুত্তরে ককেশাস অঞ্চল, সুদূর প্রাচ্য (Far East), মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের সোভিয়েট-বিরোধী কার্যকলাপের কথা জানাইলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের দাবি প্রত্যাহার করিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত মনোমালিন্য

সোভিয়েট সরকারের অপর সমস্যা ছিল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হওয়া। ইহারও সুযোগ আসিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে 'লেবার পার্টি' (Labour Party) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ব্রিটিশ সরকারের রুশ-বিরোধী নীতি কতকটা হ্রাস পাইল। ঐ বৎসরই মুসোলিনি সোভিয়েট সরকারকে আইনতঃ স্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েট সরকার... স্বীকার করিলে ইতালি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া... সোভিয়েট ডেনমার্ক, মেক্সিকো, হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স সো... স্বীকার করিয়া লইল। এই বৎসরই (১৯২৪) রুশ-বল্‌শে... লেনিনের মৃত্যু হয়।

ইংলণ্ড, ইতালি, নরওয়ে, গ্রীস, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কর্তৃক সোভিয়েট সরকার স্বীকৃত

...কান ...স্থায়

লেনিনের মৃত্যুর পর বল্‌শেভিক্ বা কমিউনিস্ট্ পার্টির নেতৃত্ব ল... ট্রট্‌স্কি ও কমিউনিস্ট্ পার্টির সেক্রেটারী-জেনারেল যোসেফ স্টালি... এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হইল। ১৯১৭ বল্‌শেভিক্ বিপ্লবে ট্রট্‌স্কির দান নেহাৎ কম ছিল... ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাবান সংগঠক। লাল ফৌজ তাঁহারই

ট্রট্‌স্কি-স্টালিন বিরোধ

* "These included the withdrawal of the Soviet diplomatic ...tatives in Persia and Afghanistan, apologies from the Soviet Gov... for alleged anti-British activities by these representatives... Soviet Government in reply pointed out the apocryphal charac... evidence quoted in the Note, and reminded the British Govern... it had ample documentary evidence of anti-Soviet activities b... agents in the Caucasus, Central Asia and the Far East."

A History of the U. S. S. R. Rothstein, p. 161.

শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ট্রট্স্কির মত ও কর্মপন্থা লেনিনের মত ও কর্মপন্থা হইতে ভিন্ন ছিল। লেনিনের জীবদ্দশায়ই ট্রট্স্কির লেনিন-বিরোধী কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তর-সাধক স্টালিনের ও ট্রট্স্কির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হইল।

ট্রট্স্কি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপেক্ষা পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু স্টালিন দেখিলেন যে, ধনতান্ত্রিক ইওরোপীয় দেশগুলিতে কমিউনিজম্ স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা অপেক্ষা বল্‌শেভিক্‌দলের সমগ্র শক্তি রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে নিয়োজিত করাই উচিত হইবে। ইহা ভিন্ন স্টালিন ছিলেন কৃষক পরিবার-সম্ভূত। তিনি কৃষকদিগকে কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিবার জন্য NEP অর্থাৎ নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত ব্যক্তিগত মালিকানার সহিত সমাজতান্ত্রিকতার যোগাযোগ আরও কিছুকাল রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ট্রট্স্কি সাধারণ কৃষক বা [illegible]

ট্রট্স্কি ও স্টালিনের মধ্যে মতের পার্থক্য

তিনি কৃষক সম্প্রদায়কে কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবান করা অপেক্ষা ইওরোপে [illegible] বিপ্লব-সৃষ্টি অধিকতর প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। তিনি [illegible]না বা মূলধনী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে মুহূর্তকালও [illegible]তী ছিলেন না। স্টালিন বিদেশী মূলধনের সাহায্যে রাশিয়ার [illegible] সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ট্রট্স্কি বিদেশী মূলধনীদের সহিত [illegible]ব সম্পর্কস্থাপন দেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে করিতেন।

[illegible]মেনেভ্ ও জিনোভিয়েভ্-এর সহায়তায় স্টালিন ট্রট্স্কিকে যুদ্ধমন্ত্রির [illegible]issar for War) পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কিন্তু স্টালিনের [illegible]র ঢক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী মূলধনীদের সহিত যে [illegible]দন করিতে হইয়াছিল এবং কৃষকদের উন্নতিবিধানের জন্য যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দানের প্রয়োজন ছিল তাহা কমিউনিজমের পরিপন্থী মনে করিয়া ক্যামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্, বুখারিন্ প্রভৃতি স্টালিনের বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] কংগ্রেসের লেনিনপন্থী সংখ্যাধিক্যের সহায়তায় এই দুই বিরোধী [illegible]কেও অপসারণ করা সম্ভব হইল। ক্রমে ট্রট্স্কিপন্থী সকলকেই কমিউনিস্ট্

[illegible]মেনেভ্ ও [illegible]য়েভ-এর পতন

পার্টি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কিকে রাশিয়া হইতে নির্বাসিত করিয়া স্টালিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। নির্বাসিত অবস্থায়ই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কির মৃত্যু হয়।

যোসেফ স্টালিন ঃ (Joseph Stalin) ঃ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর টিফলিস্ প্রদেশের গোরি নামক শহরে যোসেফ্ স্টালিনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভিসারিওন্ আইভানোভিচ্ যুগাশ্ভিলি ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়-সম্ভূত। তিনি মুচির কাজ করিতেন। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে দরিদ্র জনসাধারণ হইতেও ধর্মযাজক হওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইলে স্টালিনের পিতা তাঁহাকে টিফলিসের এক ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই স্টালিন সোশিয়েল ডিমোক্রেটিক দলের সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। স্টালিনের অবশ্য যাজক হওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি বাইবেল অপেক্ষা মার্কস্-এর গ্রন্থাদিই অধিক মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। সুতরাং ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না। তিনি সর্বান্তঃকরণে মার্কস্বাদ কিভাবে কার্যকরী করা যাইতে পারে তাহা লাগিলেন। ঐ সময় শ্রমিক আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্টালিন এই সকল আন্দো যেসব গোপন বিপ্লববাদী সমিতি ও দল ছিল সেগুলির হইলেন। পনর বৎসর বয়সে তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য হইলেন

স্টালিনের বাল্যজীবন

স্টালিন ছিলেন নির্ভীক, গম্ভীরপ্রকৃতির দৃঢ়চেতা পুরুষ। নিজ পৌঁছিবার জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তিনি করিতেন না। বিপজ্জন সম্পাদনে তাঁহার ন্যায় অপর কেহ এতটা পারদ না। এজন্য বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। 'স্টালিন' কথাটির অর্থ হইল তাঁহার চরিত্রের সহিত তাঁহার এই নামের সামঞ্জস্য ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্ট সকল সোশিয়েল ডিমোক্রেট লেনিনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহা মধ্যে স্টালিন ছিলেন অন্যতম। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া লেনি মৃত্যু পর্যন্ত তিনি লেনিনের অনুগত সহচর ছিলেন।

চরিত্র

স্টালিন দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞান নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু মার্কস্‌বাদী গ্রন্থাদি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। স্টালিন ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষিত মার্কস্‌বাদী।* ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টিফলিসের রেলকর্মচারীদের শিক্ষাকেন্দ্র (Study Circle) পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা

১৯০২ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্টালিন ছয় বার ধরা পড়িয়াছিলেন এবং ছয় বারই নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। পাঁচ বার তিনি নির্বাসন-কেন্দ্র হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ষষ্ঠ বার তাঁহাকে আর্কটিক অঞ্চলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জারতন্ত্রের পতনের পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

সরকার-হস্তে নির্যাতন

বল্‌শেভিক বিপ্লব সাধনে স্টালিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার ও বল্‌শেভিক্‌দলের সংগঠন সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রচারপত্র-রচনা, অর্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন পার্টির ...ী-জেনারেল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর (৬, ৭) মাসের বল্‌শেভিক্ ...ন তাঁহার সামরিক ক্ষমতারও পরিচয় দান করিয়াছিলেন। নব-...বস্থায় স্টালিন Commissar of Nationalities নিযুক্ত হইলেন। এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়াই তিনি ট্রান্‌স্‌ককেশিয়ার রিপাব্লিকের ঐক্যসাধন এবং U.S.S.R.-এর সংগঠন সম্পন্ন করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ অধ্যা...য়ের স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় সেই বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন ...।

...টাকাস' ...নাইলেন ...হরীকৃত ...ঠন- ...পারের জল... রেয়ন

সর্ব... বল্‌শেভিক্ বিপ্লবকে বানচাল করিবার জন্য রাশিয়ায় বৈদেশিক সহায়তায় যে অন্তর্যুদ্ধের (Civil War) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে লেনিন স্টালিনকে সর্বাপেক্ষা কঠোর এবং কঠিন সামরিক দায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। যেখানেই

...রিক দক্ষতা

* "Stalin became an educated Marxist." *A short biography of Stalin :* ...oreign Languages Publication, Moscow, 1951. p. 8.

জটিল সামরিক পরিস্থিতি উপস্থিত হইত সেখানেই স্টালিনকে প্রেরণ করা হইত।*

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কি, ক্যামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্, বুখারিন্ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা দমন করিয়া স্টালিন লেনিন-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পন্থা এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণের নীতি চালু রাখিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্টালিনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও পরিদর্শনাধীনে রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। NEP-এর স্থলে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের মধ্যে (১৯২৮-৩৩) নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়া রুশ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিতে চাহিল। গোসপ্ল্যান বা স্টেট্-প্ল্যানিং কমিশন (*Gosplan* or State Planning Commission) এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং উহা কার্যকরী করিবার দায়িত্বও এই কমিশনের উপরই ছিল। উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্যের বন্টন, মূলধনের ব্যবস্থা, শিল্প, কৃষি, পরিবহন সব কিছুই এই কমিশনের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল

গোস্প্ল্যান বা স্টেট্-প্ল্যানিং কমিশন: প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯২৮-১৯৩৩)

এই পরিকল্পনা অনুসারে শতকরা ৫৫ ভাগ ফসল বৃদ্ধি ক[illegible] কারণে সাড়ে পাঁচ কোটি একর জমি যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির [illegible] করা স্থির হইল। রাশিয়ার কৃষকদের অধীন মোট জমির [illegible] এইভাবে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের অধীনে আনিত করা হইল। কয়লা এবং তেলের উৎপাদন দ্বিগুণ[illegible] বৈদ্যুতিক শক্তি অন্ততঃ তিনগুণ বৃদ্ধি করা এবং [illegible]পাদন মোট চার গুণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা [illegible] হইল। শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য টেক্নিক্যাল স্কুলস্থাপন, বিদেশী শিল্প-শি[illegible] আমন্ত্রণ, নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ, মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি[illegible] কৃষ্টিমূলক আনন্দদানের জন্য প্রতি গ্রামে সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির প্র[illegible] স্থাপন করাও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম অংশ হিসাবে গৃ[illegible] হইল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

* "Whenever confusion and panic might at any moment develop in[illegible] helplessness and catastrophe, there Comrade Stalin was always sure[illegible] appear."—Voroshilov; vide *Joshep Stalin*—A short Biography, pp. 68

এই অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন একমাত্র সর্বসাধারণের অক্লান্ত শ্রমের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। সংবাদপত্র, বক্তৃতা, সিনেমা, রেডিও, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে সমগ্র রুশ জাতির মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ইচ্ছা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায়ই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে জনগণের সহায়তা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের পূর্বেই সম্পন্ন করা হইল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ফলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তুলনায় রাশিয়ার কয়লা ও খনিজ তেলের উৎপাদন দ্বিগুণ হইল। লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদনও ঠিক অনুরূপ বৃদ্ধি পাইল। বৈদ্যুতিক শক্তি তিনগুণে পরিণত হইল। দেশের সর্বত্র বিশাল বিশাল শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রেলইঞ্জিনের কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা, মোটরগাড়ী প্রস্তুতের কারখানা, ঔষধ প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠান, নূতন নূতন কয়লার খনি, ট্রাক্টর প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিল। মানুষের শ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর ...ের এক চরম দৃষ্টান্ত রাশিয়া স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। পরিকল্পনা ... বৎসরের মধ্যে মোট এগার শত মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইয়া ...

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুফল

...টাকাস ...নাইক্রেন ...রীকৃ ... কৃষি

...কৃষিক্ষেত্রেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমভাবেই ফলপ্রসূ হইল। ...পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট কৃষি-জমির শতকরা ২০ ভাগ যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের অধীন আনা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মোট ৬০% কৃষি-জমি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসিয়াছিল। রাষ্ট্র পরিচালিত বিরাট বিরাট কৃষিপ্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছিল। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ...পনের ফলে কুলাক্ নামক বিত্তশালী কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য নাশ হইয়াছিল। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী ঋণদান, করহ্রাস, পুরস্কার ইত্যাদি নানাপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল।

...ল ...য়ন ...র উন্নতি: যৌথ ...প্রতিষ্ঠান স্থাপন

শিক্ষাবিস্তারের দিক দিয়াও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এক যুগান্তর

আনয়ন করিয়াছিল। ধনতান্ত্রিক শিক্ষার স্থলে সাম্যবাদী শিক্ষার বিস্তার দ্বারা ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি দূর কবিবার জন্য কমিউনিস্ট্ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শিশুর পক্ষে মোট সাত বৎসরের জন্য স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করা বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৩ জন সেখানে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৯ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শিক্ষার উন্নতি : রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা

জাতীয় জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মের কোন স্থান আছে বলিয়া কমিউনিস্ট্‌গণ বিশ্বাসই করে না। মার্কস্‌বাদ বস্তুতান্ত্রিকতার উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছে। ফলে, রাশিয়ার ধর্মবিষয়ে উৎসাহ দান দূরের কথা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় যাদুঘরে পরিণত করা হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কমিউনিস্ট্ পার্টির সভ্যদিগের চার্চে প্রার্থনায় যোগদান করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। জারতন্ত্রের প্রধান সহায়ক ছিল রুশ চার্চ ও যাজক সম্প্রদায়। এই কারণে চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্র আয়ত্তে আনা হইয়াছিল। কমিউনিজমের ধর্মবিরোধিতার প্রধান যুক্তি হইল এই যে, ধর্ম মানুষকে আফিংয়ের ন্যায় করিয়া রাখে। স্বর্গরাজ্যে ভগবানের নিকট হইতে যথাযথ পুর দেখাইয়া ইহজগতে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার কথা থাকে। কিন্তু এই 'আফিংয়ের' নেশা ভাঙ্গিয়া দিলেই মানুষ উন্নতি সাধনের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইবে।* এই কার রাশিয়ায় ধর্ম সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

চরম ধর্মনিরপেক্ষতা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য স্বভাবতই দ্বিতীয় পঞ্চবা পরিকল্পনা গ্রহণের উৎসাহ সৃষ্টি করিল। কিন্তু এইবার প্রথম পঞ্চবার্ পরিকল্পনার দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সেগুলির গুণও যাহাতে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ সেগুলি যাহাতে প্রথম স্তরের স হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হইল। শিল্পজ্ঞান টেক্‌নিক্যাল জ্ঞানের দিক দিয়াও রাশিয়া যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে সেই চেষ্টাও করা হইল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (জানুয়ারী ১৯৩৩ হইতে

* "Religion is the opiate of the people."—*Lenin*.

ডিসেম্বর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) শিল্পোৎপাদন প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়াইবার চেষ্টা চলিল। কৃষির জন্য সার উৎপাদন দশগুণ, মোটর-গাড়ীর প্রস্তুতের সংখ্যা সাতগুণ, ইস্পাত ও কয়লা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। ইহা ভিন্ন টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ (৪৬$\frac{১}{২}$%), চিনি ও বস্ত্রশিল্প শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান, নিরক্ষরতা প্রভৃতির সম্পূর্ণ অবসান এবং বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিশুকেই সাত বৎসরকাল পলিটেক্‌নিক্যাল শিক্ষা (Polytechnical education) দানের ব্যবস্থা করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা চলিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৮-১৯৪২) কার্যকরী করা হইল। তৃতীয় পরিকল্পনাকাল অতীত হইলে রাশিয়া শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইওরোপের সকল দেশ অপেক্ষাই অধিকতর ক্ষমতাশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার সমস্যার অবসান, ব্যক্তিমাত্রেরই ক্রয়-ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রভৃতি সাধিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়া-[illegible] কৃষিপ্রধান রাশিয়া দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পোৎপাদক দেশের অন্যতম [illegible]ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১[illegible]৪২): [illegible]র্টাকাস্' [illegible]ল্লাৎ- [illegible]ত [illegible]নাইলেন [illegible] [illegible]স্বীকৃত

[illegible] স্টালিনের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Stalin):

আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে স্টালিন শান্তি বজায় রাখিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার পরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি এবং বৈদেশিক সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং স্টালিন কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক প্রয়োগ-নীতি ত্যাগ করিয়া জাতীয় গণ্ডীর মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলেন। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতি-ই পৃথিবীর নিকট কমিউনিজমের সার্থকতা প্রমাণ করিবে—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

[illegible] রেয়ন [illegible] উন্নতির জন্য সর্বপ্র[illegible] প্রা[illegible]ক শান্তি [illegible] রায় রাখার নীতি

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লেবার (Labour) মন্ত্রিসভার পতনের পর বল্‌ডুইন-এর রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার অধীনে ইঙ্গ-সোভিয়েট ঋণ-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের আশা বিনষ্ট হইল। ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি বল্‌শেভিক্ দলের বিরোধিতায় বান্‌চাল হইল। ফ্রান্সের সৌখীন সামগ্রী বল্‌শেভিক্ দল রাশিয়ায় আমদানি করিবার পক্ষপাতী ছিল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ায় এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে, উহা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির পূর্বাভাস মাত্র। এই কারণে রাশিয়া বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সহিত 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ধর্মঘট দেখা দিলে রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ ট্রেড্‌ইউনিয়নগুলি ধর্মঘটী শ্রমিকদের অর্থ-সাহায্য দান করে। এই সূত্রে ক্রমে ইঙ্গ-সোভিয়েট মনোমালিন্য বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক আদান-প্রদান (Diplomatic relations) বন্ধ করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় লেবার পার্টি মন্ত্রিত্ব লাভ করিলে রাশিয়ার সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।

রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য

তুরস্ক ও জার্মানির সহিত 'না-আক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত

ইংলণ্ডের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ নাশ (১৯২৭) : কূটনৈতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন (১৯২৯)

এদিকে ফ্রান্সের সহিতও রাশিয়ার মনোমালিন্য বৃদ্ধি পা[illegible] রাশিয়া ফ্রান্সের সৌখীন সামগ্রী ক্রয় না করায় এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টা[illegible] শত্রু জার্মানির সহিত রাশিয়ার চুক্তি সম্পাদি[illegible] ফ্রান্স ক্রমেই সোভিয়েট-বিরোধী হইয়া উঠিল। [illegible] খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পোয়েনকেরি (Poincar[illegible]) ফ্রান্স হইতে রুশদূতের অপসারণ দাবি করেন। [illegible] বৎসরই চীন দেশের জাতীয়তাবাদী দল পেকিং-[illegible] সোভিয়েট দূতাবাস আক্রমণ করে এবং পোল[illegible] সোভিয়েট দূতকে হত্যা করা হয়। এই সকল ঘটনা স্বভাবতই রাশিয়ায় এক দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। [illegible] নিজ নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে পারস্য, [illegible]ভিয়া[illegible] প্রভৃতি দেশের সহিত 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact), কেল্‌গ চুক্তি (Kellog Pact) প্রভৃতি স্বাক্ষর করে। তুরস্ক ও

ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য, চীনে সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত, পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট দূতকে হত্যা

রাশিয়ার ভীতি : পারস্য ও ল্যাট্‌ভিয়ার সহিত 'না-আক্রমণ চুক্তি' কেল্‌গ চুক্তি, জার্মানির সহিত মৈত্রী

ইতালির দ্বন্দ্বে রাশিয়া মধ্যস্থতা করিয়া সেই মনোমালিন্য দূর করিতে সমর্থ হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জার্মানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া জার্মানির নিকট হইতে এক বিরাট পরিমাণ ঋণগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। সোভিয়েট-ইতালি-জার্মানি-তুরস্ক মৈত্রী বৃদ্ধি পাইলে ফ্রান্স ক্রমেই রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যের সুযোগ হইতেও ফ্রান্স বঞ্চিত ছিল।* এই কারণে ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ইওরোপীয় শক্তি-সংঘ গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। রাশিয়া সস্তা দরের সামগ্রী দ্বারা ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনাশের চেষ্টা করিতেছে এই অভিযোগ ফ্রান্স উত্থাপন করিলে আমেরিকা ও ব্রিটেন উহার সমর্থন করে। এই সকল দেশ রাশিয়া হইতে গম, তুলা ও কাঠ আমদানি বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই সকল দেশের নীতি পরিবর্তিত হইল। হিট্‌লারের অধীনে জার্মানি কমিউনিস্ট্-বিরোধী হইয়া উঠিলে এবং বিশেষতঃ হিট্‌লার 'সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী' এই ঘোষণা করিলে সোভিয়েট-জার্মান মৈত্রী শিথিল হইয়া পড়িল। তদুপরি জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইলে রাশিয়া আমেরিকা, ফ্রান্স [illegible]শের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন অধিকতর লাভজনক মনে করিল। [illegible]ন্স প্রভৃতি দেশও রাশিয়ার ন্যায় শিল্পোন্নত দেশকে বাদ দিয়া [illegible] চালনার অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া রাশিয়ার সহিত মনোমালিন্য [illegible] রাখিবার জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করিতে চাহিল না।

ফরাসী-ইংলণ্ড-আমেরিকার অর্থনৈতিক বিরোধিতা : ইওরোপীয় দেশগুলির সোভিয়েট নীতির পরিবর্তন

[illegible]টাকাস' [illegible] নাইজেশন [illegible] স্বীকৃতি

[illegible] সোভিয়েট চুক্তি, [illegible]ন-সোভিয়েট [illegible] লুশো [illegible]

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জেনিভা কন্‌ফারেন্স-এ ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পরস্পর মৈত্রীর পথ আরও সহজ হইয়া উঠিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় ফরাসী-সোভিয়েট 'না-আক্রমণ [illegible] সম্পাদনে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট্ রাশিয়ার [illegible] কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন। উভয় পক্ষে সরকারীভাবে যে সকল চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইল তাহাতে উভয় দেশই পরস্পর স্বার্থের হানি করিবে না এই প্রতিশ্রুতি দান করিল।

* "The Paris Government was alarmed at the growing Russian-German-Italian-Turkish friendship and disgruntled over France's inability to capture profitable Soviet foreign trade." Langsam, p. 594.

জার্মানি ও জাপানে যুদ্ধপ্রস্তুতি রাশিয়ারও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। রাশিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর শক্তিবৃদ্ধি স্বভাবতই কামনা করিত। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ ত্যাগ করিলে পরবৎসরই রাশিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য হিসাবে গৃহীত হয়। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে তথাকার প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া সাহায্য দান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। এদিকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক চুক্তি দ্বারা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হিট্‌লারকে সুদেতেনল্যাণ্ড দান করিলে রাশিয়া এককভাবে চেকোস্লোভাকিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতি রাশিয়ার মনোভাব পরিবর্তিত হইতে থাকে। রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠে। রুশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী লিট্‌ভিনোভ্‌-এর পদত্যাগ এবং মলোটভ্‌-এর ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। লিট্‌ভিনোভ্‌ ছিলেন রুশ-ইঙ্গ-ফরাসী সমবায়ের মাধ্যমে ইওরোপীয় নিরাপত্তা রক্ষার প[...] তাঁহার পদত্যাগের পর এই নীতি স্বভাব[...] হইল। ইহার ফল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে [...]। জার্মান 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact)-তে পরিলক্ষি[...]

রাশিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য হিসাবে গৃহীত (১৯৩৪)

মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮): রুশনীতির পরিবর্তন

সোভিয়েট-জার্মান 'না-আক্রমণ চুক্তি' (১৯৩৯)

জার্মানি (Germany)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানি : নাৎসি দলের উত্থান (Post Germany : Rise of Nazism) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির চরম পরাজয়ের ফলে জার্মানির রাজ্যাং[...], ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যই হ্রাস পাইল না, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে জার্মানির মর্যাদা প্রতিপত্তি নাশ হইল। আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে এক গভীর হতাশা ও অর্থনৈতিক

দুরবস্থা দেখা দিল। এমতাবস্থায় দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল। দেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। সম্রাট কাইজার উইলিয়াম যুদ্ধে পরাজয়ের সময় হইতে ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন। আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দেখা দিলে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির রাজতন্ত্রের অবসান হইল। জার্মানি একটি প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। সাময়িকভাবে 'কাউন্সিল-অব-পিপল্‌স-কমিসার' (Council of People's Commissar) নামে এক কার্যনির্বাহক সমিতির উপর শাসনভার ন্যস্ত হইল। এই সমিতি প্রধানতঃ সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইল। সমিতির যুগ্ম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির দুরবস্থা, কাইজারের পলায়ন—জার্মানি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত

সভাপতি হইলেন ফ্রেডারিক ইবার্ট ও হাসি। সম্রাট কাইজার উইলিয়ামের আমলের বহু সরকারী কর্মচারী তখনও কাজে বহাল রহিলেন। একমাত্র কমিউনিস্ট্ দল এই নবগঠিত সরকারের সহিত সহযোগিতায় রাজী হইল না। জার্মানির কমিউনিস্ট্‌গণ 'স্পার্টাকাস্' (Spartacus) নামে পরিচিত ছিল। নবগঠিত সরকার জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া চলিতে অনুরোধ জানাইলেন। দেশের স্থায়ী শাসনব্যবস্থা জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এই আশ্বাসও দেওয়া হইল। 'স্পার্টাকাস্' দল তাহাদের নেতা [illegible] লিবনেকৃট্ (Liebnecht)-এর অধীনে পূর্ণমাত্রায় কমিউনিজম্ প্রবর্তনের [illegible] সমাজতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহিলে ইবার্ট [illegible]দিগকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। লাইবনেকৃট্-এর প্রধান সহচর [illegible] রোসা লাক্সেমবুর্গ। তাঁহারা এক সশস্ত্র আন্দোলন চালাইতে গিয়া [illegible] এবং সরকার কর্তৃক ধৃত হইলেন এবং জেলখানায় লইয়া যাওয়ার পথে বিরোধী পক্ষের উত্তেজিত সমর্থকগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। এইভাবে 'স্পার্টাকাস্' দল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা বিফল হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই [illegible]রী এক সপ্তাহ গোলযোগের পর স্পার্টাকাস্‌দের পতন ঘটিলে ১৯শে তারিখ জাতীয়-সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল।

সমাজতান্ত্রিক শাসন স্থাপন

[illegible]'স্পার্টাকাস্' [illegible] দলের [illegible] সকল [illegible]

সমগ্র জার্মানি ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মোট ৩২ কোটি নাগরিকদের মধ্যে মোট ৩ কোটি স্ত্রী-পুরুষের ভোটে জাতীয় প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইলেন। মোট ৪২১টি আসনের মধ্যে 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক' ১৬৩টি আসন লাভ করিল, সেন্ট্রিস্ট্ বা খ্রীষ্টান ডিমোক্র্যাট্স্ ৮৮, ডিমোক্রেটিক দল ৭৫, ন্যাশন্যালিস্ট্ দল ৪২, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ দল ২২ এবং পিপ্ল্স্ পার্টি ২১টি আসন প্রাপ্ত হইল। বাকি দশটি আসন অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের অধিকারে আসিল। স্পার্টাকাস্ দল নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ করিল না।

জাতীয় সভার গঠন

এই জাতীয় সংবিধান সভা উইমার (Weimar) নামক স্থানে অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া জার্মানির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করিল। এই সংবিধান পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং উইমার অধিবেশনে উহা গৃহীত হইতে অধিক সময় লাগিল না। এই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন স্থির হইল। একটি দুই কক্ষ-যুক্ত পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে। ঊর্ধ্ব কক্ষের নাম নাম হইল 'রাইক্-স্ট্যাডাট্' (Reichs-tadt) এবং নিম্ন কক্ষের নাম হইল 'রাইক্স্ট্যাগ্' (Reichstag)। ঊর্ধ্ব কক্ষ জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইবে আর নিম্ন কক্ষের সদস্য প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটে নির্বাচিত হইবেন ফ্রেডারিক ইবার্ট (Friedr Ebert) এই শাসনব্যবস্থায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন।

উইমার সভার কার্যাদি :

ীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ : ইবার্ট প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

উইমার জাতীয় সভার দ্বিতীয় সমস্যা ছিল মিত্রপক্ষের সহি সম্পাদান করা সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উইমা সভা সন্ধির শর্তাদি অনুমোদন করিয়া মিত্রপক্ষের সহিত পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন।

ভার্সাই-এর সন্ধি স্থাপন

জাতীয় সভার অপর সমস্যা ছিল বিরোধী দলগুলিকে দমন করা। ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলির কঠোরতা এবং মিত্রপক্ষের হস্তে জার্মান জাতির অসীমা ও জার্মানির সর্বত্র এক ব্যাপক বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ সার উপত্যকা (Saar Valley) সাময়িকভাবে জার্মানির

হস্তচ্যুত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। স্বভাবতই তাহারা ইবার্টের শাসনের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানির দেশপ্রেমিক সৈনিক সম্প্রদায় জার্মান সাম্রাজ্য বিলুপ্তি সহ্য করিতে রাজী ছিল না; ফলে, নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটাইবার গোপন ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর উল্‌ফ্‌গ্যাং ক্যাপ্ (Dr. Wolfgang Kapp) এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লুডেনড্রফ্ (General Ludendroff) বলপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন। এই উভয় চেষ্টাই বিফল হইযাছিল।

উল্‌ফ্‌গ্যাং ও লুডেন-ড্রফের বিফলতা

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহাত্মক কার্যাদি দমন ভিন্ন বিজেতা শক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানির উপর যে এক বিশাল ক্ষতিপূরণের ভার চাপান হইয়াছিল তাহার সংস্থান করা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা ছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির উপর যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মোট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব চাপান হইয়াছিল। এইরূপ অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অযৌক্তিকতা এবং উহা দিবার অক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়াও জার্মানির কোন ফল হইল না। ফলে, সামান্য কিছু অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার পরই জার্মানি অক্ষমতা হেতু ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করিল। ফ্রান্স জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানির রুহ্‌র (Ruhr) অঞ্চল দখল করিল। এই সূত্রে ঐ অঞ্চলে এক ব্যাপক ধর্মঘট ও অরাজকতার সৃষ্টি হইল। রুহ্‌র অঞ্চল ছিল জার্মানির সর্বাপেক্ষা অধিক শিল্পোন্নত অঞ্চল। ফ্রান্সের রুহ্‌র অঞ্চল দখলের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ এই অঞ্চলের কারখানাসমূহ বন্ধ হইয়া গেলে জার্মানির জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। এই জাতীয় সঙ্কটে স্ট্রেসিম্যান (Stresemann) নামে একজন বিচক্ষণ জার্মান নেতা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্মঘট প্রভৃতি বন্ধ করিয়া কলকারখানা পুনরায় চালু করাইলেন। এদিকে জার্মানির নিকট হইতে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে এবং কিভাবে তাহা আদায় করা হইবে সেই প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য ব্রিটিশ, ফরাসী, ইতালীয় ও বেলজিয়ান সরকার একটি 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' (Reparation Commission) স্থাপন করিলেন। মার্কিন সরকারও এই কমিশনে যোগদান

জার্মানির পক্ষে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা

ফ্রান্স কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল

ক্ষতিপূরণ কমিশন: 'ডাওয়েস্ প্ল্যান'

করিতে স্বীকৃত হইলেন। চার্লস্ ডাওয়েস্ (Charles Dawes) নামে একজন মার্কিন অর্থনীতিক এই কমিশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই কমিশন 'ডাওয়েস্ প্ল্যান' (Dawes Plan) নামে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। ইহাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অল্প অল্প কিস্তিতে জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল। জার্মানি ডাওয়েস্ প্ল্যান গ্রহণ করিলে ফরাসী সৈন্য রুহ্‌র্ অঞ্চল ত্যাগ করিল।

রুহ্‌র্ হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ

জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমা নির্ধারণ লইয়া তখনও আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। ফ্রান্স ভবিষ্যতে জার্মানির আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'লোকার্ণো চুক্তি' (Locarno Pact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। এই সমস্যার সমাধানের ফলে জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেই জার্মান রাষ্ট্রপতি ইবার্টের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার স্থলে হিণ্ডেনবুর্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

লোকার্ণো চুক্তি (১৯২৫): জার্মানি-বেলজিয়াম, জার্মানি-ফ্রান্সের সীমা নির্ধারণ

জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতকটা শান্ত হইলেও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে জার্মানির অবস্থা দিন দিনই দুর্দশার চরমে পৌঁছিতেছিল। ডাওয়েস্ প্ল্যান অর্থনৈতিক বিষয়ে জার্মানির কতকটা সুবিধা করিয়া দিলেও ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ জার্মানির অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধন না করিয়া আদায় করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইযাই জার্মানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ-হ্রাসের দাবি জানাইল। মিত্রপক্ষ (The Allies) আওয়েন ইয়ং (Owen Young) নামে একজন অর্থনীতিকের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। এই কমিশনেরও দায়িত্ব ছিল জার্মানি হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সমস্যার সমাধান করা। আওয়েন কমিশন ক্ষতি-পূরণের পরিমাণকে (১) অবশ্য দেয় এবং (২) পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থগিত রাখা যাইতে পারে—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন জার্মানিকে দীর্ঘ ৫৯ বৎসর ধরিয়া কিস্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিবার সুযোগ দেওয়া হইল এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে জার্মানির উপর কোনপ্রকার বিদেশী পরিদর্শন-

আওয়েন ইয়ং প্ল্যান

ব্যবস্থা থাকিবে না এই সুপারিশও করা হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইয়ং প্ল্যান কার্যকরী হইল এবং জার্মানি মার্কিন সরকারের নিকট হইতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণের কিস্তি দিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র এক ব্যাপক অর্থনৈতিক অবনতি (Economic depression) দেখা দিলে মার্কিন সরকার জার্মানিকে ঋণদানে অক্ষমতা জানাইলেন। ফলে, জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই অর্থনৈতিক অক্ষমতার জন্য জার্মানির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইল।

অর্থনৈতিক অবনতি : জার্মানির ক্ষতিপূরণ দান বন্ধ

জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা : নাৎসিদলের উত্থান (Economic prostration of Germany : Rise of Nazism) :

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জার্মানির আর্থিক দুর্দশা অপরাপর দেশ অপেক্ষা বহুগুণে বেশি ছিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশার সীমা ছিল না। এইরূপ অবস্থায় যে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জনসাধারণের দুর্দশার সুযোগে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যের প্রভাব সহজেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সময়ে এডলফ্ হিট্‌লার নামে একজন প্রাক্তন সৈনিক ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ বা নাৎসি (National Socialist or Nazi) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। জনসাধারণের চরম দুর্দশার সুযোগ লইয়া হিট্‌লার ও তাঁহার অনুচরবর্গ সহজেই নাৎসি দলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। জনসাধারণ তখন যে-কোন প্রচারকার্যেই কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার লুডেনড্রফ্-এর সহযোগিতায় বলপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হয় এবং হিট্‌লার ও তাঁহার অনুচরদের অনেকে কারারুদ্ধ হন। কারাবাসেই হিট্‌লার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেঁই ক্যাম্ফ্' (Mein Kampf) রচনা করেন।

অর্থনৈতিক দুর্দশা : নাৎসি দলের সৃষ্টি

হিট্‌লারের শাসন-ক্ষমতা লাভের চেষ্টা ব্যর্থ

নাৎসি দলের সদস্য-সংখ্যা এদিকে দিন দিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নাৎসি দলের সমর্থক-সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ঐ বৎসরের সাধারণ নির্বাচনে নাৎসি দলের প্রতিনিধিগণ রাইকৃস্ট্যাগ্-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হন। ফলে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ হিট্‌লারকে চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হন। ইহার অল্পকাল পরে হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিট্‌লার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট উভয় পদই স্বয়ং গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি ক্রমেই নিজ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ ও সর্বাত্মক করিয়া তুলিতে থাকেন। তিনি জাতির প্রতিনিধি-সভা রাইকৃস্ট্যাগকে শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিতে সম্মত করান। ফলে, হিট্‌লার জার্মানির শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে সমর্থ হন। তিনি জার্মানির 'ফুহ্‌রার' (Fuhrer) বা প্রধান নেতার উপাধি ধারণ করেন।

রাইক্‌স্ট্যাগে নাৎসি দলের সংখ্যাধিক্য : হিট্‌লার চ্যান্সেলর-পদে নিযুক্ত

হিট্‌লারের সর্বাত্মক ক্ষমতা লাভ

হিট্‌লার ছিলেন ইহুদি ও কমিউনিস্ট্-বিরোধী। এই দুইয়ের উপর তিনি গোপনে নানাপ্রকার অকথ্য অত্যাচার চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হইয়া বহু ইহুদি জার্মানি ত্যাগ করিয়া অপরাপর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন্‌স্টাইনও ইহুদি-বিতাড়নের বর্বরতা হইতে রক্ষা পান নাই। কমিউনিস্ট্‌গণকেও অনুরূপ নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। হিট্‌লারের আদেশে মার্কস্‌বাদের প্রচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিতে হইয়াছিল, শ্রমিকদের ট্রেড্ ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং কমিউনিস্ট্‌পন্থীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। দেশে নিজ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও সর্বাত্মক করিয়া তুলিবার জন্য হিট্‌লার নিজ দলের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভিন্ন মত পোষণ করিতেন তাহাদিগকে হয় কয়েদ করিলেন নতুবা দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন। এইভাবে তিনি নিজ ক্ষমতাকে জাতীয় জীবনের প্রতিস্তরে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন।

ইহুদি ও কমিউনিস্ট দমন

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে হিট্‌লার চাহিয়াছিলেন সমগ্র জার্মান জাতিকে অধিকতর সংহতিসম্পন্ন করিতে এবং জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন সাধন করিতে। এইজন্য তিনি প্রথমে প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সভা বা ডায়েট (Diet) উঠাইয়া দিয়া শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করিলেন। সমগ্রদেশের

দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণ

শাসনভার নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে মনোযোগ দিলেন। তিনি শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি প্রভৃতি সবকিছুর উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল, পশম, রবার প্রভৃতি প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় আবিষ্কৃত হইল। দেশের কাঁচামাল যাহাতে কোনভাবে নষ্ট না হইতে পারে সেজন্য কাঁচামালের রেশনিং (Rationing) ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংখ্যা বাড়াইয়া একদিকে যেমন দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হইল তেমনি অপরদিকে দেশের বেকার-সমস্যা বহুপরিমাণে লাঘব করা হইল।

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া হিট্‌লার ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন। জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলমাত্রকেই তিনি জার্মানির সহিত সংযুক্ত করিতে চাহিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করায় জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Disarmament Conference হইতে জার্মানি বাহির হইয়া আসে এবং লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্যপদ ত্যাগ করে। Disarmament Conference-এ ফ্রান্স জার্মানির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জার্মানি অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিবার দাবি করে, অপর দিকে ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য জার্মানি অন্ততঃ ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিতে চাহে। এই সূত্রে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে জার্মানি এই সম্মেলনের অধিবেশন ত্যাগ করে। ইহার অব্যবহিত পরে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া জার্মানি নিজ ইচ্ছামত সামরিক শক্তি-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। জার্মানিতে সামরিক বৃত্তি পুনরায় বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সকল কার্য হইতেই জার্মানির ভবিষ্যৎ পন্থা কি হইবে ধারণা করা যায়।

Disarmament Conference ও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স ত্যাগ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি অমান্য করিয়া রাইন অঞ্চলটি দখল করিয়া লইলেন। এইভাবে ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তভঙ্গের পরও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দিক হইতে কোন তীব্র প্রতিবাদ হইল না দেখিয়া হিট্‌লার তাঁহার রাজ্যগ্রাস নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক রাইন অঞ্চল দখল (১৯৩৬)

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে কমিউনিস্ট্ প্রভাব-বৃদ্ধি প্রতিহত করিবার জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কো (General Franco) কমিউনিস্ট্-বিরোধী এক বিদ্রোহ সৃষ্টি করেন। স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার ছিলেন কমিউনিস্ট্-প্রভাবিত। সুতরাং কমিউনিস্ট্ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ব্যক্তিমাত্রেই স্পেনীয় সরকারের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ফ্যাসিস্ট্ ইতালি ও নাৎসি জার্মানি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো স্পেনীয় সরকারের সহিত অন্তর্যুদ্ধে জয়ী হইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ স্বৈরাচারী এক অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্র এই দুই প্রকার রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বস্বরূপ ছিল। এই দ্বন্দ্বে স্বৈরতন্ত্রের জয় হওয়ায় হিট্‌লার ও মুসোলিনির সমর্থক আর একটি তৃতীয় শক্তির সৃষ্টি হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঐ সময়ে মতানৈক্য থাকায় এই দুইয়ের কেহই স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে কোন পক্ষকেই সমর্থন করিল না।

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ

হিট্‌লার ও মুসোলিনির নীতির জয়লাভ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অপর একটি বিশেষ ঘটনা হইল জার্মানি ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপন। জার্মানি জাপানের সহিত এক কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করে। পর বৎসর (১৯৩৭) ইতালি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলে জার্মানি-জাপান-ইতালি এই তিন দেশের মধ্যে এক মৈত্রী স্থাপিত হইল। বিরুদ্ধ পক্ষে তখন ছিল ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ড।

জার্মানি-জাপান-ইতালি মৈত্রী

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার জার্মানির সামরিক শক্তির সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং জার্মানির শক্তি-শকট চালনায় তাঁহার আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। সামরিক নেতৃবৃন্দমাত্রেই তাঁহার প্রাধান্যাধীনে স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছামত রাজ্যগ্রাস নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। ঐ বৎসরই হিট্‌লারের ইঙ্গিতে অস্ট্রিয়ার নাৎসি দলভুক্ত ব্যক্তিগণ এক দারুণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে

হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল

হিট্‌লার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর সুচ্‌নিগ্‌ (Schuschnigg)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে নাৎসি দলভুক্ত অস্ট্রিয়ানদের মধ্য হইতে কয়েকজন মন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। সুচ্‌নিগ্‌ হিট্‌লারের প্রস্তাবে রাজী হইলেন, কিন্তু অস্ট্রিয়া তাহাতেও জার্মান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল না। অল্পকালের মধ্যেই হিট্‌লার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের কালে হিট্‌লার ইঙ্গ-ফরাসী দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি ভার্সাই-এর শর্ত ভঙ্গ করিয়া অস্ট্রিয়া দখল করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক সুদেতেন অঞ্চল দাবি

অস্ট্রিয়ার পর হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল ছিল জার্মান-অধ্যুষিত। হিট্‌লার ঐ অঞ্চলে তাঁহার 'পঞ্চম বাহিনী' (Fifth column) অর্থাৎ অর্থভোগী গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে জার্মানির সহিত সংযুক্তির এক দারুণ আন্দোলন শুরু করাইলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে হিট্‌লার সুদেতেন অঞ্চল (Sudeten land) জার্মানির সহিত সংযুক্তি দাবি করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি আরও দুই দিক হইতে আসিল। দানিউব নদীর তীরবর্তী দশ লক্ষ ম্যাগিযার হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিল। পূর্ব-দিকে পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে টেশেন (Teschen) দাবি করিল। এমতাবস্থায় হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার সীমায় সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলে চেকোস্লোভাকিয়া সরকার ফ্রান্সের সহায়তা চাহিলেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয় দেশই প্রয়োজনবোধে চেকো-স্লোভাকিয়াকে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইলে এক বিরাট যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের শান্তি-প্রচেষ্টা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিলি চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) ইওরোপে শান্তিরক্ষার্থে জার্মানির মিউনিক্ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া হিট্‌লারের সহিত সুদেতেন সমস্যা সম্পর্কে আপোষের আলোচনা করিলেন। চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার (Daladiar) তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। উভয় প্রধানমন্ত্রী চেকোস্লোভাকিয়া সরকারকে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট ত্যাগ করিতে

সম্মত করাইলেন।* ইঙ্গ-ফরাসী এই তোষণ নীতি হিট্‌লারের দাবি আরও বাড়াইয়া দিল। তিনি সুদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। এই অবস্থায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্থির করিল যে, জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্যদান করিবে। চেম্বারলেন শান্তিরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে মুসোলিনির নিকট মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মুসোলিনির চেষ্টায় হিট্‌লার, চেম্বারলেন, দালাদিয়ার ও মুসোলিনির এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে চেকেস্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিরূপণ করা হইতেছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়া সরকারের কোন প্রতিনিধিকে উহাতে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। হিটলার সুদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সন্তুষ্ট থাকিবেন এই প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। এই বৈঠকের মীমাংসা-সম্বলিত একটি দলিলও প্রস্তুত হইল। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার ইওরোপে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসহ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। ফলে চেকোস্লোভাকিয়া সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ড কর্তৃক টেশেন দাবিও চেকোস্লোভাকিয়াকে মানিতে হইল। দক্ষিণ দিকে ম্যাগিয়ার-অধ্যুষিত অঞ্চলটিও হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইল। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্য বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

হিট্‌লারের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা

মুসোলিনির মধ্যস্থতায় মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮)

চেকোস্লোভাকিয়ার

মিউনিক্ চুক্তিকে (Munich Pact) ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক পরাজয় ভিন্ন কিছু বলা যায় না। আর এই চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়াকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তির একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সামরিক প্রস্তুতির সময়লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

মিউনিক্ চুক্তি: ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক পরাজয়

মিউনিক্ চুক্তি মানিয়া চলা হিট্‌লারের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি চেক্-শাসনাধীন অবশিষ্ট প্রায় আড়াই লক্ষ জার্মানদের নিরাপত্তার অজুহাতে চেকো-

*"This involved cession of a considerable area inhabited by Sudeten Germans which Chamberlain described later as a drastic but necessary surgical operation." International Relation between the two World wars, E. H. Carr, p. 270.

স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট হ্যাচা-কে (Hacha) এক বৈঠকে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া তিনি হ্যাচাকে বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া নামক প্রদেশ দুইটি, অর্থাৎ চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ, জার্মানির রক্ষণাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়া এইভাবে জার্মানির কবলে আসিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার

হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্র্যাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল (Memel) দখল করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ডান্‌জিগ্‌ বন্দরটি দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অবশিষ্টাংশের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য একখণ্ড জমি (Corridor) দাবি করিলেন।

মেমেল দখল, পোল্যাণ্ড হইতে ডান্‌জিগ্‌ ও একখণ্ড সংযোজক ভূমি দাবি

হিট্‌লারের মিউনিক্‌ চুক্তি-ভঙ্গ এবং তাঁহার অপরিতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে হিট্‌লার-তোষণ নীতি পরিত্যাগে বাধ্য করিল। পোল্যাণ্ড জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিবে স্থির হইল। পোল্যাণ্ড হিট্‌লারের দাবি অগ্রাহ্য করিলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

পোল্যাণ্ড কর্তৃক হিট্‌লারের দাবি অগ্রাহ্য: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

স্পেন (Spain)

স্পেন : একক অধিনায়কত্বের উত্থান (Spain : Rise of Dictatorship) :

সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে স্পেনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক ব্যাপক অরাজকতা, দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা দেখা দিল। নিত্য-ব্যবহারের জিনিসপত্রের দাম জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠিল। তদুপরি অন্যায়ভাবে করভার-বণ্টনের ফলে সাধারণ শ্রেণীর লোকের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর সরকারী

স্পেনের দুরবস্থা

নিয়ন্ত্রণ এবং অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের একদেশদর্শিতা রাজনৈতিক অবস্থারও চরম অবনতি ঘটাইল।

এইরূপ অবস্থায় ক্রমেই স্পেন যখন অতিশয় দুর্বল দেশে পরিণত তখন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার হস্তে পরাজিত হইয়া আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলিও স্পেন হারাইল। ১৮৯৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসর স্পেনের জাতীয় জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অরাজকতা, ধর্মাধিষ্ঠানের উপর আক্রমণ, পুলিশের অত্যাচার, ধর্মঘট, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ব্যাপকভাবে দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা লইয়া স্পেনীয়দের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ত্রয়োদশ আল্‌ফোন্‌সো (Alfonso XIII) তখন স্পেনের রাজা (১৮৮৬-১৯৩১)। আল্‌ফোন্‌সোর মাতা ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান রাজকন্যা, অপর দিকে, তাঁহার স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ রমণী। এমতাবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আল্‌ফোন্‌সোর পক্ষে সহজ ছিল না। রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদী স্পেনীয়গণ মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া-জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। ইংলণ্ড কর্তৃক জিব্রাল্টার অধিকার করিয়া রাখা স্পেনীয়দের ইংরেজ-বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ ছিল। অপরাপর অনেকে মিত্রপক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। এইভাবে মতানৈক্য দেখা দিলে স্পেনীয় পার্লামেণ্ট যুদ্ধে (Cortes) নিরপেক্ষ থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। নিরপেক্ষ থাকিবার ফলে যুদ্ধরত শক্তিবর্গ নানাপ্রকার যুদ্ধসামগ্রী স্পেন হইতে ক্রয় করিতে লাগিল এবং যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্পেনের রপ্তানি-বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত হইল।

আমেরিকার হস্তে স্পেনের পরাজয় (১৮৯৮)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেনের নিরপেক্ষতা অবলম্বন : অর্থনৈতিক উন্নতি

কিন্তু স্পেনের রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিভেদ তখনও লাগিয়া রহিল। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের ফলে দেশের শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। যুদ্ধোত্তর পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট দশটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল এবং দশটিরই পতন ঘটিয়াছিল। এই শাসনতান্ত্রিক অবস্থার মূল কারণ ছিল (১) শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের ইচ্ছা, (২) শাসনব্যবস্থায় সামরিক নেতৃ-

রাজনৈতিক অব্যবস্থা

বর্গের হস্তক্ষেপ, (৩) স্পেনীয় মরোক্কো-র বিদ্রোহ এবং (৪) বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের স্থানীয় স্বাধীনতা লাভের মনোবৃত্তি। ক্যাটালোনিয়া নামক স্থানে এই মনোবৃত্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

ক্যাটালোনিয়াবাসিগণের স্বাধীনতা-দাবি এবং স্পেনীয় মরক্কোতে বিদ্রোহী-দের হস্তে স্পেনীয় সৈন্যের পরাজয় ক্রমেই স্পেনীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতিসহ বার হাজার স্পেনীয় সৈন্য মরক্কোর বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ হারাইলে স্পেনে এক গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। স্পেনীয় পার্লামেণ্ট মরক্কোতে স্পেনীয় সৈন্যের ব্যাপক হত্যা সম্পর্কে এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করা হইলে সরকার ইহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিলেন। পার্লামেণ্ট ও স্পেনের সংবাদপত্রগুলি রিপোর্ট প্রকাশের দাবি করিলে সরকার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিলেন। নূতন নির্বাচনের ফলে গঠিত পার্লামেণ্ট পূর্বেকার পার্লামেণ্ট-এর ন্যায়ই সরকার-বিরোধী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিল। এমন সময়ে স্পেনে ধর্মঘট, প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি দেখা দিলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন-জেনারেল প্রিমো-ডি-রিভেরা (Captain General Primo de Rivera) স্পেনের শাসন-ব্যবস্থা বলপূর্বক হস্তগত করিলেন। আটজন জেনারেল, একজন এ্যাডমিরাল ও নিজে—এই দশজন সদস্যের একটি ডিরেক্টরী তিনি স্থাপন করিলেন। রাজা আল্‌ফোন্‌সোর অনুমতিক্রমেই এই সামরিক Coup d'etat সম্পাদন করা হইয়াছিল।

মরক্কোয় বার হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ : ব্যাপক বিক্ষোভ

প্রিমো-ডি-রিভেরা কর্তৃক শাসনক্ষমতা গ্রহণ

প্রিমো-ডি-রিভেরার একক-অধিনায়কত্ব (Dictatorship of Primo de Rivera) :

১৯২৩-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রিমো-ডি-রিভেরা স্পেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই তিনি স্পেনীয় পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির সাহায্যে বিচার, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি সব কিছু তিনি উঠাইয়া দিয়া এক কঠোর শাসনব্যবস্থা চালু করিলেন। সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন।

তাঁহার শাসননীতির মূল কথা ছিল: 'দেশ, রাজতন্ত্র ও ধর্ম ('Country, Monarchy, Religion')। স্পেনীয় জনসাধারণ রিভেরা-প্রবর্তিত একক-অধিনায়কত্বের (Dictatorship) প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিল না। তাহারা এই একক-অধিনায়কত্ব এবং রাজতন্ত্র উভয়েরই অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করিলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রিভেরা জনমতের সমর্থন লাভের জন্য সামরিক আইনের (Martial Law) প্রয়োগ উঠাইয়া দিলেন। তিনি সমুদ্রবাহী বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য-পোত নির্মাণের জন্য সরকারী সাহায্য দান করিতে লাগিলেন।

রিভেরার নীতি: 'দেশ, রাজতন্ত্র ও ধর্ম'

শিল্পের উন্নতির জন্য প্রাচীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি-বিধান, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নয়নমূলক কার্যেরও তিনি উৎসাহ দিলেন। শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও ধর্মঘট ইত্যাদির মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হইল। ক্যাটালোনিয়াবাসীদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উৎপাদিত শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশী আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ন্যাশনাল এ্যাডভাইসরী এ্যাসেম্বলী (National Advisory Assembly) নামে একটি জাতীয় সভা স্থাপন করিলেন।

রিভেরা সরকারের কার্যাদি

পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও দৃঢ় ও মর্যাদাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা হইল। (১) ইতালির সহিত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করা হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্পেন ও ইতালির মধ্যে যে কোন একটি তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর শক্তি সাহায্য-মূলক নিরপেক্ষতা (benevolent neutrality) অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল। (২) স্পেনকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কাউন্সিল-এ স্থায়ী সদস্যপদ না দেওয়ায় স্পেন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স ত্যাগ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। (৩) মরক্কো পরিস্থিতিও আয়ত্তাধীনে আসিল।

রিভেরার পররাষ্ট্রীয় নীতির সাফল্য

কিন্তু উপরোক্ত দক্ষতা প্রদর্শন করিলেও রিভেরার শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ হ্রাস পাইল না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলন্দাজবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঐ বৎসরই ক্যাটালোনিয়ায় এক স্বাধীন সরকার স্থাপনের চেষ্টা চলিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রিভেরাকে পদচ্যুত করিবার এক ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইল। ইহার পর হইতে গোলন্দাজ-

রিভেরার পদত্যাগ

বাহিনীর বিদ্রোহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন, ব্যাপক অরাজকতা প্রভৃতির ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রিমো-ডি-রিভেরা পদত্যাগ করিলেন।

রাজা আল্‌ফোন্‌সো কর্তৃক জাতীয় সমর্থন লাভের চেষ্টা

রাজা আল্‌ফোন্‌সো ও তাঁহার নবগঠিত মন্ত্রিসভা স্পেনবাসীর সমর্থন লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ন্যাশনাল এ্যাডভাইসরী এ্যাসেম্বলী ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় পার্লামেণ্টের নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হইল। রিভেরার আমলে যে সকল অন্যায়-অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করা হইল। কিন্তু এই সকলের ফলেও দেশে প্রজাতান্ত্রিক মনোবৃত্তির উপশম হইল না। 'রাজতন্ত্রের পতন হউক!' ধ্বনি দেশের সর্বত্র উত্থিত হইতে লাগিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্র সেনাবাহিনীর অধিকাংশের আনুগত্য, জমিদার শ্রেণীর সহায়তা, ক্যাথলিক চার্চের সহায়তা এবং প্রজাতান্ত্রিক-বিপ্লবের পক্ষপাতী দলের আভ্যন্তরীণ বিভেদের দরুণই কোনক্রমে রক্ষা পাইল। কিন্তু পর বৎসর (১৯৩১ খ্রীঃ) সাধারণ নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধিগণ প্রায় সর্বত্রই জয়ী হইলেন। ইহা ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলও প্রতিনিধি-নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিল। ফলে প্রজাতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কিন্তু এই বৎসরই আকস্মিকভাবে রাজা আল্‌ফোন্‌সোকে বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। ফলে স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রাধান্য : আল্‌ফোন্‌সোর পদত্যাগ

নূতন অস্থায়ী সরকার (Provisional Govt.) ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সংবিধান সভার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, চার্চের সংস্কার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নূতন সরকারকে শাসন-পরিচালনার সুযোগ দিতে স্বীকৃত হইল। কেবল মাত্র প্রজাতন্ত্রবিরোধী রাজতন্ত্রীদল এবং কমিউনিস্ট্‌গণ অরাজকতার সৃষ্টি করিতে চাহিলে সরকার বলপূর্বক ইহাদের দমন করিলেন।

অস্থায়ী সরকারের কার্যকলাপ

অপর দিকে ক্যাটালোনিয়াবাসীদিগকে জাতীয় ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে এইরূপ কোন কিছু না করিতে অনুরোধ জানান হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে-ই সংবিধান সভা তথা পার্লামেণ্টের

সংবিধান সভা নির্বাচন

নির্বাচন হইল। রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট্ প্রভৃতি পঁচিশটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল। কিন্তু নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেন এবং রাজতান্ত্রিকগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন।

অস্থায়ী সরকারের পরিচালক নিসেটো জামোরা (Niceto Zamora) স্পেনের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ, সরকারী কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ধর্মবিষয়ে স্পেনীয় সংবিধান সভা জেস্যুইট্ যাজকদের বহিষ্কার, রাষ্ট্রীয় ধর্মের (State religion) অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এই নীতির অবসান করিলে জামোরা প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন। ইহার পর ম্যানুয়েল আজানা (Manuel Azana) প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন। পার্লামেন্ট ভূতপূর্ব রাজা আল্‌ফোন্‌সোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিল এবং রাজার স্পেনে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ বৃহৎ ভূসম্পত্তি, শিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্র-আয়ত্তে আনা হইল। ক্ষতিপূরণ দান করিয়া যে-কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাইবে এই নীতি গ্রহণ করা হইল। সমাজের ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রম অবশ্য করণীয় এই ধারণার সৃষ্টি করা হইল। শ্রমিক, কৃষক, মৎস্যজীবী সকলকেই রাষ্ট্র রক্ষা করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইভাবে স্পেন ক্রমেই এক সমাজ-তান্ত্রিক দেশে পরিণত হইতে চলিল। স্পেনীয় সংবিধান সভা নিসেটো জামোরা (Niceto Zamora)-কে পুনরায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিল। ম্যানুয়েল আজানা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান সভা-ই স্পেনের পার্লামেন্টে পরিণত হইল। স্পেনীয় পার্লামেন্টের সাধারণ পরিদর্শনাধীনে ক্যাটালোনিয়াকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা এবং নিজস্ব প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইল।

সংবিধান সভার কার্যাদি

জামোরা প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকিলেও রাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট্, ফ্যাসিস্ট্ প্রভৃতি বিভিন্ন দল সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ বা খণ্ডযুদ্ধ শুরু করিতে নিরস্ত হইল না। ক্যাটালোনিয়াও

স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং বাস্ক্ প্রদেশ স্পেন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করিল। স্পেনীয় সরকার সামরিক সাহায্যে বহু রক্তপাতের এবং অর্থব্যয়ের ফলে সাময়িক-ভাবে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইলেন। ক্যাটালোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনাধিকার বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। এই সময়ে আলেজাণ্ড্রো লেরোক্স্ (Alejandro Lerroux) ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভার দুর্বলতা এবং মন্ত্রিগণের ঘন ঘন পরিবর্তন কোন স্থায়ী শাসননীতি গ্রহণের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া প্রেসিডেন্ট জামোরা পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন (১৯৩৫) এবং এক নূতন সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিলেন।

১৯৩৩-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যবস্থা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন নির্বাচন

নূতন পার্লামেন্টে বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য স্থাপিত হইল। আজানা এই বামপন্থীদের সম্মিলিত দলের প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হইলেন। আজানা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং ক্যাটালোনিয়ায় স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। সত্তর হাজার কৃষকদের জমির মালিকানা দেওয়া হইল। কিন্তু অবশিষ্ট কৃষকগণ আর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে রাজী হইল না। তাহারা বলপূর্বক জমিদারের ভূসম্পত্তি দখল করিতে লাগিল। উগ্র বামপন্থিগণ রাজতান্ত্রিকদের সম্পত্তি, চার্চ, কন্ভেণ্ট্ প্রভৃতি আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রেসিডেন্ট জামোরাকে বামপন্থী-বিরোধী মনোভাবের জন্য অপসারণ করা হইল। আজানা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন আর ক্যাসারে কুইরোগা (Casares Quiroga) প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই (১৯৩৬) স্পেনে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে এক দারুণ বিদ্বেষ দেখা দিল। বামপন্থী সরকার পক্ষ ফ্যাসিস্ট্বাদে বিশ্বাসী অনেককে কয়েদ করিলেন। ক্রমে সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজনীতিতে কোনপ্রকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ সামরিক কর্মচারিগণকে সরকার অবসর গ্রহণে বাধ্য করিলেন। উর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারী যাঁহারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল নতুবা কোন দূরবর্তী স্থানে বদলী করা হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হইল।

নূতন পার্লামেন্টে বামপন্থীদের প্রাধান্য : জামোরার অপসারণ

আজানা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত : ক্যাসারে কুইরোগা প্রধানমন্ত্রী

জুলাই মাসের ১২ই তারিখে মাদ্রিদের একজন পুলিশ সার্জেন্ট—যোসিডেল ক্যাস্টিলো (Josedel Castillo)-কে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব সরকারের উপর আরোপ করা হইলে ১৭ই জুলাই মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সেই সঙ্গে স্পেনে এক দীর্ঘ অন্তর্যুদ্ধের (১৯৩৬-৩৯) সূচনা হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যানারী দ্বীপ হইতে মরক্কোয় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

ক্যাস্টিলোর হত্যা

মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় বাহিনীর বিদ্রোহ

স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট্ দেশগুলি স্পেনীয় সরকারকে সহায়তা দান করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ সম্পর্কে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিল। উভয় পক্ষই কোন প্রকার সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত হইল না। জার্মানির হিট্‌লার ও ইতালির মুসোলিনি ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য-সহায়তা দানে ত্রুটি করিলেন না। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট আজানা পদত্যাগ করিলেন। ফ্রাঙ্কো স্পেনীয় শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিলেন। হিট্‌লার, মুসোলিনির সমপর্যায়ের একটি একক-অধিনায়কত্ব স্পেনেও স্থাপিত হইল।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাফল্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯—'৪৫ (World War II):

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের সম্মেলন প্রকৃত শান্তি না আনিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধবিরতি সাধন করিয়াছিল। পরবর্তী কুড়ি বৎসর সেইহেতু শান্তির যুগ অপেক্ষা যুদ্ধবিরতির যুগ হিসাবেই বিবেচ্য। এই কয়েক বৎসরের পৃথিবীর তথা ইওরোপীয় ঘটনাবলী এক অধিকতর সর্বনাশাত্মক যুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে আগাইয়া দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতের উপশম হইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইল। অগণিত নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ ও সৈনিকের রক্তে পৃথিবী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধের বীভৎসতার দ্বিতীয় পরিচয় লাভ করিল।

১৯১৯—১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ যুদ্ধবিরতির যুগ

প্রথম এবং দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালের ঘটনাবলী প্রধানতঃ ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ভার্সাই-এর সন্ধিতেই খুঁজিতে হইবে।

(১) (ক) ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরকালে জার্মান প্রতিনিধিবর্গের প্রতি

মিত্রপক্ষের আচরণ, তাঁহাদের প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবস্থা-অবলম্বন প্রকৃত শান্তি-নীতির পরিপন্থী ছিল। জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সভাকক্ষে উপস্থিত করা এবং সভাকক্ষ হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়ার মধ্যে বিজেতা শক্তিগুলির ঔদ্ধত্যের এবং যুদ্ধ-জয়-জনিত অহঙ্কারের পরিচয় পাওয়া গেলেও বিজিতের প্রতি সহানুভূতি এবং উপযুক্ত মর্যাদা দানের দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল না। (খ) ইহা ভিন্ন জার্মান প্রতিনিধিগণকে মিত্রপক্ষ-রচিত ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি সম্পর্কে কেবলমাত্র একবার মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়া এবং তাঁহাদের মতামতের প্রায় সব কিছুই অগ্রাহ্য করিয়া স্থায়ী শান্তিস্থাপনের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কোন মন্তব্য করিবার দ্বিতীয় সুযোগ না দিয়া এবং মিত্রপক্ষ-রচিত সন্ধি গ্রহণ না করিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া জার্মানির উপর ভার্সাই-এর সন্ধি চাপান হইয়াছিল। ফলে, জার্মান জাতির মধ্যে ভার্সাই-এর সন্ধি একটি 'Dictated peace' —এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রথম হইতেই এই সন্ধি বিনাশের ইচ্ছা জার্মান জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য স্থায়ী শান্তিস্থাপনের জন্য এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল না।

ভার্সাই-এর সন্ধির ত্রুটি: (ক) জার্মানির প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবস্থা অবলম্বন

(খ) জার্মান প্রতিনিধি-বর্গের মতামত দানের স্বাধীনতা অস্বীকার 'Dictated peace'

(গ) প্যারিস সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধি মাত্রেই ন্যায্য এবং নিরপেক্ষভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও কেবলমাত্র জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যই হরণ করিয়াছিলেন। নিজ নিজ সাম্রাজ্য কেহই ত্যাগ করিবার মত উদারতা দেখান নাই। সামরিক নিরস্ত্রীকরণ নীতির ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র পরাজিত জার্মানি ও অপরাপর দেশের সামরিক শক্তি হ্রাস করিয়াই মিত্রপক্ষ ক্ষান্ত রহিলেন। এই সকল কারণে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জার্মানি অসৎ উদ্দেশ্যের অভিযোগ আনিতে পারিত, ইহা অনস্বীকার্য। (ঘ) ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিশালতাই উহা আদায়ের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। জার্মানির সম্পূর্ণ সর্বনাশ সাধন না করিয়া এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া

(গ) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণ নীতির ক্ষেত্রে জার্মানির প্রতি অবিচার

(ঘ) ক্ষতিপূরণের বিশালতা—ভার্সাই-এর সন্ধিনাশের ইঙ্গিত

সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই ভার্সাই-এর সন্ধি নাকচ করা জার্মানি ও জার্মান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল।

(২) ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলি যাহাতে বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্রিটিশ ও ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৎসরগুলিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির বৈষম্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধি সম্পাদনকালে ব্রিটেন ও আমেরিকা ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মার্কিন সরকার কর্তৃক ভার্সাই-এর সন্ধি অনুমোদিত না হইলে ফ্রান্স ইংলণ্ডের নিকট ফরাসী রাজ্যের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড এককভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। বেলজিয়াম ভবিষ্যৎ যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন নীতি অনুসরণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে।

ইঙ্গ-ফরাসী অনৈক্য

জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা

এইভাবে মিত্রপক্ষের পররাষ্ট্র-নীতির ঐক্য যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হইল, ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্নও তেমনি জটিল হইয়া উঠিল। মিত্রপক্ষের পররাষ্ট্র-নীতির বৈষম্য জার্মানির শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করিল, ফলে ফ্রান্সের ভীতি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি (Locarno Pact) স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানি ও ফ্রান্স এবং জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী সীমার নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইতালি স্বীকৃত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহাতেই ফ্রান্স ও জার্মানির পরস্পর বিরোধের শান্তি হইল না। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সে (Disarmament Conference) ফ্রান্স জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য জার্মানি অপেক্ষা আধক সামরিক শক্তি রক্ষার দাবি করে। অপর পক্ষে জার্মানি অন্ততঃপক্ষে ফরাসী সামরিক শক্তির সমপরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। এই সূত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে

মিত্রশক্তিদের মধ্যে পররাষ্ট্র-নীতির অনৈক্য

লোকার্ণো চুক্তি (১৯২৫)

নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স (১৯৩২-৩৩)

জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহার অব্যবহিত পরে জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য পদ ত্যাগ করে এবং ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। বাধ্যতামূলকভাবে সামরিকবৃত্তি গ্রহণ নীতি জার্মানিতে পুনরায় গৃহীত হয়। এই সময় হইতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয়।

জার্মানির লীগ ত্যাগ: সামরিক শক্তি সঞ্চয়

(৩) সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা যে সকল স্থান হারাইয়াছিল সেই সকল স্থান পুনরায় দখলে আনিয়া এবং জার্মান জাতির সকল লোককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্য গঠনে জার্মান ফুহ্‌রার হিট্‌লার আত্মনিয়োগ করেন। (ক) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি রাইন সীমায় নিরপেক্ষ অঞ্চল দখল করে। (খ) ইহা ভিন্ন জাপানের সহিত কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করে। অল্পকাল পরে ইতালি এই চুক্তি গ্রহণ করিলে বার্লিন-টোকিও-রোম এক্‌সিস্‌ (Berlin-Tokyo-Rome Axis) গঠিত হয়। (গ) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান করিয়া জয়ী করিলে একদিকে যেমন হিট্‌লার-মুসোলিনির একক-অধিনায়কত্বের জয় হইল অপর দিকে তেমনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের দুর্বলতাও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল। ফলে, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে হিট্‌লারের স্বৈরাচার আরও বৃদ্ধি পাইল। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধ জার্মানির ভবিষ্যৎ সামরিক পরীক্ষার মহড়ার কাজ করিল। জার্মান জাতির মধ্যেও এক গভীর আত্মপ্রত্যয় জন্মিল।

ভার্সাই-এর সন্ধির শর্ত নাকচ:

(ক) রাইন অঞ্চল দখল

(খ) বার্লিন-টোকিও-রোম এক্‌সিস্‌ গঠন

(গ) স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ফ্রাঙ্কোর সহায়তা

(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন কারণ জার্মানির নেতা হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস নীতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে। (ক) ভার্সাই-এর সন্ধির সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করিয়া হিট্‌লার অস্ট্রিয়া দখল করিলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তথা অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এ বিষয়ে নির্লিপ্ততা হিট্‌লারের ঔদ্ধত্য অসাধারণভাবে বৃদ্ধি করিল। মুসোলিনি জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া-গ্রাসের প্রতিবাদ করিলেন না কারণ তিনি আবিসিনিয়া-দখলে

হিট্‌লারের রাজ্য-গ্রাস নীতি: যুদ্ধের আসন্ন কারণ

(ক) অস্ট্রিয়া দখল

হিট্‌লারের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। (খ) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল দাবি করিলেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশই ছিল জার্মান জাতির লোক। ঐ বৎসর মিউনিক্ চুক্তি দ্বারা (Munich Pact) ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি সুদেতেন অঞ্চল জার্মানিকে দান করিতে চেকোস্লোভাকিয়াকে সম্মত করাইল। জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া আক্রান্ত হইলে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চেকোস্লোভাকিয়ার রক্ষার্থে অগ্রসর হইতে রাজী ছিল। কিন্তু মিউনিক্ চুক্তিতে ইঙ্গ-ফরাসীর জার্মান-তোষণ নীতিতে রাশিয়া স্বভাবতই সন্দিহান হইয়া উঠে।

(খ) মিউনিক্ চুক্তি—সুদেতেন অঞ্চল দখল

(গ) সুদেতেন অঞ্চল দখলের ছয় মাসের মধ্যেই হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশের উপরও আধিপত্য বিস্তার করেন। এইভাবে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতার সুযোগে হিট্‌লারের রাজ্যলিপ্সা দিন দিনই বাড়িয়া চলে। তিনি লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল (Memel) দখল করিলেন। (ঘ) তিনি পোল্যাণ্ডের ডান্‌জিগ্ বন্দরটি এবং পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অন্য অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একখণ্ড সংযোগ-ভূমি (corridor) দাবি করেন। এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একটি আত্মরক্ষামূলক পরস্পর সামরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করে। মিউনিক্ চুক্তির সময় হইতে সন্দিগ্ধ রাশিয়া ঐ সময়ে জার্মানির সহিত এক 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করে। জার্মানির পক্ষে এই চুক্তি যেমন কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক অপর পক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রপক্ষের দিক হইতে ইহা ছিল এক চরম কূটনৈতিক পরাজয়।

(গ) চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার, লিথুয়ানিয়া হইতে মেমেল দখল

(ঘ) পোল্যাণ্ড হইতে ডান্‌জিগ্ ও সংযোগ-ভূমি (corridor) দাবি

ইঙ্গ-ফরাসী-পোল চুক্তি

রুশ-জার্মান 'না-আক্রমণ চুক্তি'

এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানি পোল্যাণ্ডের উপর দাবি পূরণের জন্য চাপ দেয়। পোল্যাণ্ড এই সকল দাবি পূরণে অস্বীকৃত হইলে হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ : ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থচনা হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

Questions and Hints

1. Write a short essay on the role of the League of Nations between the two World Wars. (C. U. 1956, 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : যুদ্ধের বীভৎসতা মানুষের মনে সাময়িক-ভাবে শান্তির স্পৃহা জাগরিত করে সত্য, কিন্তু কিছুকাল পরই মানুষ যুদ্ধের জন্য পুনরায় মাতিয়া উঠে। এই সামযিক শান্তিস্পৃহা হইতেই নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কনসার্ট-অব্-ইওরোপের স্থষ্টি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন (১৮৫৬), ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন কংগ্রেস ইওরোপ মহাদেশকে যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও ব্যাপকতার ফলে লীগ-অব-ন্যাশন্সের স্থষ্টি হইয়াছিল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের সনির্বন্ধতায়ই এই আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠানটি জন্মলাভ করিয়াছিল। (২) লীগের উদ্দেশ্য : লীগ কভেনাণ্ট—আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা, পরস্পর-বিবাদে মধ্যস্থতা গ্রহণ, কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন; (৩) লীগের সংগঠন (সংক্ষেপে)—সাধারণ সভা, কাউন্সিল ও দপ্তর, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ ; (৪) লীগের কার্যাদি : কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট—যথা নিকারাগুয়ার অভিযোগ, চীনের অভিযোগ, ইঙ্গ-মিশরীয় দ্বন্দ্ব—তথাপি বহুক্ষেত্রে যুদ্ধ-সম্ভাবনা দূর করিতে লীগের কার্যকারিতা : (ক) ইরাক-তুরস্ক দ্বন্দ্ব, (খ) গ্রীস-বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্ব, (গ) লিথুয়ানিয়া-পোল্যাণ্ডের বিবাদ, জেনিভা প্রটোকোল গ্রহণের চেষ্টা, লোকার্ণো চুক্তি—জার্মানির সদস্যপদ লাভ, (ঘ) সুইডেন-ফিন্ল্যাণ্ডের বিবাদ, জার্মানি-পোল্যাণ্ডের বিবাদ, সার্বিয়া-আল্বানিয়ার বিবাদ প্রভৃতির মীমাংসা, ম্যাণ্ডেটস্গুলির শাসন-পরিচালনা, ডান্জিগ্, সার, বস্ফোরাস্ ও দার্দানেলিস অঞ্চলের নিরপেক্ষতা রক্ষা, ক্রীতদাস-ব্যবসা রোধ, শ্রমিক সমস্যা সমাধান, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বহুসংখ্যক অভিযোগের বিচার, (ঙ) সামরিক নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা ; (৫) বিফলতা : কারণ : (ক) পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, (খ) জাতীয় স্বার্থের সংঘর্ষে আন্তর্জাতিক স্বার্থনাশ, (গ) কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা (ঘ) লীগের

সামরিক শক্তির অভাব, (ঙ) সদস্য রাষ্ট্রগুলির আন্তরিক সহায়তার অভাব। ৩৪১-'৪৮ পৃষ্ঠা]

2. Give an account of the Russian Revolution, 1917. (C. U. Hons. 1956, 1959)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। (২) রুশ-বিপ্লবের কারণ : (ক) রাজনৈতিক : জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা—দ্বিতীয় নিকোলাসের দুর্বলতা—রাণী আলেকজান্দ্রা ও রাস্‌পুটিনের প্রভাব, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ—বল্‌শেভিক্ দল, (খ) সামাজিক কারণ : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভাব, দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর আধিক্য, (গ) অর্থনৈতিক : কৃষকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা—অর্থনৈতিক কারণে সমাজতান্ত্রিক প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত, (ঘ) শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়া পশ্চাদ্‌পদ, (চ) মানসিক কারণ : গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গেনিভ, ডস্‌টিয়েভ্‌স্কি, প্যাভ্‌লভ্‌ বাকুনিন, কার্ল মার্কস্‌ প্রভৃতির রচনার প্রভাব, (চ) প্রত্যক্ষ কারণ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ-পরাজয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা—জারতন্ত্রের পতন ; (৩) অস্থায়ী সরকার ; (৪) বল্‌শেভিক্ বিপ্লব : বল্‌শেভিক্ সরকারের সমস্যা ; (৫) কার্যাদি : আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে শান্তিস্থাপন—ব্রেস্ট্‌-লিট্‌ভস্কের সন্ধি : বিদেশী সৈনিকের সহায়তায় বল্‌শেভিক্ বিপ্লবনাশের চেষ্টা, প্রতি-বিপ্লবী পক্ষ দমন—বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ : বিপ্লব দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত। ৩৬০-'৭৬ পৃষ্ঠা]

3. Discuss in brief the causes of the World War II.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসরকে শান্তির যুগ না বলিয়া যুদ্ধবিরতির যুগ বলা-ই বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতের উপশম হইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল। (২) যুদ্ধের কারণ : (ক) ভার্সাই-এর সন্ধির ত্রুটি—জার্মানির প্রতি অপমানজনক ব্যবহার, চুক্তি-সম্পর্কে জার্মানিকে মতামত দানের অধিকার না দেওয়া—dictated peace, (খ) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে জার্মানির প্রতি অবিচার, (গ) ইঙ্গ-ফরাসী অনৈক্য—মিত্রপক্ষের পররাষ্ট্র নীতির পার্থক্য, লোকার্ণো চুক্তি, (ঘ) নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স—জার্মানির অপসরণ : জার্মানি কর্তৃক লীগ ত্যাগ ও সামরিক শক্তিসঞ্চয়, (ঙ) ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি নাকচ : রাইন অঞ্চল দখল, বার্লিন-টোকিও-রোম একসিস,

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান, (চ) হিট্লারের রাজ্যগ্রাস নীতিঃ অস্ট্রিয়া দখল, মিউনিক্ চুক্তি ও সুদেতেন অঞ্চল দখল, চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ দখল, মেমেল দখল, পোল্যাণ্ড হইতে ডান্জিগ ও সংযোগ-ভূমি (corridor) দাবি, (ছ) রুশ-জার্মান 'না-আক্রমণ চুক্তি', (জ) হিট্লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। ৪০২-'৪০৭ পৃষ্ঠা]

সপ্তদশ অধ্যায়

মধ্য-প্রাচ্য

(The Middle East)

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের (বর্তমানে পাকিস্তানের) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত যাবতীয় দেশগুলির মধ্য-প্রাচ্য নামকরণ করা হইয়াছে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালেই এই নামের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। মিশর উপরোক্ত সংজ্ঞার অধীনে ঠিক না আসিলেও মধ্য-প্রাচ্য নামের ব্যবহারে মিশর দেশকেও যোগ করা হইয়া থাকে। এই সকল দেশে ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল দেশের ইতিহাসের মোটামুটি আলোচনা করা হইল।

মধ্য-প্রাচ্য বলিতে কোন্ কোন্ দেশ বুঝায়?

তুরস্ক (Turkey) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্রশক্তি হিসাবে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে তুর্কী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেভ্রে (Sevres)-এর সন্ধি দ্বারা (১৯২০) মিত্রপক্ষ ওটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যকে এক অতি ক্ষুদ্র মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল-সম্বলিত রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। এই চুক্তি তুরস্ক গ্রহণ করিলে তুর্কী সাম্রাজ্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদ হয়ত এই চুক্তি অনুমোদন-ই করিতেন কিন্তু নেহাৎ ভাগ্যের জোরেই

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের ক্ষতি : কামাল আতাতুর্কের দান

মুস্তাফা কামাল নামে দেশপ্রেমিক সামরিক কর্মচারীর উত্থানে মিত্রপক্ষ সেভ্রে-এর সন্ধি তুরস্কের উপর চাপাইতে সক্ষম হইল না।

মুস্তাফা কামাল (Mustapha Kemal) ঃ

মুস্তাফা কামাল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সালোনিকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মণ্টাসির নামক স্থানে স্কুল-শিক্ষা কৃতিত্বের সহিত সমাপন করিয়া তিনি কনস্টান্টিনোপলের সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে 'কামাল' অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন (Perfect) উপাধি দান করিয়াছিলেন। মুস্তাফা সাধারণ্যে 'কামাল' নামেই সমধিক পরিচিত।

কামালের জন্ম ও প্রথম জীবন

সামরিক শিক্ষা গ্রহণকালেই তিনি ফরাসী বিপ্লব-সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়া অন্তরে অন্তরে বিপ্লবী হইয়া উঠেন। তুর্কী সরকার তাঁহার শিক্ষা সমাপনের পর তাঁহাকে রাজধানীর নিকটবর্তী কোন স্থানে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া দূরবর্তী দামাস্কাস-এর এক অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত করিলেন। সেখানে কামাল 'বতন' অর্থাৎ পিতৃভূমি (*Vatan* = Fatherland) নামে এক গোপন সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী শাসন-ব্যবস্থায় অকর্মণ্যতা দূর করিয়া দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি সাধন করা।

'বতন' নামক গোপন সমিতি স্থাপন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সময় কামাল সেনাপতি সেভ্কেত-এর সহিত কনস্টান্টিনোপলে সৈন্যসহ প্রবেশ করিয়া তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে বাধ্য করিয়াছিলেন। তরুণ তুর্কী আন্দোলনের বিশৃঙ্খলায় হতাশ হইয়া কামাল রাজনীতি ত্যাগ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হইল। সেখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় তুরস্ক যে কত পশ্চাদ্পদ তাহা তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন। ফরাসী স্ত্রীজাতীর স্বাধীনতা,

তরুণ-তুর্কী আন্দোলনে যোগদান ঃ রাজনীতি ত্যাগ

ফ্রান্সে গমন ঃ পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় তুরস্কের পশ্চাদ্পদতা উপলব্ধি

প্রগতিশীল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাঁহাকে চমৎকৃত করিল।*

কামালের সামরিক প্রতিভা ও খ্যাতি

১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী-ইতালীয় যুদ্ধে কামাল ট্রিপোলিটানিয়ায় তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচয় দান করেন। ১৯১২ এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধে তিনি তুরস্কের শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপলির যুদ্ধে (১৯১৫) কামাল মিত্রপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া সামরিক প্রতিভার চরম পরিচয় দান করেন।

মুস্তাফা কামালের জাতীয়তাবাদী দল ও সেনাবাহিনী গঠন

মুস্তাফা কামালের ন্যায় সামরিক প্রতিভা এবং দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর যে সন্ধির শর্ত চাপাইয়াছিল তাহা মোটেই গ্রহণ-যোগ্য ছিল না। তিনি তুর্কী সরকারকে এই চুক্তিগ্রহণে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিযাছিলেন কিন্তু তুর্কী সরকারের আদেশে তখন তাঁহাকে আনাটোলিযায় যাইতে হইল। এই সময় তিনি 'তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের সাহায্যে তিনি একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। ক্রমে কামাল তুরস্কের সর্বত্র এই জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তুর্কী পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কামালের জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন। এই পার্লামেণ্ট ছয়টি শর্ত সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিল এবং এই শর্তগুলি না মানিলে মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিল। এই শর্তগুলির প্রথম তিনটি দ্বারা তুরস্কের সাম্রাজ্য হইতে যে সকল স্থান মিত্রপক্ষ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল সেই সকল স্থানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকার করিতে হইবে তাহা বলা হইল। চতুর্থ শর্তে কন্‌স্টান্‌টিনোপলের নিরাপত্তা রক্ষা করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা

তুর্কী পার্লামেণ্টে জাতীয়তাবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৯১৯)

* "On his return he stopped for a while in Paris and was deeply struck by the contrasts of west and East. He seemed to have been especially impressed by the relatively free position of women, the progressive civil and commercial life and the general prevalence of literacy." Langsam, p 631.

হইল, অবশ্য দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পঞ্চম শর্তে তুরস্কের সাম্রাজ্যাধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্রেরই অধিকার মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং ষষ্ঠ শর্তে বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের জাতীয় জীবনের কোন স্তরেই কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা চলিবে না, এই কথা বলা হইল। এই শর্তটি যে তুরস্কের স্বাধীন দেশ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই কথাও বলা হইল।

মিত্রপক্ষের সহিত ছয়টি শর্ত-সম্বলিত চুক্তি গৃহীত

তুর্কী পার্লামেণ্ট উপরোক্ত চুক্তির শর্তাদি গ্রহণ করিলে একজন ব্রিটিশ জেনারেল-এর অধীনে এক বিশাল ইংরেজ সেনাবাহিনী কন্‌স্টান্‌টিনোপলে উপস্থিত হইয়া সেখানে সামরিক আইন জারী করিল এবং বহু জাতীয়তাবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার করিল। ইঁহাদের অনেককে আবার দেশের বাহিরে অন্যত্র প্রেরণ করা হইল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের অনেকে কন্‌স্টান্‌টিনোপল হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এঙ্গোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে পার্লামেণ্টে এক অধিবেশন শুরু করিলেন। কন্‌স্টান্‌টিনোপলে জাতীযতাবাদী সদস্য ভিন্ন অপরাপর সদস্যদের লইয়া পুরাতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট ও কন্‌স্টান্‌টিনোপল পার্লামেণ্ট নামে দুইটি পার্লামেণ্ট যেমন অধিবেশনে বসিল, তেমনি তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট মুস্তাফা কামালকে ইহার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিল এবং জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিল (১৯২০)। পর বৎসর (১৯২১) এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট 'মূল গঠনতন্ত্রের আইন' (Law of Fundamental Organisation) নামে এক আইন পাস করিয়া তুর্কী শাসনতন্ত্র মূলতঃ কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিল। এই আইনকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পরবর্তী সময়ে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল। এই আইন দ্বারা তুর্কী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তুরস্কের জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং এঙ্গোরা পার্লামেণ্টকেই তুর্কী জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই পার্লামেণ্টের কার্যকাল ছিল চার বৎসর। আঠারো বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে

ব্রিটিশ সৈন্যের কন্‌স্টান্‌টিনোপল দখল

এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট

তুর্কীশাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারিত

ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।* রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা একজন প্রেসিডেন্ট ও একটি দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভার হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি লইয়া একটি স্বাধীন বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইলে কামাল রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তারপর কার্স ও আর্দান হইতে বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত করিয়া ঐ দুই স্থান তুরস্কের সহিত সংযুক্ত করিলেন। সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানগুলি দখলের জন্য গ্রীস তুরস্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ কারণে গ্রীসকে কোন প্রকার সাহায্য দান করিল না। ক্রমে ব্রিটিশ সাহায্যও হ্রাস পাইতে লাগিল। এমন সময়ে (১৯২১) লণ্ডনের এক বৈঠকে সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তগুলির পরিবর্তনের এক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু গ্রীস ইহা মানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিত্রপক্ষ ঘোষণা করিল যে, গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে (মে, ১৯২১)। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে তুরস্কের খুবই সুবিধা হইল।

বিদেশী সৈন্য অপসারণ ও তুর্কী সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য কামালের যুদ্ধ

গ্রীস তুরস্ক আক্রমণ করিয়া প্রথমে সাফল্য লাভ করিল। কিন্তু সাখারিয়া (Sakharia)-এর যুদ্ধে কামালের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া গ্রীকবাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তথাপি এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তাহারা অধিকার করিয়া রাখিল, কিন্তু পর বৎসর তাহারা তুর্কী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। গ্রীকবাহিনী বিতাড়নকালে বৃটিশবাহিনীর সহিত কামালের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কামাল ফ্রান্স ও ইতালির সহিত মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং একমাত্র বৃটিশ শক্তির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ সেনাপতির মধ্যস্থতায় কামালের সহিত এক নূতন যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

সাখারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর পরাজয়

তুর্কী-ফরাসী-ইতালীয় মৈত্রী

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধবিরতির নূতন চুক্তি সম্পাদন

*১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর করা হয়।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি, রুমানিয়া, রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া জাপান, গ্রীস ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ ল্যসেন (Lausanne) নামক স্থানে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সেভ্রে-এর সন্ধি পরিবর্তন করিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ল্যসেনের সন্ধি দ্বারা তুর্কী জাতীয়তাবাদী পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ছয় শর্ত-সম্বলিত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হইল। ব্রিটিশের ম্যাণ্ডেট ইরাক ও তুরস্কের সীমায় মসুল (Mosul) সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা তখন অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। এইভাবে একমাত্র মুস্তাফা কামালের একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ ও অক্লান্ত শ্রমে তুর্কী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল।

ল্যসেনের সন্ধি (১৯২৩)

ইতিমধ্যে (১৯২২, ১লা নভেম্বর) তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান ষষ্ঠ মোহাম্মদকে পদচ্যুত করিল এবং পরবৎসর (২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩) তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হ'ল। মুস্তাফা কামাল তুর্কী প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত : কামাল সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত

ল্যসেন-এর সন্ধি (Treaty of Lausanne) ঃ এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ম্যারিৎসা (Maritsa) নদীর তীর পর্যন্ত থ্রেসের সকল স্থান ও আদ্রিয়ানোপ্‌ল পুনরায় লাভ করিল। গ্রীসের আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে কারাগাচ্ (Karagach) রেলনির্মাণ-কেন্দ্র তুরস্ক দখল করিল। কন্‌স্টান্‌টিনোপল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। বস্‌ফোরাস্ ও দার্দানেলিস্ শান্তি বা যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র তুরস্কের শত্রুশক্তির জাহাজ যুদ্ধকালে এই দুই প্রণালী ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইজিয়ান্ সাগরস্থ ইম্‌ব্রস্ (Imbros), টেনেডস্ (Tenedos) ও র‍্যাবিট্ দ্বীপপুঞ্জ (Rabbit Islands) তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। অপরাপর দ্বীপগুলি ইতালি ও গ্রীসকে দেওয়া হইল। সীরিয়ার সীমা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী-ফরাসী চুক্তির শর্তানুযায়ী অনুমোদিত হইল। লিবিয়া, মিশর, সুদান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সীরিয়া ও আরবীয় রাজ্যগুলির উপর তুরস্ক যাবতীয় দাবি ত্যাগ করিল। ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের উপর যে ক্ষতিপূরণ চাপান হইয়াছিল

শর্তাদি

তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং তুর্কী সামরিক শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নও বাতিল করা হইল। এইভাবে সেভ্রে-এর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল।

মুস্তাফা কামালের আমলে তুর্কী পুনরুজ্জীবন (Turkish revival under Kemal):

প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক মুস্তাফা কামাল তুরস্ককে একটি আধুনিক দেশে পরিণত করিতে চাহিলেন। তুরস্কের প্রাচীনপন্থী যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সংস্কার-নীতির মূলস্থত্রই ছিল তুর্কী সমাজ, শাসন, অর্থনীতি ও ধর্ম সর্বক্ষেত্রে এক আধুনিক বিজ্ঞান ও রুচিসম্মত পুনরুজ্জীবন সাধন করা এবং এইজন্য এক সময়ে একটি সংস্কারে ব্রতী হওয়া। কামালের সংস্কার-নীতির সাফল্যের মূল কারণই ছিল এই যে, তিনি একসঙ্গে একাধিক সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।*

কামালের সংস্কার-নীতি: আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন, এক সময়ে একটিমাত্র সংস্কারে হস্তক্ষেপ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান-পদ উঠাইয়া দিয়াছিল বটে কিন্তু সুলতানের খলিফা-পদ অর্থাৎ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের নেতৃত্বের অধিকার তখনও বাতিল করা হয় নাই। ষষ্ঠ মোহাম্মদ সুলতান-পদ হইতে অপসারিত হওয়ার পরও খলিফা ছিলেন কিন্তু দেশ হইতে পলায়ন করিলে ঐ পদে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মজিদকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী খলিফা-পদও উঠাইয়া দেওয়া হয়।

তুরস্কে খলিফা-পদের অবসান

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে মুসলমান ধর্মকে জাতীয় ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। পরবৎসর (১৯২৫) শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাতেও মুসলমান ধর্ম জাতীয় ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত ছিল। প্রগতিশীল তুর্কী শাসনাধীনে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের ধারণা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র হইতে 'মুসলমান ধর্ম জাতীয় ধর্ম' এই কথাটি

তুরস্ক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত (১৯২৮)

*"One of the chief reasons for Kemal's success was the fact that he customarily took just one big step in advance at a time."—Langsam, p. 637.

উঠাইয়া দিয়া তুরস্ককে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করে। সকল ধর্মকেই রাষ্ট্র সমভাবে রক্ষা করিবে এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই রাষ্ট্রের মূলনীতি বলিয়া বিবেচিত হইবে, স্থির হয়। ধর্মের ভিত্তিতে কোন বিশেষ সুবিধা কাহাকেও দেওয়া হইবে না, এই ঘোষণা করা হয়। ঐ সময়ে ইসলাম ধর্মপালন-ব্যাপারে গোঁড়ামিও কতক পরিমাণে হ্রাস করা হয়।

স্ত্রীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি : স্ত্রীজাতির পুরুষের সম-মর্যাদা লাভ

তুর্কী স্ত্রীলোকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কামালের সংস্কারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাস করিয়া বহু-বিবাহ-প্রথা রদ করা হয়। রেজিস্ট্রি বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশীয় সকল প্রকার বিবাহ-সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রচলন করিয়া স্ত্রীলোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৭ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর করা হয়। স্ত্রীলোকগণ ইচ্ছামত পাশ্চাত্ত্য পোশাক পরিধান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। বোর্‌খা পরিধান করা-না-করা ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।* ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। উপযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে জজ, অধ্যাপিকা হিসাবেও নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই সমপর্যায়ে স্থাপিত হয়। স্বাধীন তুর্কী নারীজাতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিলেন হ্যালিদি এদিব। ইনি ছিলেন প্রথম তুর্কী নারী-গ্র্যাজুয়েট। ইনি ইস্তান্‌বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্ত্য ভাষার অধ্যাপিকা হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে তুর্কী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন সংস্কার

পূর্বে তুরস্কের আইন-কানুন 'সরিয়াৎ' (Sheriat)-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে এইরূপ আইন-কানুনের পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। এইজন্য ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইট্‌জারল্যাণ্ড, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন-কানুনের অনুকরণে তুরস্কেরও আইন-কানুনের সংস্কার সাধন করা হয়

*"The Turkish ladies, unless they themselves so wished no longer needed to resemble 'coffin-shaped bundles of white linens,"—Vide, Langsam, p. 641.

নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সাত বৎসর হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার স্কুলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিরক্ষরতা শতকরা ৮২ জন হইতে ৪২ জনে নামিয়া আসিয়াছিল। স্কুল-কলেজে ধর্মপ্রচার বা ধর্ম-শিক্ষা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। বর্ষপঞ্জীর সংস্কার, আরবী অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের ব্যবহার, দশমিক মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। সরকারী, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক কর্মচারীদিগকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে হইত। নাগরিক অধিকার লাভ করিতে হইলে স্কুলের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি

তুর্কী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং সমাজ জীবনে যে এক নবচেতনা ও স্বাধীনতা আসিয়াছিল, তাহার প্রতীক হিসাবে পুরাতন অর্থহীন রীতিনীতি পরিত্যক্ত হইল। ফেজ টুপি বা পাগড়ী মাথায় দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। নামের শেষে পদবীর পর্যন্ত পরিবর্তন সাধিত হইল। কামাল স্বয়ং জাতীয় পার্লামেণ্টের ইচ্ছাক্রমে 'আতাতুর্ক' বা 'জাতির জনক' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অপরাপর সংস্কার

পূর্বে তুর্কী জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্যে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ করিত না। তুরস্কের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল গ্রীক, ইহুদী, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় বণিকদের হস্তে। কিন্তু কামাল আতাতুর্কের আমলে তুর্কী জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সব দিক দিয়া উন্নত হইয়া উঠিল।* সরকারী কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং আনাটোলিয়ার কৃষকদিগকে কৃষিকার্যে পারদর্শী করিয়া কৃষির ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনা হইল। আতাতুর্ক নিজেই একটি আদর্শ কৃষিকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন। নৌ-নির্মাণ-শিল্প ও অন্যান্য শিল্প-গঠনের উৎসাহ এবং সেজন্য সরকারী সাহায্য দান করা হইল। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়া তুরস্কের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা হইল। কৃষকদের করভার লাঘব করিয়া এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার কাল হ্রাস করিয়া কৃষির

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান

*"A Bulgarian diplomat is reported to have said, "They are working as we never thought the Turks could work."—Vide Langsam, p. 643.

উৎসাহ দান করা হইল। ইহা ভিন্ন রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা, জমি-উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজেও হস্তক্ষেপ করা হইল। চিনি ও বস্ত্র শিল্প ঐ সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিল। খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে কয়লা, তামা, এন্টিমনি, পেট্রোল, দস্তা প্রভৃতির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান-স্থাপন, খনিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন-বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। কামাল আতাতুর্ক এঙ্গোরার নাম পরিবর্তন করিয়া 'আঙ্কারা' রাখিলেন এবং ইহাকে তুরস্কের নূতন রাজধানীতে পরিণত করিলেন। রেল ও সমুদ্র পথ দ্বারা এই নূতন রাজধানীর যোগাযোগ স্থাপন করা হইল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ (১৯৩৪)

কামাল আতাতুর্কের পররাষ্ট্র-নীতি ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ তুরস্কের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহার ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি সম্পর্কে তুরস্ক স্বভাবতই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই রুশ-তুর্কী মৈত্রীতে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কমিউনিজমের প্রভাব তুরস্কে বিস্তার লাভ করিতে থাকিলে তুর্কী সরকার ক্রমে রুশমৈত্রীর প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল রহিল না। অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুরস্কের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, ফরাসী জাহাজ 'লোটাস' (Lotus) তুর্কী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তুরস্ককে ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুরস্কের মৈত্রীর পথ প্রস্তুত করিল। ফলে ইতালি-তুর্কী মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সীরিয়ার সীমা-সংক্রান্ত তুর্কী-ফরাসী দ্বন্দ্ব তুরস্কের স্বপক্ষে মীমাংসিত হইলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি সন্দেহ দূর হইলে ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য হইল। আমেরিকা ও তুরস্কের মধ্যেও একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ল্যসেন-এর সন্ধির শর্তগুলির কতক পরিবর্তন দাবী করিল। ঐ বৎসর মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করিলে মিত্রপক্ষ তুরস্কের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি তুরস্কের সন্দেহ : রুশমৈত্রী

ইতালি-তুর্কী-মৈত্রী

তুরস্ক কর্তৃক লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য-পদ গ্রহণ

দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাসের নিরাপত্তার জন্য ঐ সকল অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করিল এবং যুদ্ধের সময় লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কর্তৃত্বাধীনে যে সকল শক্তি যুদ্ধ করিবে কেবল মাত্র সেগুলির নিকট এই দুই প্রণালী উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি (Eastern Pact) দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতি দান করে। ইহার পূর্বে (১৯৩৪) তুরস্ক, গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বলকান আঁতাত নামে অপর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুই চুক্তির দ্বারা তুরস্কের শক্তি এবং নিরাপত্তা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চাদ্‌পদ তুরস্ক রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়া কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালীর সামরিক নিরাপত্তা বিধান

বলকান আঁতাত, পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু (১৯৩৮)

পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনন্থ আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মূলতঃ কামাল আতাতুর্কের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেও কামালের আমলে যে-সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, সেদিকেও তিনি মনোযোগ দিতে ত্রুটি করিলেন না। পররাষ্ট্র-নীতিতেও তাঁহার নীতি ছিল যেমন সুস্পষ্ট তেমনি স্বাদেশিকতাপূর্ণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ইওরোপীয় দেশগুলির আর 'ইওরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (Sick man of Europe) রহিল না। তুর্কী মৈত্রী তখন সকলের নিকটই কাম্য হইয়া উঠিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের সহিত পরস্পর সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

নূতন প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনন্থ

আরব জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism):

মধ্য-প্রাচ্যের আরবীয় দেশ ইরাক, সিরিয়া, আরব ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রদেশ ছিল। দীর্ঘকাল তুর্কী সাম্রাজ্যাধীনে থাকিয়াও আরব জাতি তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ভুলিতে পারে নাই। তুর্কী শাসনের প্রতি তাহারা যেমন ছিল বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন তেমনি তুর্কী সুলতানের 'খলিফা'-পদ গ্রহণের ফলে ধর্মের ব্যাপারে

আরব-তুর্কী বিদ্বেষ

তাহারা ছিল তুর্কী জাতি ও সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী। মক্কার আরব বংশোদ্ভূত হুসেনকে তাহারা মোহম্মদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া মনে করিত এবং তুর্কী সুলতানের খালিফাপদ গ্রহণ ন্যায় এবং ধর্মের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য মনে করিত না।

আরব ও তুর্কীদের এই স্বাভাবিক বিদ্বেষভাব ব্রিটিশ রাজনীতির ফলে আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার তুরস্ককে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে আরবদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে একদল ইংরাজ কর্মচারীকে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইল; ইহাদের মধ্যে কর্নেল লরেন্স্ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হইলেও আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ক্রমেই এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইতে চলিল। কর্নেল লরেন্স্ও আরবদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। হুসেনের পুত্র ফৈসল-এর সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুর্কী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার হুসেনের মাধ্যমে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন (১৯১৬)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের আরব জাতীয়তাবাদের সহায়তা

হুসেনের অধীন হেজ্জাক প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র আরব জাতির মধ্যে এক দারুণ জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা গেল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্য তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত করিয়া জেরুজালেম দখল করিলে হুসেনের পুত্র ফৈসল কর্ণেল লরেন্সের সাহায্যে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করিলেন (১৯১৮)। এইভাবে আরবদের জাতীয়তাবাদ যখন আরব-স্বাধীনতার পথে ধাবিত হইতেছিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। মিত্রশক্তি আরবদের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া আরব দেশগুলিকে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandates)-এ পরিণত করিল। ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় হুসেনের পুত্র ফৈসলকে ইরাকের রাজা এবং অপর পুত্র আবদুল্লাকে ট্রান্স্জর্ডানের আমীরপদে স্থাপন করা হইল। হুসেনকে হেজ্জাজের স্বাধীন আরব রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। তথাপি প্যালেস্টাইন ও ইরাক ব্রিটিশের অধীনে এবং

হুসেনের বিদ্রোহ

আরবীয় দেশগুলির 'ম্যাণ্ডেট্-এ পরিণত'

ফৈসলকে ইরাক, আবদুল্লাকে ট্রান্স্-জর্ডান এবং হুসেনকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া স্বীকার

সিরিয়া ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করায় আরবদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। আরবদের অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ হইতে ক্রমে আরব-ব্রিটিশ, আরব-ফরাসী গোলযোগ উপস্থিত হইল।* ঐ সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরও আক্রমণ চলিল।

অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ ইংরেজ ও ফরাসী বিদ্বেষে পরিণত

ইরাক ঃ ইরাকের রাজা ফৈসল ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও সুচতুর কূট-নৈতিক। তিনি ইরাকের আরবদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান ঘটাইলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ চুক্তি দ্বারা ইরাকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে একটি পরস্পর সামরিক সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভিন্ন ইরাকে ব্রিটিশ সরকারকে কতকগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হইল।

ইরাকের স্বাধীনতা-লাভ (১৯৩২)

ট্রান্স্জর্ডান ঃ ট্রান্স্জর্ডান-এর আমীর আবদুল্লা ফৈসলের ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে তিনি ক্রমেই ব্রিটিশ সাহায্যের উপর অধিকতরভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। স্বভাবতই তাঁহার রাজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন খুব মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ট্রান্স্জর্ডানের ব্রিটিশ নির্ভরশীলতা

হেজ্জাজ ঃ সাউদি আরব ঃ হেজ্জাজের রাজা হুসেন প্রথম দিকে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সহকারেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহারই এক পুত্র ফৈসল ছিলেন ইরাকের রাজা, অপর পুত্র আবদুল্লা ছিলেন ট্রান্স্জর্ডানের আমীর। হুসেন স্বয়ং খলিফা উপাধি ধারণ করিয়া মুসলমান জগতের নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সহায়তায় তাঁহার ভাগ্যোন্নতি ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি ব্রিটিশ সরকারের এক প্রকার তাঁবেদার হইয়া পড়িলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আরবজাতি ইহা ক্ষমা করিল না। হুসেন ক্রমেই জনগণের অত্যন্ত অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সুযোগে ইব্‌ন সউদ নামে একজন ওহাবি-নেতা হুসেনকে

হুসেনের রাজত্বকাল : জনসাধারণের অশ্রদ্ধা

ইব্‌ন সউদ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ (১৯২৫)

*"(But) Arab nationalism, deliberately fostered by the Allies during the war for the discomfiture of the Turk on many occasions after the war brought Arab peoples into conflict both with the Mandatory Powers and with non-Arab minorities living in their midst.'—Vide E.H. Carr. p. 234.

পদচ্যুত করিয়া হেজ্জাজের রাজা হইলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন সউদ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হুসেন ইতিপূর্বেই জেরুজালেমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা ইব্‌ন সউদ পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত রাজগণকে পরাজিত করিয়া আরব উপদ্বীপের সমগ্র স্থানের উপরই নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারেই হেজ্জাজের নাম হইল সাউদি আরব (Saudi Arabia)। রাজা ইব্‌ন সউদ খুব ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন। তাঁহার সামরিক ক্ষমতার বলে যেমন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার সুশাসনে দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থা দূর হইয়া আরব রাজ্যে এক প্রগতিশীল সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইব্‌ন সউদ নিজ রাজ্যের পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং বিদেশীদের বিশেষ সুবিধা যাহা হুসেন দান করিয়াছিলেন, তাহা নাকচ করিয়া আরবদের মধ্যে এক নব জাগরণ আনয়ন করেন। তিনি ইরাক ও ট্রান্‌স্‌জর্ডানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শক্তিবৃদ্ধি করেন। তাঁহার বংশধর-ই বর্তমানে সাউদি আরবে রাজত্ব করিতেছেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাউদি আরব, ট্রান্‌স্‌জর্ডান, ইরাক, মিশর, লেবানন ও ইয়েমেন প্রভৃতি আরব জাতি-অধ্যুষিত দেশগুলির মধ্যে 'আরব লীগ' (The Arab League) নামে এক মিত্রসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই মিত্রসঙ্ঘের মূল শর্ত হইল এই যে, প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে।

সাউদি আরবের জন্ম

ইব্‌ন সউদের শাসন-দক্ষতা

আরব লীগ (১৯৪৫)

প্যালেস্টাইন: ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস-সম্মেলন যখন প্যালেস্টাইন দেশটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandate) হিসাবে স্থাপন করে তখন উহার অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আরবজাতির লোক ছিল। মোট সাত লক্ষ অধিবাসীর অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক তখন ছিল ইহুদি। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আর্থার বেলফার (Arthur Belfour) ইহুদিদের স্বপক্ষে টানিবার জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসনে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। অপর দিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের সহায়তা লাভের জন্য আরব-নেতা হেজ্জাজের হুসেনকে আরব

ইহুদি ও আরবদের নিকট ব্রিটিশ সরকারের পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতি দান

স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থার দ্বারা আরবদের স্বাধীনতার বদলে তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল মাত্র। অবশ্য 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপিত হইলেও অদূর-ভবিষ্যতে আরবদের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ছিল। কিন্তু প্যালেস্টাইন সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতি দানের ফলে এক অতিশয় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্যারিস-সম্মেলন প্যালেস্টাইনকে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করিবার কালে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবার এবং সেখানকার অপরাপর বাসিন্দাদের ধর্মনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারকে দিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ইহুদি সেখানে বসবাসের জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আগমন

অপর দিকে হেজ্জাজের হুসেনের নিকট আরব সহায়তার বিনিময়ে আরব স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দান করিয়াছিলেন, আরব-অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনও স্বভাবতই সেই সকল সুযোগ প্রত্যাশা করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলীতে সন্নিবিষ্ট স্বায়ত্তশাসন অধিকারের নীতির উপর নির্ভর করিয়াই প্যালেস্টাইনের আরবগণ স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য হুসেনের সহিত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ম্যাক্‌মাহন (Macmahon) যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহাতে প্যালেস্টাইনের উল্লেখ ছিল না এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্যালেস্টাইন আরবদের স্বাধীনতার প্রশ্ন এড়াইয়া চলিলেন।

আরবদের জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট

যাহা হউক, ইহুদিদের দলবদ্ধভাবে প্যালেস্টাইন আগমনের আরব জাতীয়তা-বোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিল। আরবগণ নীতির দিক দিয়াই প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনে দাবি স্বীকার করিত না। ইহা ভিন্ন বিত্তশালী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত ইহুদিগণকে প্যালেস্টাইনে জমি কিনিবার অধিকার দান করিবার ফলে আরবগণ ক্রমেই প্যালেস্টাইনের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ইহুদিগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র আরবদের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইতেছিল।

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ

আরবদের কমলা লেবুর চাষ ও অপরাপর ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমেই ইহুদিদের হাতে চলিয়া যাইতেছিল। আরবগণ নিজ দেশেই বিদেশীতে পরিণত হইতে লাগিলে তাহারা ইহুদিগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৯২১, ১৯২৯ এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদিদের উপর ব্যাপক আক্রমণ করা হইল। আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ পুলিশ শান্তি রক্ষা করিতে অনেক সময়েই সক্ষম হইত না। ফলে, উভয় পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা হইত খুব বেশি। এই কারণে প্রায়ই ব্রিটিশ সরকারকে সামরিক সাহায্যে আরব-ইহুদি হানাহানি বন্ধ করিতে হইত।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করিলেন এবং এই কমিশনের উপর আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ও তদনুযায়ী সুপারিশ করিবার ভার দিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিশন তাঁহাদের সুপারিশে প্যালেস্টাইনকে আরব অঞ্চল, ইহুদি অঞ্চল এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত জেরুজালেম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনা ইহুদি বা আরব কোন পক্ষই সমর্থন করিল না। ক্রমেই আরব-ইহুদি বিবাদ অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিল। ইহুদি স্বার্থ, আরব জাতীয়তাবোধ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আবর্তে পড়িয়া প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের বাহিরে চলিয়া গেল। প্যালেস্টাইনের বিমান ঘাঁটি ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য দখলে রাখা প্রয়োজনীয় ছিল, ইহা ভিন্ন মসুলের খনিজ তেলের পাইপ প্যালেস্টাইনে আসিয়া শেষ হইয়াছিল। সেজন্য তেলের বণ্টন-ব্যাপারেও প্রাধান্যলাভের সুযোগ ছিল। ইতালি হইতে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া আরবগণ ইহুদি এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইল। এমন কি যে-সকল আরব ইহুদিদের সহিত মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল তাহাদিগকেও আক্রমণ করা হইল। একজন ব্রিটিশ কমিশনার এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রাণ হারাইলে আরবদের উপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলিল। জেরুজালেমের মুফ্‌তি আমিন এল-হুসেনি প্যালেস্টাইনে ইহুদি পুনর্বাসন বন্ধ করিবার এবং অপরাপর আরব রাজ্যগুলির সমপর্যায়ে প্যালেস্টাইনকে স্থাপনের দাবি করিলেন।

রয়েল কমিশন: প্যালেস্টাইন বিভক্তির পরিকল্পনা

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ বৃদ্ধি: ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি দ্বিতীয় কমিশন নিয়োগ করিলেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা ত্যাগ করা হইল। ইহুদি ও আরব প্রতিনিধিবর্গকে লণ্ডনে এক বৈঠকে আহ্বান করা হইল (১৯৩৯)। তাঁহাদিগকে আলাদাভাবে নিজ নিজ অভিযোগ ব্রিটিশ পক্ষকে জানাইবার কথা বলা হইল এবং যদি আপোষ-মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে উভয় পক্ষের যুগ্ম বৈঠক বসিবে স্থির হইল। কিন্তু এইবারও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইল না। বৃটিশ সরকার নিজ হইতেই একটি মীমাংসা পরিকল্পনা কার্যকরী করিলেন। পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য বৎসরে দশ হাজারের বেশি ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই নীতি গৃহীত হইল। ইহা ভিন্ন কঠোর সামরিক পরিদর্শন দ্বারা শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইহুদি প্রশ্নের কোন স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইল না।

দ্বিতীয় কমিশন : প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত

আরব-ইহুদি সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ চেষ্টা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – সমাধানের প্রশ্ন স্থগিত

ইয়েমেন : আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইয়েমেন রাজ্য অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন মাত্র ৭৪ হাজার বর্গমাইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়েমেনবাসী তুর্কী আধিপত্য অবসানের জন্য বিদ্রোহ শুরু করে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সময়ে ইতালি ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ লইয়া সৈয়দ মোহম্মদ-ইবন্-অল্-ইদ্রিস্ তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইতালির সাহায্যে বিদ্রোহ করিয়া ইয়েমেনকে একপ্রকার স্বাধীন করিতে সমর্থ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এই স্বাধীনতা দৃঢতর হয় এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্পৃহা : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা-লাভ

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েমেন রাশিয়ার সহিত, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সহিত, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত মিত্রতাসূচক চুক্তি স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়েমেন নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের চাপে ইতালীয় মেডিকেল মিশনকে ইয়েমেন হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করে।

স্বাধীন ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েমেন আরব লীগের এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউ. এন. ও. (U. N. O.)-এর সভ্য হয়।

সিরিয়া ও লেবানন : ইরাক প্যালেস্টাইন ভিন্ন আরব জাতীয়তাবাদের অপর কেন্দ্র ছিল সিরিয়া। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandate) হিসাবে স্থাপিত হয়। ফরাসী সরকার সিরিয়ার সংখ্যালঘু জাতি-অধ্যুষিত তিনটি অঞ্চলকে আরব-প্রধান অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। উপকূল অঞ্চলের লাটাকিয়া (Latakia) এবং জেবেল দ্রুস্ (Jebel Druse) অঞ্চল ফরাসী সরকারের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, উত্তর দিকে আলেকজান্দ্রেতা (Alexandretta) তুর্কীজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া উহাকে সিরিয়ার অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হইল। আলেকজান্দ্রেতার অধিকাংশই অবশ্য ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করা হয়।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি

ফরাসী সরকার কর্তৃক সিরিয়ার বিচ্ছিন্নীকরণ-নীতি আরবদের বিদ্বেষের কারণ হইল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আরবগণ নিজ দেশের সংহতি-নাশ সহ্য করিল না। তাহারা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফরাসীদের আক্রমণ করিতে লাগিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের বিদ্রোহ এক দারুণ আকার ধারণ করিলে ফরাসী সরকার কামান ব্যবহার করিয়া দামাস্কাস নগরীতে নিজ আধিপত্য-রক্ষায় সমর্থ হইলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার সিরিয়ার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া দিয়া ফরাসী শাসন স্থাপন করিলেন। এই সকল কার্যের ফলে সামরিক ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা যেটুকু শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ততটুকুই হইল, কিন্তু আরবগণের সন্তুষ্টিবিধান করা সম্ভব হইল না। বরঞ্চ আরবগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। লেবাননেও ফরাসী সরকার মারো নাইটস্ (Maro Nites) নামক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরবদের বিরুদ্ধে উস্কাইতে লাগিলেন।

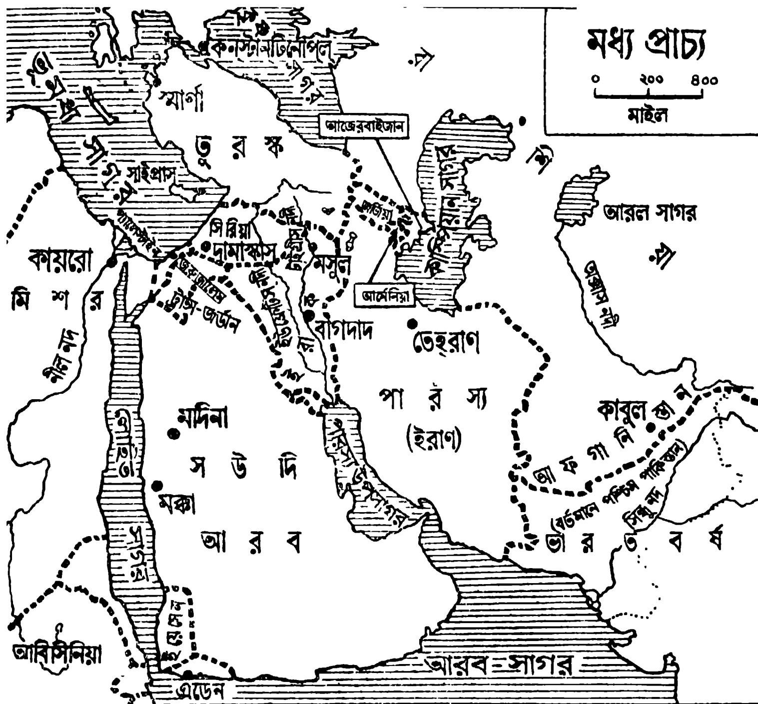
আরবদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার আরবদের সহিত মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের

ফ্রান্স ও সিরিয়া এবং লেবাননের চুক্তি (১৯৩৬)

আপোষ-মীমাংসার আলোচনা ফলে ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির অনুকরণে ফ্রান্স ও সিরিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে সিরিয়ার সরকারে হস্তে সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করা, আলওয়াই ও দ্রুজ অঞ্চলের সিরিয়ার সহিত সংযুক্তি এবং ফরাসী সরকারের সহিত এক ভিন্ন চুক্তির দ্বারা ফরাসী সৈন্য সিরিয়াতে স্থাপন করা স্থির হইল। লেবাননের সহিতও অনুরূপ এক চুক্তি সম্পাদন করা হইল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুমোদনে ফ্রান্সের বিলম্ব



এই চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়ায় এক জাতীয় সরকার গঠিত হইল। কিন্তু ফরাসী সরকার সিরিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন লাটাকিয়া, দ্রুজ, জেবেল প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী কর্মচারীদের উস্কানির ফলে এক স্ব-স্ব প্রাধান্যের মনোবৃত্তি দেখা দিল। ইহা ভিন্ন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রেতার

সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত (১৯৩৯)

অধিকাংশ ফরাসী সরকার তুরস্ককে দান করিলেন। এই সকল কারণে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার জাতীয় সরকার পদত্যাগ করিলেন। এই সুযোগে ফরাসী সরকার পুনরায় সিরিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন।

সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা-লাভ (১৯৪১)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী শাসন প্রচলিত রহিল। হিট্‌লারের হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষের সৈন্য সিরিয়া ও লেবানন দখল করিল। ঐ বৎসরই (১৯৪১) ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি দ্বারা (Lytlleton-de-Gaulle Agreement) সিরিয়া ও লেবাননকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

মিশর ঃ

পূর্বকথা

[আদি সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল মিশর দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল ফ্যারাওদের অধীনে ছিল। ক্রমে ক্রমে ত্রিশটি ফ্যারাও বংশ মিশরে রাজত্ব করিয়া ৫২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যের অধীন হয়। পারসিক প্রাধান্যের আমলেও মিশরে ফ্যারাও বংশই রাজত্ব করিতেন। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক প্রাধান্যের অবসান করিয়া গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিশর দখল করেন। তিনি আলেকজাণ্ড্রিয়া নামে তাঁহার এক নূতন রাজধানী মিশর দেশে স্থাপন করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিদের অন্যতম টলেমি মিশরের অধিকার প্রাপ্ত হন। টলেমির বংশ রাণী ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (৩০ খ্রীঃ পূঃ) লুপ্ত হয়। ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সময় হইতে মিশর রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমে রোমান সাম্রাজ্য এবং পরে বাইজাণ্টাইন বা পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে মিশর দেশ দীর্ঘকাল থাকে এবং ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আরব জাতির অধিকারে আসে। আরবদের অধীনে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকিবার পর মিশর ঐ বৎসর তুর্কী সুলতান সেলিম কর্তৃক বিজিত হয়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মিশর আইনতঃ তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ বলিয়াই বিবেচিত হইত। প্রকৃত শাসনব্যাপারে অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে নানাপ্রকার পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মিশরকে যাইতে হইয়াছিল।]

ফরাসী-অধিকৃত মিশর (১৭৯৮-১৮০১)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ব্রিটিশ ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে মিশর জয় করেন। পিরামিডের যুদ্ধে মিশর জয় করিলেও ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-তুর্কী যুগ্মবাহিনী মিশর হইতে ফরাসী আধিপত্যের অবসান ঘটায়। আলবানিয়া-বাসী এক দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা মোহম্মদ আলি ফরাসী অধিকার হইতে মিশর দেশকে মুক্ত করিতে তুরস্ক সরকারকে সাহায্য করেন।

ইহা ভিন্ন তিনি মিশরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগেও তুর্কী সুলতানের স্বার্থ রক্ষা করেন। ফলে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই তুর্কী সুলতান মিশরের পাশা (Viceroy) পদে নিযুক্ত করেন। মোহম্মদ আলি মামলুক নামক এক শ্রেণীর বিদেশী ক্রীত-দাস-উদ্ভূত সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার হইতে মিশর দেশকে রক্ষা করেন। মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা আরবের ওহাবি বংশের হাত হইতে বহুস্থান জয় করেন। ইহা ভিন্ন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুদান জয় করেন এবং ব্লু-নাইল নদীর তীরস্থ সেনার (Sennar) নামক স্থান পর্যন্ত নিজ সৈন্য মোতায়েন করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানকে গ্রীক স্বাধীনতা-আন্দোলন দমনে তিনি সাহায্য দান করেন। কিন্তু ইহার কিছুকালের মধ্যেই মোহম্মদ আলির সহিত তুর্কী সুলতানের মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই সূত্রে মিশর-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানসমূহ দখল করিয়া কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় মোহম্মদ আলি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আনাটোলিয়া প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিলেন। এই সকল স্থান ত্যাগ করিলেও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মোহম্মদ আলিকে বংশপরম্পরায় মিশরের শাসনাধিকার দান করিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহাকে নিউবিয়া, সেনার, দারফুর ও কর্‌ডোফান্ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেরও গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন।

মোহম্মদ আলি মিশরের পাশা নিযুক্ত

মিশর-তুর্কী দ্বন্দ্ব

মোহম্মদের দীর্ঘ ৪৪ বৎসরের রাজত্বকালে (১৮০৫—'৪৯) আধুনিক মিশরের গোড়া পত্তন হইয়াছিল। শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা মোহম্মদ মিশর দেশকে একটি প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত করেন। সুদক্ষ সামরিক বাহিনী, মেডিকেল স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, বন্দর, নৌ-নির্মাণ-কেন্দ্র প্রভৃতি গঠন করিয়া তিনি মিশর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই মিশরে লম্বা আঁশযুক্ত তূলার (Long-staple cotton) চাষ আরম্ভ হয় এবং সেচকার্যের সুবিধার জন্য কাইরো বাঁধ (Cairo Barrage) নির্মিত হয়।

মোহম্মদ আলির পর যথাক্রমে প্রথম আব্বাস্ (১৮৪৯—'৫৪), সৈয়দ (১৮৫৪—'৬৩) ও ইস্‌মাইল (১৮৬৩—'৭০) মিশরের পাশা পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। সৈয়দের শাসনকালেই সুয়েজ খাল খনন সুরু হয় এবং ইস্‌মাইলের আমলে তাহা শেষ হয় (১৮৬৯)।* ইস্‌মাইল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে 'খেদিভ্‌' (Khedive) উপাধি প্রাপ্ত হন।

***সুয়েজ খাল ঃ** প্রাচীন মিশরের কার্ণাক-মন্দির-গাত্রের লিপিতে ফ্যারাও প্রথম সেটি (১৩৮০ খ্রীঃ পূঃ)-এর আমলে সুয়েজ খালের স্থানে একটি অপ্রশস্ত খাল নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে উহা বুজিয়া যায়। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপের পথে প্রাচ্যদেশে যাতায়াতের সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইলে পর প্রথমে ভেনিসবাসী এবং পুনরায় ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (১৬৪৩—১৭১৫) ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে খাল খনন করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার *Tamberlaine*-এর দ্বারা এই উক্তি করাইয়াছিলেন:

—"here not far from Alexandria,
Whereas the Terrene and red sea meet
Being distant less than full a hundred leagues
I meant to cut a channel to them both
That men might quickly sail to India"—

—Marlowe's *Tamberlaine*

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশর জয় করিবার পর তাঁহার ইঞ্জিনীয়ারদের বহুকাল-পরিকল্পিত এই খাল খনন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে প্রাথমিক জরীপ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইঞ্জিনীয়ারগণ ভুলবশতঃ ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের জলের উচ্চতায় ২৯ ফুটের ব্যবধান আছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় এই পরিকল্পনা তখন পরিত্যক্ত হয়। ১৮৪৬—'৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জরীপের ফলে নেপোলিয়নের ইঞ্জিনীয়ারদের ভুল ধরা পড়ে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপস্‌ (Ferdinand-de-Lesseps) নামে একজন ফরাসী উদ্যোক্তা সৈয়দ পাশার নিকট হইতে ৯৯ বৎসরের চুক্তিতে সুয়েজ খাল খননের অধিকার লাভ করেন। ১৮৬৯ হইতে এই ৯৯ বৎসর অতিবাহিত হইলে খালটি সম্পূর্ণভাবে মিশরের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে স্থির হয়। Compaignie Universelle du Canal Maritime নামে একটি কোম্পানী স্থাপন করিয়া (১৮৫৮) উহার শেয়ার বিক্রয় করা হয়। অর্ধেকেরও বেশি শেয়ার (২ লক্ষ) ফ্রান্সে বিক্রয় হয়, ৯৬ হাজার শেয়ার তুরস্কে বিক্রয় হয়, অবশিষ্ট ৮৫,৫০৬টি শেয়ার মিশরের খেদিভের নিজস্ব থাকে। মোট ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক খরচে এই খালটি খনন করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে খালটির খনন-কার্য শেষ হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ফরাসী সম্রাজ্ঞী (তৃতীয় নেপোলিয়নের পত্নী) ইউজিনী উহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের খেদিভের মোট শেয়ার-সংখ্যা ১,৭৬,৬০২তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অর্থাভাবে খেদিভ্‌ এই মোট শেয়ার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলির আগ্রহে ব্রিটিশ সরকারের নিকট মোট ৩৯,৭৬,৫৮২ পাউণ্ডে বিক্রয় করেন।

খেদিভ্ ইস্‌মাইল তাঁহার পিতামহ মোহম্মদ আলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের উন্নতিমূলক কার্যাদি চালাইলেন। তিনি ডাক-বিভাগ, শুল্ক-ব্যবস্থা, রেলপথ, বন্দর, ইক্ষু-চাষ প্রভৃতির উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতা, রাজ্যবিস্তার-নীতি প্রভৃতির ফলে তিনি দিন দিনই ঋণগ্রস্ত হইতে থাকিলেন। অবশেষে এক আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে ইস্‌মাইল ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দুই দেশ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ মিশরের আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর এক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্থাপন করিল। মিশরীয় সরকার ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত প্রভাবাধীন হইল।

মিশরের অর্থ নৈতিক বিপর্যয় : ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃত্ব স্থাপন

পরবর্তী পাশা তওফিক্-এর আমলে আহ্‌মদ আরবী পাশা নামে একজন দেশপ্রেমিক দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করেন। এই সূত্রে

প্রথমে সুয়েজ খালের শেয়ার হইতে কোন লাভ না হইলেও ১৯২০-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার শেয়ার-মূল্যের ৮ গুণ অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯, ৭৬, ৫৮২ পাউণ্ডের ঐ সকল শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটী ৪৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর সুয়েজ ক্যানাল কনভেনশন (Suez Canal Convention) নামে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন, ইতালি, নেদারল্যাণ্ড, রাশিয়া, ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা সুয়েজ খাল 'যুদ্ধ ও শান্তির কালে সকল দেশের যুদ্ধ-জাহাজ ও বাণিজ্য-জাহাজের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে' এই শর্ত গৃহীত হয়। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী উহার কার্যকাল ৯৯ বৎসর অপেক্ষাও বাড়াইবার আবেদন করিলে মিশর উহা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর মেয়াদ শেষ হইবার কথা। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি দ্বারা ক্যানাল কোম্পানীর আয় হইতে মোট ৩ লক্ষ ইজিপ্‌শিয়ান পাউণ্ড মিশর-সরকারকে দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিপূর্বে মিশর-সরকার সুয়েজ খালের আয়ের কোন অংশ পাইত না। ইহা ভিন্ন ক্যানাল কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডে মিশরীয়দেরও স্থান দেওয়া হয় এবং শতকরা ৩৩ জন কর্মচারী মিশরীয়দের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইবে এই নীতি গৃহীত হয়। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী মিশরের আইন অনুযায়ী মিশরীয় কোম্পানী হিসাবে মিশর দেশে রেজিস্ট্রি করা হইয়াছিল।*

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মিশরীয় সরকার সুয়েজ খাল কোম্পানীর জাতীয়করণ করিয়াছেন। এই সূত্রে মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী সশস্ত্র আক্রমণ হয়। ইউ. এন. ও. (U. N. O.) এবং পৃথিবীর জনগণের তীব্র প্রতিবাদে ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনী মিশর ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে। *Vide *The Middle East* Royal Institute of International Affairs, pp. 146-48, 153.

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশসৈন্য কায়রো দখল করে। ঐ সময় হইতেই মিশরে ব্রিটিশ সামরিক শাসন স্থাপিত হয়। লর্ড ক্রোমার ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ এজেন্ট ও কন্‌সাল-জেনারেল। ঐ সময়ে মাহাদি নামে একজন নেতার অধীনে সুদান মিশরের অকর্মণ্য শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়িলে জেনারেল গর্ডনকে বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গর্ডন খার্টুম-এ প্রবেশ করিলে মাহাদির সেনাবাহিনী তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া খার্টুম দখল করে এবং গর্ডন স্বয়ং ও তাঁহার সেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক লোক প্রাণ হারান। কাইরো হইতে গর্ডনকে সামরিক সহায়তা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। পরবর্তী তের বৎসর মাহাদি স্বাধীনভাবে সুদানে রাজত্ব করেন। ১৮৯৬-'৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুদান পুনরায় মিশরীয় অধিকারে আসে এবং সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় যুগ্ম শাসন স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ফ্যাসোডা নামক স্থানটি দখল করে। এই স্থানটি ব্রিটিশ আওতার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া এই ব্যাপার লইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। অবশেষে ফরাসী সৈন্য ফ্যাসোডা হইতে অপসারিত হইলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স মিশরের উপর ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করিয়া লয় এবং ব্রিটেনও মরক্কোর উপর ফরাসী প্রাধান্য স্বীকার করে। ঐ বৎসর মিশরের উপর হইতে বিদেশী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত হয়।

লর্ড ক্রোমারের অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা

গর্ডনের হত্যা

'ফ্যাসোডা' সংঘর্ষ

লর্ড ক্রোমারের দক্ষতার ফলে মিশরের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই দেখা দিল। মুস্তাফা কামিল নামে একজন নেতার নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে ক্রোমার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে সার এলডন্ গর্স্ট্ (Eldon Gorst, 1907-'11) এবং তাঁহার পর লর্ড কিচেনার (১৯১১-'১৪)-এর আমলে মিশরীয়গণ শাসন-ব্যবস্থায় কতক পরিমাণ স্বাধিকার লাভ করে। লর্ড কিচেনার পূর্বেকার দুই কক্ষযুক্ত পার্লামেন্টের স্থলে এক কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া ইহার ক্ষমতা কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন।

মিশরীয়দের শাসন-তান্ত্রিক অধিকার লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে ব্রিটেন মিশর দেশকে ব্রিটিশ-'সংরক্ষিত দেশ' (Protectorate) বলিয়া ঘোষণা করে। প্রধানতঃ সুয়েজ খালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে মিশরের জাতীয়তাবাদী দল 'ওয়াফ্‌দ (Wafdists) মিশরের স্বাধীনতার প্রশ্ন আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের সম্মুখে উত্থাপন করিতে চাহিলে বলপূর্বক তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইল। 'ওয়াফ্‌দ' দলের নেতা জগ্‌লুল পাশা কাইরোতে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গের সহিত এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ না হইয়া সরাসরি শান্তি-সম্মেলনে একটি প্রতিনিধিদলসহ উপস্থিত হইবেন স্থির করিলেন। ব্রিটিশ সরকার জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার তিন জন প্রধান অনুচরকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং মাল্টায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ফলে, সমগ্র মিশর দেশে এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার দমন-নীতি অনুসরণ করিয়া এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করিলেন। অল্পকাল পরেই লর্ড এলেন্‌বি মিশরের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়া আসিলে জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহচরদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহচরগণ প্যারিসে গমন করিলেন, কিন্তু প্যারিস সম্মেলনে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবার কোন সুযোগ তাঁহারা পাইলেন না। ইহার ফলেও মিশরে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ সরকার এইবার বাধ্য হইয়াই মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। লর্ড মিল্‌নার (Lord Milner) ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : মিশর ব্রিটিশ সংরক্ষিত দেশ বলিয়া ঘোষিত

ওয়াফ্‌দ দলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

লর্ড মিল্‌নার মিশন আলাপ-আলোচনার পরও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের প্রধান মন্ত্রী আদ্‌লি যগন পাশাকে ব্রিটিশ সরকার আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবারও আলাপ-আলোচনার পর কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। আদ্‌লি মিশরে ফিরিয়া আসিয়া প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে পুনরায় মিশরে এক আন্দোলন শুরু হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাহার সহকারী পাঁচ জন নেতাকে দেশ হইতে অন্যত্র নির্বাসনে প্রেরণ করা হইল।

ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিতে না পারিয়া এক ঘোষণার দ্বারা মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'সংরক্ষণের' (Protectorate)-এর অবসান করিলেন। সামরিক আইন উঠাইয়া দেওয়া হইল কিন্তু সুদান ও মিশরের সামরিক নিরাপত্তা, মিশরস্থ বিদেশীদের স্বার্থ প্রভৃতি রক্ষার ভার ব্রিটিশদের হস্তেই রাখা হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ সুলতান ফুয়াদ (Sultan Fuad) মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। পর বৎসর মিশরে এক নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী (ঐ বৎসরই ১৯২৩) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। পার্লামেন্টে জগ্‌লুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফ্‌দ দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। জগ্‌লুল পাশা প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলাপ-আলোচনার জন্য লণ্ডনে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি লণ্ডন হইতে অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে মিশরে এক গোলযোগের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে সুদানের ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল সার লী স্ট্যাক্ (Sir Lee Stack) ও মিশরীয় সেনাবাহিনীর সর্দারকে কাইরোর রাজপথে হত্যা করা হইল। পরবর্তী কয়েক বৎসর মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জগ্‌লুল পাশার মৃত্যু হইলে নাহাস্ পাশা প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু রাজা ফুয়াদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং মিশরীয় শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন নির্বাচনে নাহাস্ পাশা পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিলেন। তিনি শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন করিলেন এবং রাজক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করিলেন। রাজা অবশ্য এই আইন অনুমোদন করিলেন না। ফলে নাহাস্ পাশা পদত্যাগ করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা নিজ সমর্থক প্রধানমন্ত্রী সিদ্‌কি পাশার সাহায্যে শাসন চালাইলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাহাস্ পাশা পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া পূর্বেকার শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু ১৯২৭ ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে

মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'সংরক্ষণের' অবসান—ফুয়াদ মিশরের রাজপদে অধিষ্ঠিত (১৯২২)

জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা : ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোষের ব্যর্থ চেষ্টা

মিশরের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

নাহাস্ পাশার আমলে তৃতীয়বার চেষ্টা চলিল, কিন্তু তাহাতেও প্রথমে কোন ফল হইল না। ১৯৩৫-'৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ঐ বৎসরই (১৯৩৬) শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে মিশরে ব্রিটিশের সামরিক শাসনের সমাপ্তি ঘটে, কেবলমাত্র সুয়েজ খাল অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ট্রিও (Montreux) চুক্তি দ্বারা ব্রিটিশ ও অপরাপর বিদেশীদের বিচারালয়, বিশেষ ক্ষমতা প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মিশর লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ লাভ করে।

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি (১৯৩৬)

মণ্ট্রিও চুক্তি (১৯৩৭)

মিশরের লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ লাভ

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে-ই রাজা ফুয়াদের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার নাবালক পুত্র ফারুক্ মিশরের রাজা হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

ফারুক্-এর সিংহাসন লাভ

এদিকে নূতন রাজা ফারুকের সহিত নাহাস্ পাশার মতানৈক্য দেখা দিলে নাহাস্ পাশার স্থলে আলি মাহির পাশা প্রধানমন্ত্রী হইলেন, ইহা ভিন্ন নাহাস্ পাশার 'ওয়াফ্‌দ' দলেও বিভেদ দেখা দিল। আহম্মদ পাশা ও নক্‌রাশি পাশা 'সা'দ' (Sa'dist) দল নামে এক নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিলে মিশরের নিরাপত্তার সমস্যা বৃদ্ধি পাইল। মিশরীয় পার্লামেণ্ট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল। ১৯৪০ হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশরের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যুদ্ধাবসানে (১৯৪৬) মিশর সরকারের চাপে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ বেভিন কাইরোতে আসিলেন এবং উভয় পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা (১) ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাইরো, আলেকজাণ্ড্রিয়া ও নীল নদের মোহনা হইতে অপসারণ সম্পূর্ণ করা হইবে এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের

আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি (১৯৪৬)

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমগ্র মিশর হইতে সৈন্য অপসারিত হইবে স্থির হইল। মিশর ও মিশরের নিকটবর্তী ব্রিটিশ স্বার্থ-জড়িত স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মিশর ও ব্রিটিশ সরকার যুগ্মভাবে চেষ্টা করিবেন এবং সুদানের শাসন-ব্যাপারে উভয় সরকার যুগ্মভাবে নীতি নির্ধারণ করিবেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সুদান মিশরের রাজার অধীনে থাকিবে —এই সকল শর্তও ঐ চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইল। কিন্তু এই চুক্তির ব্যাখ্যা লইয়া ব্রিটিশ ও মিশরীয় সরকারের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ব্রিটিশ সৈন্যাপসারণের প্রশ্ন ইউ. এন. ও. তে উত্থাপন করা হইল। অপর দিকে মিশরে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য এক দারুণ আন্দোলন সৃষ্টি হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য মিশরের অপরাপর সকল স্থান ত্যাগ করিয়া সুয়েজ খালের নিরাপত্তার অজুহাতে ফইদ্ (Fayyid) নামক স্থানে মোতায়েন করা হইল। ইউ. এন. ও.-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলে অবশ্য এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না। ইতিমধ্যে মিশরের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবে রাজা ফারুক্ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। নগুইব ও নাসের এই বিপ্লবের নেতা ছিলেন। নূতন জাতীয় সরকারের চাপে ব্রিটিশ সরকার সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইয়াছেন। মিশরে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যও ব্যাপক উৎসাহ সহকারে গৃহীত হইয়াছে।

ইউ. এন. ও. এবং মিশরীয় সমস্যা

ব্রিটিশ সৈন্যাপসারণ

প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপন

পারস্য বা ইরান (Persia or Iran) :

খনিজ তৈল-সম্পদে সম্পদশালী পারস্যদেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বিদেশী স্বার্থপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ব্রিটেন ও রাশিয়া পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে পারসিক অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের সৃষ্টি করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও রাশিয়া যুগ্মভাবে পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের উদ্দেশ্যে পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। ঐ বৎসর ইঙ্গ-রুশ-চুক্তি দ্বারা পারস্যের উত্তর অংশ রাশিয়ার প্রভাবাধীন (under the sphere of influence) বলিয়া স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর ও

রাশিয়া ও ইংলণ্ড কর্তৃক শোষণ

দক্ষিণ-পূর্বাংশে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে প্রাধান্য বজায় রাখা ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বহুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল।

ইরানী জাতীয়তাবাদ রাশিয়া কর্তৃক পারস্যের উত্তরাংশ দখল

ইরানীদের জাতীয় মর্যাদা ইঙ্গ-রুশ নীতির ফলে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরু হয়। এই সূত্রে প্রথমে পারস্যের শাহ্‌কে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র স্থাপনে বাধ্য করা হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে রুশ সেনাবাহিনী পারস্যের উত্তরাংশ সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লয়। এমন কি পারস্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে রুশগণ বাধা দান করে। তাহাদের চাপে পারস্য সরকার নিজ অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। ইনি ছিলেন একজন আমেরিকাবাসী অর্থনীতিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: রেজাখান পহ্‌লভির বলপূর্বক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ

এইভাবে বিদেশী স্বার্থপরতার বিষময় ফল যখন ইরানীরা ভোগ করিতেছে, তখন শুরু হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রুশ-তুর্কী-ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবমাননা করিয়া পারস্যের সীমার অভ্যন্তরে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। দুর্বল পারস্য সরকার বিদেশীদের হাত হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে পারস্য সরকার ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে পরিণত হইবার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ পারসিকগণ সরকারের এই আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রেজাখান পহ্‌লভি নামক একজন সামরিক নেতা বলপূর্বক অকর্মণ্য সরকারকে পদচ্যুত করিয়া এক জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক 'মজ্‌লিস্' অর্থাৎ পার্লামেণ্ট রেজাখানকে পারস্যের সিংহাসনে স্থাপন করিল। তিনি রেজাশাহ্‌ পহ্‌লভি উপাধি ধারণ করিয়া পারস্যের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

রেজাখান পারস্যের শাহ্‌পদে অধিষ্ঠিত

রেজাশাহ্ ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক এবং ক্ষমতাশালী সেনানায়ক। দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিসাধন করা-ই হইল তাঁহার রাজত্বের মূল নীতি। তিনি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের ন্যায়-ই জনকল্যাণকর কার্যের দ্বারা তাঁহার ক্ষমতালাভের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

রেজাশাহের শাসনে জনকল্যাণ সাধন

তিনি প্রথমে পারস্য রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন। বিভিন্ন অংশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করিয়া তিনি এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন। বিদেশী প্রভাব মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তিনি বন্ধ করিলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে তিনি বিদেশী অর্থনীতিকদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানিকে তিনি নূতন শর্তে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিলেন। পরিবহনের সুবিধা-বৃদ্ধির জন্য রাস্তা ও রেলপথ তিনি প্রস্তুত করাইলেন এবং দেশরক্ষার্থে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। একটি নৌবাহিনীও তিনি গঠন করিলেন। সমাজে নারীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি, রাজনৈতিকক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাপন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা কিছু করিয়া দেশের মধ্যে তিনি এক নব যুগের সূচনা করিলেন। দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রীতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পারস্য' নামের পরিবর্তে ইরানী জাতির নামের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেশের নামকরণ করা হইল ইরান।

রেজাশাহের কার্যাদি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেজাশাহ্ জার্মান-প্রীতি প্রদর্শন করিলে ইঙ্গ-রুশ সৈন্য ইরানে প্রবেশ করিয়া খনিজ তৈলের উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি দখল করিল। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতির চাপে রেজাশাহ্ নিজ পুত্র মোহাম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: রেজাশাহের পদত্যাগ (১৯৪১)

Questions & Hints

No question has yet been asked on this chapter. A general knowledge of the affairs of the Middle East is, however, desirable.]

অষ্টাদশ অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(The United States of America)

স্বাধীন আমেরিকার সমস্যা (Problems of Independent America):

ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার মাত্র ছয় দিন পূর্বে (এপ্রিল ৩০, ১৭৮৯) আমেরিকার বিপ্লব সাফল্যের সহিত নিষ্পন্ন হইল। ঐ দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯-'৯৭)

স্বাধীন আমেরিকার উত্তরোত্তর উন্নতির ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক কেটেল্‌বি বলেন: 'আমেরিকা যেন একশত বৎসরের মধ্যে ইওরোপীয় অপরাপর দেশের হাজার বৎসরের ইতিহাসের বিবর্তন সম্পন্ন করিয়াছে।'* এই অসাধারণ দ্রুত উন্নয়নের পশ্চাতে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল সন্দেহ নাই। (১) ইওরোপ হইতে আমেরিকার দূরত্ব, (২) ইওরোপীয় রাজনীতির জটিলতা হইতে আমেরিকার স্বেচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততা, (৩) সামরিক নিরাপত্তার জটিলতা-হীনতা প্রভৃতি কারণে আমেরিকা তাহার সম্পূর্ণ শক্তি নিজ ভাগ্যোন্নতিতে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সকল কারণ ভিন্ন অপর একটি কারণও আমেরিকার স্বপক্ষে ছিল। (৪) ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায় আমেরিকাকে দীর্ঘকাল-প্রচলিত কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ঐতিহ্য, বাধা-বিপত্তি কোন কিছুরই সম্মুখীন হইতে হয় নাই। পুরাতন শহরের নাগরিক জীবনকে ব্যাহত না করিয়া শহরের সংস্কার সাধন করা এবং একেবারে নূতন স্থানে নূতন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর-স্থাপনের যে আপেক্ষিক অসুবিধা ও সুবিধা থাকে, সেইরূপ সুবিধালাভে আমেরিকা ইওরোপীয় দেশগুলি অপেক্ষা অধিকতর

মার্কিন উন্নতির মূল কারণ

* "She (America) seems to have compressed into one century historical processes which in Europe have extended over more than a thousand years." Ketelbey, p. 534.

সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল সুবিধার জন্য আমেরিকাবাসীরা তাহাদের ইংরেজ পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষা যে ভিন্নপ্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছিল তাহা উপলব্ধি না করিবার ফলেই ইংরেজ রাজনীতিকগণের মার্কিন নীতির বিফলতা পরিলক্ষিত হয়।* অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে, ইংরেজ ঐতিহ্যের সহিত ফরাসী দার্শনিকদের মতবাদের সংমিশ্রণ সাধন করিয়াই মার্কিন জাতি তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল ও পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ইংরেজ ঐতিহ্য ও ফরাসী দর্শনের সংমিশ্রণে মার্কিন স্বাধীনতা ও শাসন-পদ্ধতির জন্ম

নব-লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর করা ছিল ঐ সময়ের প্রধান সমস্যা। ইহা ভিন্ন যুদ্ধের ঋণ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, উপনিবেশগুলির নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা, রাজতন্ত্রের সমর্থকদের দেশত্যাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা স্বাধীন মার্কিন সরকারের দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল।

স্বাধীন আমেরিকার সমস্যা

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আমেরিকার উপনিবেশগুলি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট হইলেন এই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। মণ্টেস্কুর ক্ষমতাবিভাজন নীতি (Theory of Separation of Powers) অনুসরণ করিয়া প্রেসিডেন্ট ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে আইন-সভার প্রাধান্য-মুক্ত রাখা হইল। কংগ্রেস নামক আইন-সভার 'সিনেট' ও 'হাউস-অব-রিপ্রেজেন্‌টেটিভস্' (Senate & the House of Representatives) নামে দুইটি কক্ষ গঠন করা হইল। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন-কানুন শাসনতন্ত্র-বিরোধী কিনা বিচার করিবার এবং শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা প্রেসিডেন্ট নিয়োগের প্রথা গৃহীত হইল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington) ঃ

জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট সর্ব-সম্মতিক্রমে

*"Do not make any difference between your American and your British subjects' said Dr. Johnson, and, acting on this advice George III lost a continent." Vide Ketelbey, p. 536.

নির্বাচিত হইলেন। আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতাদের অন্যতম হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটন নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট হইবার দাবি ওয়াশিংটন অপেক্ষা অপর কাহারও ছিল না, বলা বাহুল্য।

প্রেসিডেন্ট-পদে ওয়াশিংটনের দাবি

জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহার চরিত্রের নৈতিকতা ও সততা, তাঁহার সংযম ও অধ্যবসায়, সর্বোপরি তাঁহার দেশাত্মবোধ ও সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহাকে নৈতিকতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার বা কূটবুদ্ধির কোন স্থান ছিল না। উচ্চ শিক্ষা বা প্রতিভা তাঁহার যে খুব বেশি ছিল এমন নহে, তথাপি কল্যাণের পথে মার্কিন জাতিকে চালিত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল অপরিসীম। 'শান্তিতে বা যুদ্ধে, অথবা জনসাধারণের হৃদয়ে তাঁহার স্থান ছিল সর্বপ্রথম।'* আমেরিকার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে গভীর বিশ্বাস, ধর্মপ্রবণতা, নিরপেক্ষ বিচার-ক্ষমতা, অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অপরাপর বৈশিষ্ট্য।

জর্জ ওয়াশিংটনের চরিত্র

জর্জ ওয়াশিংটন যখন প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন তখন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের সকল সমস্যাই বর্তমান ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসস্থান, কংগ্রেসের অধিবেশন-গৃহ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনী, মন্ত্রিসভা,বিচারপতি কোন কিছুই ছিল না। তদুপরি বিভিন্ন উপনিবেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থজ্ঞান ও পরস্পর-প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি, অর্থ নৈতিক দুর্বলতা, পররাষ্ট্রীয় নীতি সম্বন্ধে দুর্বলতা, সর্বদিক দিয়া জর্জ ওয়াশিংটনের সমস্যার অন্ত ছিল না। তিনি নিজেও প্রথমে এই পরিস্থিতিতে ভীত না হইলেও, কতকটা সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।† কিন্তু তাঁহার একনিষ্ঠ দেশপ্রেম এবং জনকল্যাণার্থে আত্মত্যাগ এইরূপ সমস্যা-

ওয়াশিংটনের সমস্যা

*"First in peace, first in war, and first in the hearts of his countrymen"—*Henry Lee*, vide, Ketelbey, p. 547.

†"My movements to the chair of government will be accompanied by feeling not unlike those of a culprit who is going to the place of his execution."—*Washington to General Knox*, vide, Ketelbey, p. 549.

সঙ্কুল পরিস্থিতিতেও তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র সেক্রেটারী ছিলেন জেফারসন্ এবং রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন্। হ্যামিল্টন্ ছিলেন একাধারে একজন সুদক্ষ সামরিক নেতা, দার্শনিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক, আইনজ্ঞ, বাগ্মী ও অর্থনীতিক। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদা লাভের একমাত্র পন্থা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই কারণে হ্যামিল্টন্ নানাপ্রকার কর স্থাপন করিয়া ইউনিয়ন সরকারের আয় বৃদ্ধি করিলেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য যে ঋণ হইয়াছিল তাহা তিনি রাজ্য সরকারগুলির উপর হইতে ইউনিয়ন সরকারের হস্তে আনিলেন। এইভাবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিলেন। জাতীয় ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করিলেন। ওয়াশিংটন নামক শহর স্থাপন করিয়া উহাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী করিবার ব্যবস্থা শুরু হইল।

আভ্যন্তরীণ শাসন

পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও জর্জ ওয়াশিংটনের আমলে আমেরিকার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। ফরাসী বিপ্লব শুরু হইলে ফ্রান্সের প্রতি স্বভাবতই আমেরিকায় সহানুভূতি প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ওয়াশিংটন ব্রিটেনের সহিত সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদান রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা ভিন্ন, আমেরিকা কোন যুদ্ধে লিপ্ত হউক ইহা তিনি চাহিতেন না। এই দুই কারণে তিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধে নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করিলেন। এই নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের ফলে ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইল, কারণ আমেরিকা বিবদমান দেশগুলিকে সমভাবে মাল সরবরাহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইংলণ্ড অবশ্য আমেরিকাকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিল না। এমন কি মার্কিন জাহাজে করিয়া কোন কোন সামগ্রী ফ্রান্সে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল ও ব্রিটিশ পশ্চিম ভারতীয় (British West Indies) অঞ্চলে কয়েকটি মার্কিন জাহাজও আটক করিল। এই সূত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে তিনি স্বীকৃত হইলেন। তিনি ফরাসী দূত সিটিজেন জেনেট (Citizen Genet)কে অপসারণের জন্য ফরাসী

ওয়াশিংটনের আমলে পররাষ্ট্র-নীতি

সরকারকে অনুরোধ জানাইলেন। এই সময়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং মার্কিন অভিযোগের অনেক কিছু দূরীভূত করা সম্ভব হয়। এই চুক্তি আমেরিকাবাসীর মধ্যে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করে।

এই সময় হইতে মার্কিন রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি হয়। হ্যামিল্টন্ ও অপরাপর অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন।

রাজনৈতিক বিভেদ : 'ফেডারেলিস্ট্' ও 'রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট' দলের উত্থান

জেফারসন্ ও অপরাপর অনেকে ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি-নীতির বিরুদ্ধে। এই দুইয়ের প্রথম দল 'ফেডারেলিস্ট্', (Federalist) এবং অপর দল 'রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট' (Republican-democrat) দল নামে অভিহিত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসন্ সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কালে ওয়াশিংটনের শাসনের এমন কি

ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্ট পদ প্রত্যাখ্যান

ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আক্রমণ করা হইতে থাকে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনকে তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট-পদ দান করা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

জন এ্যাডামস্ (John Adams) :

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ ছিলেন ফেডারেলিস্ট্ দলভুক্ত।

প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ (১৭৯৭—১৮০১)

রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট দল জেফারসন্‌কে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচন করিতে সমর্থ হয়। এ্যাডামসের আমলে ফেডারেলিস্ট্ দলের শক্তি আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার ত্রুটির জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে পর পর কয়েকবার পরাজিত হওয়ার ফলে

এ্যাডামসের আমলে পররাষ্ট্র-নীতি : নেপোলিয়নের সহিত চুক্তি (১৮০০)

স্বভাবতই ফ্রান্স আমেরিকাকে ফরাসী সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা-যুদ্ধের কালে প্রদত্ত ঋণ শোধের জন্য চাপ দিল। এই বিষয় লইয়া ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন-ফরাসী চুক্তি নাকচ করিয়া এক নূতন চুক্তি দ্বারা (১৮০০) আমেরিকার সহিত মিটমাট করিয়া লইলেন। আমেরিকা পুনরায় নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিল।

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে এ্যাডামসের আমলে 'বিদেশী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' (Alien and Sedition Acts)—এই দুইটি আইন পাস করিয়া ফেডারেলিস্ট্ দলের শত্রুপক্ষকে দমন করিবার চেষ্টার ফলে দেশের সর্বত্র সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ফলস্বরূপ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন এবং 'রিপাব্লিক-ডেমোক্রেট' দল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলে পরিণত হইল।

এ্যাডামস্ ও ফেডারেলিস্ট্ দলের পতন: জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

জেফারসন্ (Jefferson):

মার্কিন ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই ভার্জিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, জন মার্শাল, জেফারসন্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভার্জিনিয়াবাসী জেফারসন্

জেফারসনের চরিত্রে কতকগুলি বিরুদ্ধ গুণাবলীর সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চেহারা মোটেই সুদর্শন ছিল না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য এবং প্রীতিপূর্ণ আলাপ ও ব্যবহার তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দেশপ্রেম ও উদারতা, দার্শনিকসুলভ চিন্তাশক্তি ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও চক্রান্তপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ-মাত্রেরই মৌলিক অধিকারের নীতিতে প্রকাশ্যভাবে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু দাস-প্রথা সমর্থনকারীদের একটি দলগঠনের তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা ও ভার্জিনিয়া রাজ্যে ধর্মনৈতিক স্বাধীনতার আইনের রচয়িতা এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা হিসাবে মার্কিন ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

চরিত্র

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে জেফারসনের নীতি ছিল ব্যয়সঙ্কোচ-সাধন এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় তিনি "সকলের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, সততার ভিত্তিতে সকল জাতির প্রতি মৈত্রী এবং

কাহারো সহিত জটিল চুক্তি-সম্পাদন হইতে বিরত থাকা'* তাঁহার শাসনের মূল নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব সরকার কর্তৃক গৃহীত 'বিদেশী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' সম্পর্কিত আইন বাতিল করিয়া দিয়া এই দুই আইনের বলে যাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। তিনি ফেডারেলিস্ট্ কর্মচারীদের স্থলে ডেমোক্রেটিক মতাবলম্বীদের নিযুক্ত করিলেন। প্রথমে তিনি রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা-বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা-বৃদ্ধির পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়, যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন এবং ভাল ভাল রাস্তা দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও আয়-বৃদ্ধির নীতি তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ওহিও (Ohio) রাজ্যের সহিত যোগাযোগের জন্য উন্নত ধরণের রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জলদস্যুদের হাত হইতে মার্কিন নৌ-বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য তিনি ট্রিপলির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (১৮০১—'৫)। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র দেড় কোটি ডলার দিয়া তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নিকট হইতে লুসিয়ানা (Louisiana) নামক ফরাসী উপনিবেশটি ক্রয় করিয়াছিলেন। ৮ লক্ষ বর্গমাইল ভূমি এই সামান্য অর্থ দ্বারা ক্রয় করা জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা-ঘোষণার ন্যায়ই ইহা মার্কিন ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আভ্যন্তরীণ কার্যাদি

রাস্তা-নির্মাণ

পররাষ্ট্র-নীতি : ট্রিপলির সহিত যুদ্ধ (১৮০১—১৮০৫)

ফ্রান্স হইতে লুসিয়ানা ক্রয় (১৮০৩)

ঐ সময়ে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে অর্থনৈতিক অস্ত্রে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার 'কন্টিন্যান্টাল প্রথা' চালু করিয়াছিলেন। ব্রিটেনও উহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের পাল্টা জবাব হিসাবে 'অডার্স-ইন-কাউন্সিল' পাস করিয়াছিল। এই ভাবে উভয়পক্ষই পরস্পর পরস্পরের দেশের অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ক্রমে নিরপেক্ষ দেশগুলি, বিশেষতঃ আমেরিকার

*'Justice to all men, honest friendship with all nations, entangling alliances with none.'—*Jefferson in his inaugural speech.* Vide, Ketelbey, p. 556

সামুদ্রিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ জাহাজগুলি মার্কিন জাহাজ তল্লাসী শুরু করিল। এমনকি ব্রিটিশ জাহাজে নাবিকের কাজ ত্যাগ করিয়া যাহারা মার্কিন জাহাজে কাজ গ্রহণ করিয়াছিল, ব্রিটিশ জাহাজগুলি তাহাদিগকে বলপূর্বক মার্কিন জাহাজ হইতে লইয়া যাইতে লাগিল। জেফারসন্ অবশ্য এই কারণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না। এই সূত্রে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের শাসনকালে ব্রিটেনের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। জেফারসন্ দুইবার প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইয়া আট বৎসর আমেরিকার আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন করিয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরস্পর অর্থ নৈতিক অবরোধসূত্রে মার্কিন বাণিজ্য ও জাহাজের উপর আক্রমণ

জেম্‌স্ ম্যাডিসন্ (James Madison): পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জেম্‌স্ ম্যাডিসন্ ১৮০৯ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইবার প্রেসিডেন্ট-পদে বহাল ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন্ (১৮০৯-'১৭)

ম্যাডিসনের আমলের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ (১৮১২—১৪)। এই যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ দেখা দেয়। জেফারসনের আমলেই ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। ম্যাডিসন্ মার্কিন জনমতের চাপে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথমে মার্কিন জাহাজের আক্রমণে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজিত হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ জাহাজের আক্রমণে মার্কিন জাহাজ পশ্চাদপসরণ করিল। পেনিনসুলার যুদ্ধের পর ব্রিটিশবাহিনী আমেরিকা আক্রমণ করিয়া ওয়াশিংটন শহর দখল করিল এবং হোয়াইট হাউস ভস্মীভূত করিল।

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ: মার্কিন স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ

অপর এক ব্রিটিশ বাহিনী অর্লিয়েন্স দখল করিতে গিয়া পরাজিত হইল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল এবং মার্কিন অভিযোগের প্রায় সব কিছুই দূরীভূত হইল। এই সূত্রে কানাডা ও আমেরিকার সীমারেখাও নির্ধারিত হইল।

ইঙ্গ-মার্কিন শান্তিচুক্তি

জেম্‌স্ মন্‌রো (James Monroe) : ম্যাডিসনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেম্‌স্ মন্‌রো। মন্‌রোর আমলে জাতীয়তাবোধের এক ব্যাপক প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। ১৮১২—'১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন জাতীয়তাবোধের আবেগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারই প্রকাশ মন্‌রোর আমলে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতে পরিলক্ষিত হয়।

প্রেসিডেন্ট জেম্‌স্ মন্‌রো (১৮১৭—'২৫)

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার সহিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে আমেরিকা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অতি দৃঢ় ও অনমনীয় নীতি গ্রহণ করিলে এই বিবাদ আমেরিকার স্বপক্ষে মীমাংসিত হয়। এই ঘটনার ছয় বৎসর পর আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে মেটারনিক্-প্রভাবিত কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of Europe) এই বিদ্রোহ দমনে উদ্যোগী হয়। ঐ সময়ে প্রেসিডেন্ট মন্‌রো তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো-নীতি'* (Monroe Doctrine) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা দ্বারা প্রেসিডেন্ট মন্‌রো স্পষ্ট ভাষায় ইওরোপীয় দেশগুলিকে জানাইলেন যে, আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় দেশসমূহের উপনিবেশ-স্থাপনের স্থল নহে। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পক্ষে আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ-বিস্তার আমেরিকার নিরাপত্তা-বিরোধী এবং কোন শক্তি এই পন্থা অনুসরণ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহা শত্রুতা-মূলক কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। মন্‌রো-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল (১) ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে আমেরিকাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ হইতে মার্কিন গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। (২) ইহা ভিন্ন 'আমেরিকা আমেরিকা-বাসীদের জন্য' এই নীতি প্রচার করা, এবং (৩) আমেরিকাবাসীকে এক বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ করা।† পরবর্তী-

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি

মন্‌রো-নীতি 'Monroe Doctrine'

মন্‌রো-নীতির গুরুত্ব

* 'Hands off America', 'America for the Americans', 'Our country right or wrong'—and such other expressions were characteristic of the age of national and Pan-American enthusiasm of the time.

†"The occasion has been judged proper for asserting as a principle in which the rights and interests of the United States are involved, that

কালে আমেরিকার স্বার্থের প্রয়োজনমত মন্‌রো নীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। মন্‌রো নীতি হইতেই আমেরিকা পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিকতার নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

আমেরিকায় যে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশ পাইয়াছিল, উহা আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে সাহিত্য, আইন-কানুন, প্রভৃতি সব কিছুতে পরিলক্ষিত হয়। ইমার্‌সন, হথর্ণ, ফেনিমোর, পো, ব্যান্‌নক্রফ্‌ট, হোমস্‌, লুটিয়ার, লংফেলো প্রভৃতি সাহিত্যকারগণ মার্কিন জাতীয় সাহিত্য গঠনে ব্রতী হইলেন। জন মার্শাল সুপ্রীম কোর্টের বিচারের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের নূতন এবং প্রগতিশীল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন-ব্যবস্থা, রাস্তা, খাল, রেলপথ প্রভৃতির ফলে জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নীত হইল। কিন্তু এই জাতীয়তাবোধের অন্তরালে উত্তর ও দক্ষিণাংশের রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবধানের প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পার্থক্য

উত্তরের রাজ্যগুলি শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে লাগিল, অপর দিকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি কৃষির উপর জোর দিল। কৃষির প্রাধান্য হেতু দাস-প্রথা বজায় রাখা তাহাদের স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় ছিল।

---

the American continents, are henceforth not to be considered as subjects for future colonisation by any European powers.

"......It is only when our rights are invaded or seriously menaced that we resent injuries or make preparation for our defence......The political system of the allied powers (Austria, France, Prussia and Russia) is essentially different in this respect from that of America......We owe it therefore, to cando(u)r and to the amicable relations existing between the United States and those powers to declare that we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace aud safety. With the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfered and shall not interfere. But with the Governments who have declared their independence and maintained it, and whose independence we have, on great consideration and on just principles, acknowledged. We could not view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling in any other manner their destiny, by any European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States." *Extracts from President Monroe's Declaration of December 2nd, 1823.* Vide, E. H. Carr, Appdx. I, p. 281.

এনড্রু জ্যাক্সন্ * (Andrew Jackson):

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এনড্রু জ্যাক্সনের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচন (১৮২৯—'৩৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁহার আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি কর্তৃক 'দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘ' স্থাপনে বাধা দান। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ (১৮২৫—'২৯)-এর আমলে উচ্চ হারে শুল্ক (tariff) স্থাপন করিবার ফলে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষতি ঘটে। এই সূত্রে সাউথ কেরোলিনা রাজ্যের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কস্থাপনের ক্ষমতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি বলিয়া বিশ্লেষণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কস্থাপনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন। এই বিষয় লইয়া মার্কিন সিনেটে এক দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিভাজ্য এবং স্থায়ী এই নীতির উপর জোর দিয়া ইউনিয়নের শুল্কস্থাপন নীতির সমর্থন করেন। সাউথ ক্যারোলিনার নেতৃত্বে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণের

প্রেসিডেন্ট জ্যাক্সন্ (১৮২৯—'৩৭)

মার্কিন ইউনিয়ন রক্ষা

* **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণ:**

জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯—১৭৯৭) (দুইবার নির্বাচিত), জন এ্যাডামস্ (১৭৯৭—১৮০১), টমাস্ জেফারসন্ (১৮০১—১৮০৯) (২), জেম্স্ ম্যাডিসন্ (১৮০৯—১৮১৭) (২), জেম্স্ মনরো (১৮১৭—১৮২৫) (২), জন কুইন্সি এ্যাডামস্ (১৮২৫—১৮২৯), এনড্রু জ্যাক্সন্ (১৮২৯—১৮৩৭) (২), মার্টিন বুরেন্ (১৮৩৭—১৮৪১), উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (১৮৪১—'৪১), জন টাইলার (১৮৪১—১৮৪৫), জেম্স্ পক্ (১৮৪৫—১৮৪৯), জেকারে টেলর (১৮৪৯—১৮৫০), মিলার্ড ফিলিমোর (১৮৫০—১৮৫৩), ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স (১৮৫৩—১৮৫৭), জেম্স্ বুকানন (১৮৫৭—১৮৬১), আব্রাহাম্ লিঙ্কন (১৮৬১—১৮৬৫) (২), এনড্রু জনসন্ (১৮৬৫—১৮৬৯), ইউলিসিস্ গ্র্যাণ্ট্ (১৮৬৯—১৮৭৭) (২), রাদার ফোর্ড হেইস্ (১৮৭৭—১৮৮১), জেম্স্ গার্ফিল্ড্ (১৮৮১—'৮১), চেষ্টার আর্থার (১৮৮১—১৮৮৫), গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড্ (১৮৮৫—১৮৮৯), বেঞ্জামিন্ হ্যারিসন (১৮৮৯—১৮৯৩), গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড (১৮৯৩—১৮৯৭), উইলিয়াম ম্যাক্কিনলি (১৮৯৭—১৯০১) (২). থিয়োডোর রুজ্ভেল্ট্ (১৯০১—১৯০৯) (২), উইলিয়াম ট্যাফ্ট্ (১৯০৯—১৯১৩), উড্রো উইলসন্ (১৯১৩—১৯২১) (২), ওয়ারেন্ হার্ডিং (১৯২১—১৯২৩), ক্যাল্ভিন্ কুলীজ (১৯২৩—১৯২৯) (২), হার্বার্ট হুভার (১৯২৯—১৯৩৩), ফ্রাঙ্কলিন রুজ্ভেল্ট (১৯৩৩—১৯৪৫), ট্রুম্যান (১৯৪৫—১৯৫২), আইসেন হাওয়ার (১৯৫২—)।

রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের চেষ্টা করা হইলে জ্যাক্‌সন্ সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই বিবাদের আপোষ-মীমাংসা হইল।

জ্যাক্‌সনের সময়ে রিপাব্‌লিকান ডেমোক্রেট দলের বিরুদ্ধে হুইগ দল নামে অপর একটি দলের সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে ফেডারেলিস্ট্ দলের অবশ্য পতন ঘটিয়াছিল। হুইগ দল পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিল। জর্জ ওয়াশিংটন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যাক্‌সনের আমল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার ক্রমোন্নতির তৃতীয় পর্যায় সম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের রিপাব্‌লিকান দল নামে একটি নূতন দলের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় হইতে অদ্যাবধি রিপাব্‌লিকান ও ডেমোক্রেটিক—এই দুই রাজনৈতিক দলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

হুইগ দলের সৃষ্টি

আব্রাহাম্ লিঙ্কন, ১৮৬১—১৮৬৫ (Abraham Lincoln):

আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম নেপোলিয়নের নামের ন্যায়ই অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জীবনী আমাদের মনে যেমন এক অবাক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তেমনি আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যুর মর্মান্তিকতা আমাদিগকে অভিভূত করে।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেণ্টুকী নামক রাজ্যের এক কাঠের কুটিরে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জন্ম হয়। শস্য-উৎপাদন, কাঠের ঘর নির্মাণ, নৌচালনা, কাঠ-কাটা প্রভৃতি দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ যাবতীয় কাজে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অসাধারণ দৈহিক শক্তির সহিত অনন্যসাধারণ মানসিক বলের এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। চিন্তাশীলতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়াপ্রবণতা, সরলতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহার চরিত্রকে সর্বজনের শ্রদ্ধার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল অপরিসীম এবং সাধারণ জ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

লিঙ্কনের জন্ম (১৮০৯)

চরিত্র

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়নয়েস (Illionois)-এর পরিষদে ডগ্‌লাস নামে

অপর একজন সদস্যের সহিত সিনেটের সভ্যনির্বাচন সম্পর্কে তিনি এক বিতর্কে উপস্থিত হন। এই বিতর্কে তিনি নবগঠিত (১৮৫৪) রিপাব্‌লিকান বা প্রজাতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক আদর্শের যে সুযৌক্তিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে সমগ্র জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ঘটনার পূর্বে দীর্ঘ আট বৎসর তিনি ইলিয়নয়েস পরিষদের সদস্য ছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার প্রতিভার কোন পরিচয় কেহ পায় নাই। আইনজীবী হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বা অর্থাগম হইত না। প্রথমে তিনি হুইগ (Whig) দলের সমর্থক ছিলেন এবং হুইগ দল ক্ষমতা লাভ করিলে তিনি General Land office-এ কমিশনারের পদপ্রার্থী হন। তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত না করিয়া অরিগন (Oregon) রাজ্যের গবর্ণরের পদ দেওয়া হয়। আব্রাহাম্ এই পদ ত্যাগ করেন। যাহা হউক, ইলিয়নয়েস পরিষদে দীর্ঘ আট বৎসর অভিজ্ঞতা লাভের ফলে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিল। এমন সময়ে ডগ্‌লাসের সহিত বিতর্কে নিজ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে তিনি রিপাব্‌লিকান দলের প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ঐ সময়ে ডেমোক্রেটিক দলের আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে তাঁহার জয়লাভ সহজ হইয়াছিল। এইভাবে কাঠের কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি নিজ প্রতিভাবলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পদ লাভে সমর্থ হইলেন।

ডগ্‌লাসের সহিত বিতর্ক (১৮৫৬)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত (১৮৬১)

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His aims and policy) ঃ

(১) আব্রাহাম্ লিঙ্কন ক্রীতদাস-প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি তাহাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনই প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন উদার মনোবৃত্তির দিক হইতেও উত্তরাঞ্চলের দেশগুলি দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। সুতরাং উত্তরাঞ্চলে দাস-প্রথার উচ্ছেদ যখন নীতিগতভাবে এবং প্রকৃতক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, ঐ সময়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলি কৃষির সুবিধার জন্য দাস-ব্যবসায় চালাইতেছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার একাংশে দাস-প্রথার উচ্ছেদ হইবে ও অপরাংশে উহা চালু থাকিবে এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার

(১) ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন

পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট-পদ লাভের পুর্বেই তাঁহার দাস-প্রথার বিরোধিতা সম্পর্কে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে দাস-প্রথা উচ্ছেদের আশঙ্কা জন্মিল। (২) আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা আব্রাহাম্ লিঙ্কন একটি পবিত্র দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-স্থাপনের প্রথম হইতেই উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মতভেদ ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শুল্কস্থাপন ব্যাপারে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি আলাদা একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিক দলের নেতা আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলে গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি স্বভাবতই সন্তুষ্ট হইল না। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন মার্কিন ইউনিয়ন (Union) রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এইজন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা

লিঙ্কন ও অন্তর্যুদ্ধ (Lincoln and the Civil War)ঃ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চলের জর্জিয়া, টেক্সাস্, ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা, আলাবামা ও মিসিসিপি—এই ছয়টি রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (Union) ত্যাগ করিয়া এক ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিলে লিঙ্কন সামরিক সাহায্যে ঐ সকল রাজ্যকে পরাজিত করিয়া পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনিলেন। এই অন্তর্যুদ্ধের সময়ই তিনি ঘোষণা দ্বারা দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। (অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশদ আলোচনা নিম্নে দ্রষ্টব্য)

উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্যুদ্ধ ঃ দক্ষিণাঞ্চলের পরাজয়

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণের রাজ্যগুলি পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে উহার পাঁচ দিন পর এক প্রেক্ষাগৃহে জন উল্‌কিস্ বুথ্ (John Wilkes Booth) নামে একজন অভিনেতার গুলিতে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রাণ হারাইলেন (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫)।

লিঙ্কনের মৃত্যু (১৮৬৫)

লিঙ্কনের কৃতিত্ব (Estimate of Lincoln)ঃ সামান্য কুটিরবাসী আব্রাহাম্ লিঙ্কনের মার্কিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-পদ লাভ গণতান্ত্রিক ব্যক্তি-সাম্যের চরম নিদর্শন সন্দেহ নাই। অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও জনকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা তাঁহাকে কুটির

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

হইতে 'হোয়াইট হাউস' (White House)-এ উন্নীত করিয়াছিল। দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী আব্রাহাম্ লিঙ্কন যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করিতেন এবং যাহা ন্যায় ও সততার উপর নির্ভরশীল উহার রক্ষার জন্য যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন দয়াপ্রবণ, অকুতোভয়-চিত্ত সরলপ্রাণ মহৎ ব্যক্তি।

প্রেসিডেণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সেই সুযোগে স্বৈরাচারী হইয়া উঠেন নাই।

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ

ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তিনি মানুষ-মাত্রেরই স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি মানুষের আদিম এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বার্থলোলুপ মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর পাশবিক নির্যাতনের . অবসান ঘটাইযাছিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা করিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা

জর্জ ওয়াশিংটন যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন তেমনি আমেরিকার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আব্রাহাম্ লিঙ্কন আমেরিকার ঐক্য রক্ষা করিয়া সেই স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের রাজনৈতিক ভাবধারা সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা

তিনি গণতন্ত্রকে 'Government of the people, by the people and for the people' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের ইতিহাসে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জীবনী এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়া আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথার অবসান (Abolition of Slavery in the U. S. A.) :

ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক ওলন্দাজ বণিক মাত্র কুড়িজন আফ্রিকাবাসীকে

ধরিয়া লইয়া গিয়া আমেরিকার জেম্‌স্ টাউনে বিক্রয় করে। ঐ সময় হইতে ইওরোপীয় বণিকদের অর্থগৃধ্নুতার ফলে অসংখ্য ক্রীতদাস আমেরিকায় আমদানি করা হয়। নূতন উপনিবেশ বিস্তারের যাবতীয় দৈহিক শ্রম অতি সামান্য খরচে ক্রীতদাসদের দ্বারা করান সম্ভব হইত। এইজন্য ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় আমেরিকায় এক অতি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাসের সংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও অধিক হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন একমাত্র ম্যাসাচুসেট্‌ ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশেই দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় 'মানুষ মাত্রেই সমান অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে' ("All men were created equal")-এই নীতি প্রচার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিগ্রো ক্রীতদাসদিগের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য ছিল না।

আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার সূত্রপাত

স্বাধীনতা ঘোষণার কালে ম্যাসাচুসেট্‌ ভিন্ন আমেরিকার সর্বত্র ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত

চিন্তাশীল, উদারচেতা আমেরিকাবাসীদের অনেকেই অবশ্য ক্রীতদাস প্রথার অ-নৈতিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। এমন কি 'ম্যাসন-ডিক্সন্ লাইন' (Mason-Dixon line)-এর উত্তরস্থ সকল রাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অহিও নদীর উত্তর এবং এলিগানিজ অঞ্চলের পশ্চিমস্থ দেশগুলিতেও ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত থাকিলেও সেখানেও উহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রেসিডেণ্ট জেফারসন্ ক্রীতদাসগণকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি দিয়া তাহাদের নিজ দেশ আফ্রিকায় ফেরৎ পাঠাইবার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন করিয়া ক্রীতদাস-ব্যবসা আমেরিকায় নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ : দক্ষিণাঞ্চলেও বিলুপ্ত-প্রায়

ক্রীতদাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করণ (১৮০৮)

এইভাবে ক্রীতদাস প্রথা যখন ক্রম-বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটে। শিল্প-বিপ্লবে বয়নশিল্পের উন্নতি সাধিত

হইলে তুলার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল ছিল তুলাচাষের উৎকৃষ্ট স্থান। তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সস্তা শ্রমেরও প্রয়োজন হইল। ফলে, দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি স্বভাবতই ক্রীতদাস প্রথা লাভজনক মনে করিল। কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চল স্বাধীনতার সময় হইতেই ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল।*

শিল্প-বিপ্লব : দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাস প্রথার গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নিকট হইতে লুসিয়ানা ক্রয় করিবার পর এই স্থানের একাংশ 'মিসোরি' (Missouri) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'মিসোরি মীমাংসা' (Missouri Compromise) নামে এক চুক্তি দ্বারা মিসোরি রাষ্ট্রকে ক্রীতদাস প্রথা চালু রাখিবার অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু মিসোরির দক্ষিণ সীমান্তবর্তী কতকাংশ ক্রীতদাস-প্রথা-মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিহেতু ক্রীতদাস প্রথা সেখানে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ক্রীতদাস প্রথার সমর্থকদেরও অভাব হইল না। তাহাদের মতে কাল-চামড়া নিগ্রোদের সহিত সাদা-চামড়া ইউরোপীয়দের 'ক্রীতদাস ও প্রভু' এই সম্বন্ধ ভিন্ন অপব কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, নিগ্রোগণ কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম এবং শিক্ষা দান করা যদি বা সম্ভব হয় তবে উহার ফল হয় বিষময়, কারণ নিগ্রোরা তাহাতে বিদ্রোহ করিবার সামর্থ্য লাভ করে। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিগ্রোদিগকে পশুর স্তরে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করিত।†

মিসোরি মীমাংসা (১৮২০)

ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চল

* "America entered into the shadow of the civil war before she had emerged from that of the War of Independence" Quoted by Ketelbey, p. 576.

† ইংরেজী নাট্যকার শেক্‌স্‌পিয়ারের 'Tempest' নাটকে এই মনোবৃত্তির সুন্দর উল্লেখ রহিয়াছে :

"Prospero : Abhorred slave,
Which any print of goodness wilt-not take,
Being capable of all ill ! * * *
Caliban : You taught me language ; and my profit on't
Is, I know how to curse. The red plague rid you
For learning me your language ! ' *The Tempest*, Act I (ii).

কিন্তু আব্রাহাম্ লিঙ্কনের ন্যায় উদারমনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই প্রথার সমর্থন করা দূরের কথা, উহা জঘন্যতম নীচতা বলিয়াই মনে করিতেন। 'দাসত্ব প্রথা যদি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন কিছুই অন্যায় নহে'—এই কথা আব্রাহাম্ লিঙ্কন বলিতেন।*

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের ক্রীতদাস প্রথার বিরোধিতা

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের মতবাদে প্রভাবিত উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাস প্রথার প্রসার বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। ইহাদের মধ্যে একদল ছিল উগ্র মতবাদাবলম্বী। এই দল দক্ষিণাঞ্চল হইতেও ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের দাবি করিতেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ছিল তাহাদের স্বার্থবিরোধী। এই কারণে তাহারা ক্রীতদাস প্রথা চালু রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইন পাস করিয়া দাস-প্রথার বিলোপ সাধন করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এক শাসন-তান্ত্রিক প্রশ্ন উথাপন করিল। তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কতকগুলি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সংঘ বলিয়া বর্ণনা করিতে চাহিল এবং যেহেতু উহা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘ সেজন্য ইচ্ছামত যে-কোন রাষ্ট্র এই সংঘ হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে এই যুক্তি দেখাইল। মেক্সিকো হইতে বিজিত অংশে দাস-প্রথা প্রবর্তন এবং কেলিফোর্ণিয়া রাষ্ট্র দাস-প্রথার সমর্থক অথবা দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে—এই দুই প্রশ্ন লইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইল। দক্ষিণাঞ্চল হইতে পলাতক ক্রীতদাসগণ উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় লইত। এই বিষয় লইয়াও বিবাদ লাগিয়া থাকিত। অবশেষে হেন্‌রী ক্লে (Henry Cley) নামে একজন নেতার চেষ্টায় এই বিরোধের মীমাংসা হইল। এই মীমাংসা অনুসারে কেলিফোর্ণিয়া দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার পলাতক ক্রীতদাসদিগকে পুনরায় নিজ রাষ্ট্রে ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন (Fugitive Slave Act) পাস করিবেন।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিভেদ

ক্লে-মীমাংসা (১৮৫০)

---

* "If slavery is not wrong, then nothing is wrong". *Abraham Lincoln.* Vide Ketelbey, p. 578.

ক্লে-মীমাংসা (Cley Compromise)-এর পর সাময়িকভাবে ক্রীতদাস প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধের শান্তি হইল। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হোরিয়েট বীচার স্টো (Harriet Beecher Stowe) 'আঙ্ক্‌ল টমস্‌ ক্যাবিন' (*Uncle Tom's Cabin*) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলে দাসত্ব-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধ পুনরায় দেখা দিল। এই পুস্তকে ক্রীতদাসদের চরম দুর্দশার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে।

Uncle Tom's Cabin

কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্‌সাস্‌ নেব্রাস্কা (Kansas Nebraska) আইন পাস করিয়া কান্‌সাস্‌ অঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা-প্রবর্তন আইনসিদ্ধ করা হইল। ইহা ভিন্ন এই আইন পাস করিবার ফলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মিসোরি মীমাংসাও বাতিল হইয়া গেল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেড্‌-স্কট্‌ (Dred-Scot) বিচারে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট 'মিসোরি মীমাংসা' অবৈধ ঘোষণা করিলেন এবং কোন আইন পাস করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ফলে ক্রীতদাস প্রথা হ্রাসপ্রাপ্ত বা সীমাবদ্ধ না হইয়া বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পাইল। এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক (Republican) দলের সৃষ্টি হইল। এই দলের মূলনীতি ছিল ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদসাধন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংহতিসম্পন্ন করা। এই নূতন প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন আব্রাহাম্‌ লিঙ্কন।

কান্‌সাস্‌ নেব্রাস্কা আইন (১৮৫৪): দাস-প্রথার সমর্থন

ড্রেড্‌-স্কট্‌ বিচার: দাস-প্রথা স্বীকৃত

নূতন রিপাব্‌লিকান দলের সৃষ্টি

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্‌ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে স্বভাবতই দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাধান্য আশঙ্কা করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিল। এই সূত্রে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা দ্বারা বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিতে দাস-প্রথা উচ্ছেদ করা হইল। ইহার পর দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ক্রীতদাসগণকে সুযোগ পাইলেই ধরিয়া আনিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে

আব্রাহাম্‌ লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট্‌-পদ লাভ: অন্তর্যুদ্ধ: দাস-প্রথার উচ্ছেদ (১৮৬৩)

স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে ভর্তি করা হইতে লাগিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের পরাজয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্ভুক্তির সময়ে দাস-প্রথারও উচ্ছেদ সম্পন্ন হইয়াছিল। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের দাস-প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা ইওরোপীয় উদারনৈতিক দেশগুলিরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

'কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান', 'হোয়াইট্ ব্রাদার-হুড্', 'পেল ফেসেস'

(অন্তর্যুদ্ধের অবসানে নিগ্রোদের মার্কিন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইল বটে কিন্তু তখনও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে নিগ্রোদিগকে পদানত করিবার গোপন চেষ্টা চলিল। দক্ষিণাঞ্চলের আমেরিকা-বাসী শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ 'কু-ক্লাক্স্-ক্ল্যান' (Ku-Klux-Klan), 'হোয়াইট্ ব্রাদারহুড' (White Brotherhood), 'পেল ফেসেস' (Pale Faces) নামে বিভিন্ন গোপন সমিতি স্থাপন করিয়া নিগ্রো-নির্যাতন সুরু করিল। মার্কিন সরকার এবং সুপ্রীম কোর্ট যদিও শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক ও কালো রংয়ের নিগ্রোদের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন তথাপি আমেরিকার কোন কোন স্থানে এখনও কালো-চামড়ার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।)

মার্কিন অন্তর্যুদ্ধ, ১৮৬১—'৬৫ (American Civil War) :

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বীজ

কারণ : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বীজ এই দুই অঞ্চলের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যেই নিহিত ছিল। 'স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় হইতেই আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল'—এই উক্তির সত্যতা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য

(১) উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি শিল্প-প্রধান। শিল্পোৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করিয়া উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপর পক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। তুলার চাষ-ই ছিল দক্ষিণাঞ্চলের সম্পদের প্রধান উৎস। এই অর্থ-নৈতিক পার্থক্য-ই ছিল এই দুই অঞ্চলের পরস্পর বিভেদের মূল কারণ।

পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে পশুপালন ও কৃষিকার্য ছিল প্রধান উপজীবিকা। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি উত্তরাঞ্চল হইতে প্রস্তুত সামগ্রী এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে পশু প্রভৃতি আমদানি করিত। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণ শুল্ক (Protective tariff) স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে উত্তরাঞ্চলের উপর শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য নির্ভরশীল দক্ষিণাঞ্চল শুল্কস্থাপনের ফলে বেশি দামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বাধ্য হইত। স্বভাবতই এই বিষয় লইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

(২) শুল্ক-সংক্রান্ত বিরোধ

(২) ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে খুব উচ্চ হারে শিল্প-সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তীব্র প্রতিবাদ করে। সাউথ কেরোলিনাবাসী ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট জন্ ক্যাল্হন্ এই বিষয় লইয়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ঐ সময়ে এক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপন করিল। তাহাদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘবিশেষ এবং এই কারণে শুল্ক-সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়া কোন কোন রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার বহির্ভূত। ইহা ভিন্ন আয়ের জন্য কর স্থাপন করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিলেও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া করস্থাপন ঐ অধিকারের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয় লইয়া সাউথ কেরোলিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে প্রেসিডেণ্ট জ্যাক্সন্ সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যুদ্ধ ঘটিল না। হেন্‌রী ক্লে (Henry Clay)-এর চেষ্টায় একটি পরিবর্তিত শুল্কনীতি গৃহীত হইল। ঐ সময়েই প্রেসিডেণ্ট এনড্রু জ্যাক্সন্ দক্ষিণাঞ্চলের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "শুল্কের প্রশ্ন একটি অজুহাত মাত্র। পরবর্তী অজুহাত নিগ্রো বা ক্রীতদাস প্রথা হইতে উদ্ভূত হইবে।"* জ্যাক্সনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ কেরোলিনার যুক্তরাষ্ট্র-ত্যাগের চেষ্টা

* "The tariff was a mere pretext........ The next pretext will be the negro or slavery"—*Andrew Jackson.* Vide Ketelbey, p. 573.

(৩) স্বাধীনতা ঘোষণার সময় একমাত্র ম্যাসাচুসেট্‌ রাষ্ট্র ভিন্ন আমেরিকার অপরাপর সকল রাষ্ট্রেই ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাসের প্রয়োজন তেমন না থাকায় ক্রমে সেই অঞ্চল হইতে ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতেও ক্রীতদাস প্রথা ক্রমেই বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিশেষভাবে হুট্‌নি কর্তৃক 'কটন জিন' আবিষ্কৃত হইলে তুলার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তুলার চাষ করিত। ক্রীতদাসের সস্তা শ্রম চাষের পক্ষে স্বভাবতই প্রয়োজন হইল। সুতরাং দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ব্যাপারে ক্রীতদাস প্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চল এবং ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হইল। এই বিবাদের ফলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের 'মিসোরি মীমাংসা' দ্বারা মিসোরিকে ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক দেশ হিসাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করিতে হইল। ইহা দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির জয়লাভের সামিল হইল। উত্তরাঞ্চল ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করা দূরের কথা, উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ফলে, কোন নূতন রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের আবেদন করিলেই দক্ষিণাঞ্চল উহাকে দাস-প্রথা-সমর্থক (Slave State) রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণের জন্য দাবি করিত ; অপরপক্ষে উত্তরাঞ্চল উহাকে দাস-প্রথা-মুক্ত (Free State) হিসাবে গ্রহণের চেষ্টা করিত। কেলিফোর্ণিয়ার ক্ষেত্রেও এইরূপ এক তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হেন্‌রী ক্লে (Henry Clay)-এর চেষ্টায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কেলিফোর্ণিয়াকে দাস-প্রথা-মুক্ত অঞ্চল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে উপস্থিত সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হইলেও উহার স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইল না। কেন্দ্রীয় সরকার পলাতক ক্রীতদাসগণকে নিজ নিজ রাজ্যে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত আইন-প্রণয়নে রাজী হইলেন।

(৩) দাস-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধ : উত্তরাঞ্চল দাস-প্রথার অবসানের পক্ষপাতী, দক্ষিণাঞ্চল উহা রক্ষা করার পক্ষপাতী

কেলিফোর্ণিয়া-সংক্রান্ত বিরোধ : সাময়িক মীমাংসা

(৪) ক্রীতদাস প্রথার সহিত গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িত ছিল।

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি উত্তরাঞ্চলের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিত না। নূতন উপনিবেশ উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ন্যায় দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইবে এই কারণেও ক্রীতদাস প্রথা অবসানের প্রশ্ন জটিলতর হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এক নূতন ব্যাখ্যা উত্থাপন করিল। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে যে-কোন রাষ্ট্র ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে এই দাবি তাহারা করিল। এ বিষয় লইয়াও যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমর্থকদের ও যুক্তরাষ্ট্র-ত্যাগের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল।

(৪) ক্রীতদাস প্রথার অন্তরালে রাজনৈতিক কারণ

ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের দাবি

(৫) কেলিফোর্ণিয়া-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার পর অল্পকাল শান্তিতে কাটিলেও হেরিয়েট বীচার স্টো নামে জনৈক মহিলা Uncle Tom's Cabin নামক একখানি পুস্তকে নিগ্রো ক্রীতদাসদের দুর্দশার বর্ণনা প্রকাশ করিলে ক্রীতদাস প্রথা অবসানের আন্দোলন পুনরায় তীব্র আকার ধারণ করিল। এমন সময় কান্‌সাস্ নেব্রাস্কা আইন পাসের দ্বারা এই দুই স্থানে ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করা বা প্রচলিত রাখা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অধিবাসী-দিগকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেড্-স্কট্ বিচারে সুপ্রীম কোর্ট ক্রীতদাসকে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং সেইহেতু ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ-সংক্রান্ত আইন মাত্রেই অবৈধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বভাবতই এক দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হইল। তাহারা দাস-প্রথা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে দেখিয়া অধিকতর তৎপর হইয়া উঠিল। এক নূতন রিপাব্‌লিকান দল গঠন করিয়া ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের আন্দোলন চালান হইল। এই দলের প্রধান নেতাদের অন্যতম ছিলেন আব্রাহাম্ লিঙ্কন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ব্রাউন নামে একজন ক্রীতদাস-প্রথা-উচ্ছেদকারী এক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া ক্রীতদাস-গণের মধ্যে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহ করিতে

(৫) 'Uncle Tom's Cabin'-এর প্রকাশ: ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি

কান্‌সাস নেব্রাস্কা আইন: ড্রেড্-স্কট্ বিচার

নূতন রিপাব্‌লিকান দলের সৃষ্টি

জন ব্রাউন কর্তৃক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

উৎসাহিত করিলেন। বিচারে ব্রাউনের ফাঁসি হইল। ফলে, দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের বিরোধের তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

(৬) আব্রাহাম্ লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচন : দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়ন-ত্যাগ : যুদ্ধের সূচনা

(৬) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির আশঙ্কা হইল যে, উত্তরাঞ্চলের দাস-প্রথা-উচ্ছেদকারী দল এইবার নিজ ইচ্ছামত সংস্কার সাধন করিয়া দক্ষিণাঞ্চলকে প্রত্যুত্তর দিবে। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের দাস-প্রথার প্রতি অপরিসীম ঘৃণার কথাও তাহাদের অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার আমলে কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসার আশা নাই মনে করিয়া সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে আলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুসিয়ানা, টেক্সাস ও জর্জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া এক পৃথক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিল। তাহারা সাম্টার দুর্গ (Fort Sumter) আক্রমণ করিলে আব্রাহাম্ লিঙ্কন সৈন্য প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। এই সময়ে ভার্জিনিয়া, টেনেসি, নর্থ কেরোলিনা ও আর্কানসাস্ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মিসোরি, কেণ্টুকি ও মেরিল্যাণ্ড এই তিনটি রাষ্ট্রের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া আব্রাহাম্ লিঙ্কন দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

যুদ্ধের গতি : প্রথমে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই লিঙ্কন যুদ্ধের গতি ইউনিয়নের পক্ষে ফিরাইতে সক্ষম হইলেন।

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের জয়লাভ

ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী যে সকল রাষ্ট্র ইউনিয়নের বহির্ভূত থাকিবে সেগুলির ক্রীতদাস মাত্রেই স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি এই ঘোষণা করিলেন। এইভাবে তিনি বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার সৃষ্টি করিলেন। লিঙ্কনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করা। সুতরাং ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ তখন সামরিক সুবিধার জন্যই তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন।*

* "My paramount object in this struggle is to save the Union and is not either to save or destroy slavery. If I could save the Union without freeing any slave I would do it, and if I could save it by freeing all the slaves I would do it : and if I could save it by freeing some and leaving others alone I would also do that. What I do about slavery and the coloured race, I do because I believe it helps to save the Union, and what I forbear I forbear because I do not believe it would help to save the Union." *Abraham Lincoln to Horace Greeley.* Vide Ketelbey, p. 585.

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়নের সৈন্য নিউ অর্লিয়েন্স দখল করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা ভিক্স্‌বার্গ জয় করিল। এই স্থান জয় করিবার ফলে মিসিসিপি নদীর উপর প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় উহার পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি অপরাপর বিদ্রোহী রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূহের জেনারেল লী (Lee) দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের রাজধানী রিচমণ্ড রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু পেনসিল্‌ভ্যানিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া গেটিস্‌বার্গ (Gettysburg)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (১৮৬৩)। এই যুদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দিল। এই যুদ্ধে পরাজয়, দীর্ঘকাল যুদ্ধের শ্রান্তি এবং জ্যাকসন্ নামক সুদক্ষ জেনারেলের মৃত্যু দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির পরাজয় ঘটাইল। ভার্জিনিয়া ও জর্জিয়া সহজেই পদানত হইল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লী'র আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনঃসঞ্জীবিত হইল।

ইউনিয়ন পক্ষের নিউ অর্লিয়েন্স ও ভিক্স্‌বার্গ দখল

গেটিস্‌বার্গের (১৮৬৩)

লী'র আত্মসমর্পণ : অন্তর্যুদ্ধের অবসান (১৮৬৫)

ফলাফল : মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের ফল আমেরিকার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। (১) এই যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা পাইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবনের ফলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আমেরিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। (২) এই যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যেই সামরিক সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আব্রাহাম্ লিঙ্কন দাস-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া ক্রীতদাসগণকে মানুষের আদিম অধিকারে স্থাপন করিয়াছিলেন। (৩) দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের শাসনতান্ত্রিক দাবি চিরতরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছিল। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি, মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (৪) অন্তর্যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকা মন্‌রো-নীতি অনুসরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে ব্যস্ত ছিল, ইহার পর হইতে বহির্জগতে আমেরিকা অধিকতর শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়সহ প্রবেশ করে।

(১) যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা

(২) ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ

(৩) যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের দাবি চিরতরে বাতিল

ট্রেণ্ট্ ও আলাবামা ঘটনা (Trent & Alabama Affairs) :

আব্রাহাম্ লিঙ্কন কর্তৃক ক্রীতদাস প্রথা অবসানের ঘোষণা ইওরোপীয়

দেশগুলির বিশেষতঃ ইংলণ্ডের আন্তরিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ ছিল ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সমর্থক, কিন্তু শাসক শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি সহানুভূতি ছিল বেশি। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী আমেরিকা অপেক্ষা বিভক্ত এবং দুর্বল আমেরিকার সৃষ্টি হউক ইহাই ছিল ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর ইচ্ছা। সুতরাং মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের সময়ে ট্রেণ্ট্ ও আলাবামা ঘটনা লইয়া উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল।

ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক সমর্থিত

ট্রেণ্ট্ (Trent) নামক এক ব্রিটিশ জাহাজে করিয়া দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের দুইজন দূত ইংলণ্ডে গমনকালে উত্তরাঞ্চলের নৌবাহিনীর একজন কর্মচারী ক্যাপ্টেন উইলকিস্ ঐ জাহাজটি তল্লাসী করেন এবং ঐ দুইজন দূতকে ধরিয়া লইয়া যান। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এইরূপ আচরণ অবৈধ ছিল। আব্রাহাম্ লিঙ্কন এই দুইজন দূতকে ফিরাইয়া দিয়া এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন।

'ট্রেণ্ট্' ঘটনা

অপর ক্ষেত্রে আলাবামা (Alabama) নামে লিভারপুল নৌ-কারখানায় নির্মিত একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ব্রিটিশ সরকারের গোপন অনুমতি অথবা অসাবধানতাবশতঃ লিভারপুল হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় চলিয়া আসে এবং দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের অধীনে কার্য গ্রহণ করে। এই জাহাজটি উত্তরাঞ্চলের জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া সেগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিষয়ে আমেরিকা ব্রিটিশ সরকারের নিকট অভিযোগ করিলে দীর্ঘকাল বিবাদের পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা শহরে এক সালিশী বিচারালয়ে ইহার বিচার হয়। এই বিচারের রায় অনুসারে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দান করেন। গ্ল্যাড্স্টোন ছিলেন তখন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী।

'আলাবামা' ঘটনা

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি (American Foreign Policy):

১৭৭৬-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ: স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির মূল-সূত্র ছিল আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদে নির্লিপ্ত থাকা। এই কারণে ফরাসী বিপ্লবীদের প্রতি আমেরিকার চরম সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও

আমেরিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার আগ্রহের প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতার ঘোষণায়। এই মূল নীতির সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেন হইতে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া গেলেও ব্রিটেনের সহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা আমেরিকাবাসীর ছিল। এই কারণেও ফরাসী পক্ষ সমর্থন হইতে আমেরিকা বিরত ছিল, এমন কি ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া ফরাসী দূত সিটিজেন জেনেটকে অপসারণের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই ফরাসী দূত আমেরিকা হইতে ব্রিটিশ-বিরোধী কার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক কতকটা তিক্ত হইয়া উঠিল। ব্রিটেন আমেরিকাকে নিজপক্ষে যুদ্ধে যোগদানে রাজী করাইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার উপর চাপ দিতে লাগিল। এমন কি ব্রিটিশ জাহাজ কর্তৃক মার্কিন জাহাজগুলি তল্লাসী, মার্কিন জাহাজ যুদ্ধ-সরঞ্জাম পরিবহন করিতেছে অজুহাতে বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্য ব্রিটিশ সরকার শুরু করিলে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার ব্যাপক দাবি উত্থিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা আমেরিকার স্বার্থের দিক হইতে একান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষতা নীতি অবশ্য ত্যাগ করিলেন না। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধের মিটমাট হয়। এই চুক্তি প্রধান বিচারপতির নামানুসারে জে-চুক্তি (Jay Agreement) নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদে নিরপেক্ষতা এবং ইংলণ্ডের সহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের নীতি

ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে মার্কিন নিরপেক্ষতা

ইংলণ্ড-আমেরিকার মধ্যে অসদ্ভাব

জে-চুক্তি

ফ্রান্স জে-চুক্তি ফরাসী-বিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং স্বাধীনতা-যুদ্ধের কালে প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্কিন-ফরাসী চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-দানের শর্তানুযায়ী আমেরিকাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাপ দিল। ঐ সময়ে জন এ্যাডামস্ প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত

আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিরোধ

ছিলেন। মার্কিন সরকার স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার অপর কোন শক্তির নিকটই ত্যাগ করিবেন না—তিনি এই ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ও ফ্রান্সের নৌবাহিনীর মধ্যে ইতস্ততঃ সংঘর্ষও ঘটিল। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ সৃষ্টি হইবার পূর্বেই ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সহিত মার্কিন সরকারের মিটমাটের চুক্তির পর আমেরিকা পুনরায় নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিল।

নেপোলিয়নের সহিত মিটমাটের চুক্তি: মার্কিন সরকারের নিরপেক্ষতা নীতি পুনঃ-অবলম্বন

উনবিংশ শতাব্দী: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে (১৮০১) জেফারসন্ ও ডেমোক্রেটিক দলের ক্ষমতালাভ মার্কিন রাজনীতিতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র-নীতিতে এই নূতন সরকারের নূতন নীতি শীঘ্রই পরিলক্ষিত হইল।

পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

জেফারসন্ প্রেসিডেণ্ট-পদে অভিষিক্ত হওয়ার কালে ঘোষণা করিলেন যে, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সততার ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং কোন রাষ্ট্রের সহিতই জটিলতাপূর্ণ চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকার করিয়া চলিবে। এই দুই মূল নীতির ভিত্তিতে পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি স্বাধীন চেতনা এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচায়ক ছিল। ১৮০১-৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে জলদস্যুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা ট্রিপোলি (Tripoli)-এর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নিকট হইতে সামান্য দেড় কোটি ডলার মূল্যে লুসিয়ানা নামক বিরাট ভূখণ্ড মার্কিন সরকার ক্রয় করেন। এই বিশাল ভূখণ্ডকে বিভক্ত করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান শক্তি, সামর্থ্য ও মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য নীতির পরিচয় আমরা দেখিতে পাই ইঙ্গ-মার্কিন বিবাদে।

নূতন নীতি:
(১) সকলের সহিত মিত্রতা,
(২) কাহারো সহিত কোন জটিলতায় প্রবেশ না করা

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতিতে অধিকতর আত্মপ্রত্যয়

(ক) ট্রিপোলির সহিত যুদ্ধ,
(খ) ফ্রান্স হইতে লুসিয়ানা ক্রয়

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ আমেরিকার সমুদ্রবাহী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিয়া তাহা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজের ক্ষতিসাধন করিতে লাগিল। ব্রিটিশ জাহাজ কর্তৃক আমেরিকার জাহাজ তল্লাসী প্রভৃতি বিরক্তিকর নীতি গ্রহণ করিলে ক্রমেই ইঙ্গ-মার্কিন মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইংরেজ জাহাজ হইতে নাবিকের কাজ ত্যাগ করিয়া যে সকল লোক মার্কিন জাহাজে নাবিকের কাজ গ্রহণ করিত ইংরেজগণ তাহাদিগকে বলপূর্বক মার্কিন জাহাজ হইতে ধরিয়া লইয়া যাইত। ফলে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকায় এক দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। জেফারসন্ ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি তিনি ব্রিটিশ জাহাজ কোন মার্কিন বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন জাহাজের বিদেশী কোন বন্দরে যাওয়া বন্ধ করা হইল। কিন্তু এই আদেশ প্রকৃত ক্ষেত্রে কার্যকরী করা সম্ভব না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হইল। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন্ জনমতের চাপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (১৮১২)। এই যুদ্ধ ঘোষণার পশ্চাতে কেবলমাত্র মার্কিন সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রশ্নই জড়িত ছিল না। ইহার অপর উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে কানাডা জয় করা। কিন্তু ব্রিটিশ সহায়তা ভিন্নই কানাডা আত্মরক্ষায় সক্ষম হইল। অপর দিকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমে মার্কিন নৌবাহিনী জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌ-বহরের সংখ্যাধিক্যের জোরে আমেরিকার নৌবহর পরাজিত হইল। ইহার পর পেনিনসুলার যুদ্ধ অবসানের পর ব্রিটেন মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন শহর আক্রমণ করিয়া 'হোয়াইট হাউস' (White House) ভস্মীভূত করিল। কিন্তু নিউ অর্লিয়েন্স আক্রমণ করিতে আসিয়া অপর এক বৃটিশ বাহিনী আমেরিকার হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া আমেরিকার সহিত ঘেণ্ট্ (Ghent)-এর শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হইল।

(গ) ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ঘোষণা

ব্রিটিশ-মার্কিন মনোমালিন্য

(ঘ) ব্রিটিশ-মার্কিন যুদ্ধ (১৮১২-১৪)

ঘেণ্ট্-এর শান্তি-চুক্তি

১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই যুদ্ধে মার্কিন জাতির মধ্যে যে গভীর

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জাতির মধ্যে একতার ভাব বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই নূতন জাতীয় চেতনা আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতিতে শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা উত্তরোত্তর দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিল।

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যবৃদ্ধি : দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার সহিত আমেরিকার বাণিজ্য বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে আমেরিকা কানাডার মাতৃদেশ ইংলণ্ডের সহিত এবিষয় সম্পর্কে মীমাংসার ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া নিজ দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময় হইতেই আমেরিকা ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত পূর্বেকার অনুসৃত নমনীয় নীতি ত্যাগ করিয়া নিজ স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দৃঢ় এবং জাতীয় নীতি গ্রহণ করিল।

কানাডার সহিত বাণিজ্য-সমস্যার মীমাংসা

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো-নীতি' ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা দ্বারা আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তারের স্থল নহে বলা হইল এবং কোন ইওরোপীয় দেশ আমেরিকাস্থ কোন স্থানে হস্তক্ষেপ করিলে আমেরিকা উহা বিপজ্জনক এবং মিত্রতা-বিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে এই কথাও স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল। মন্‌রো-নীতির ঘোষণার মধ্যে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে আমেরিকার রাজনীতি ভিন্ন প্রকৃতির এই কথা স্পষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিভিন্ন থাকা-ই মার্কিন স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন এবং 'আমেরিকা মহাদেশ আমেরিকাবাসীর জন্য'—ইহাও মন্‌রো-নীতি হইতে প্রকাশ পাইল। এই সময় হইতেই সমগ্র আমেরিকাবাসীকে এক বৃহত্তর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ইওরোপীয় কন্‌সার্টের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব হইতে মার্কিন গণতন্ত্রকে রক্ষা করা আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইল। এই নীতিকে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা অন্তর্মুখী নীতি গ্রহণ করিল এবং সাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাজনীতির সহিত যোগাযোগ ছিন্ন করিল।

মন্‌রো-নীতি : আমেরিকার ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে অপসরণ

ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি আমেরিকা অর্ধ-

শতাব্দীরও অধিক কাল অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে আমেরিকা নিজ আওতার অন্তর্বর্তী স্থানসমূহ দখল করিতে ব্যস্ত ছিল। ইওরোপীয় রাজনীতির জটিলতা নেপোলিয়নের যুদ্ধের কালে আমেরিকা উপলব্ধি করিয়াছিল। সুতরাং আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকল্পে ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা যেমন প্রয়োজন ছিল, নিজ আওতার অন্তর্বর্তী স্থানসমূহ দখলের জন্যও এই বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি সমভাবে প্রয়োজনীয় ছিল।

ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও নিজ আওতার মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্যুদ্ধের অবসানে ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা অভূতপূর্ব শক্তি ও মর্যাদা সহকারে নিজ নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। অন্তর্যুদ্ধের কালে ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে এক সামযিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকোর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু অন্তর্যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র আমেরিকা মন্‌রো-নীতি অনুসরণ করিয়া নেপোলিয়ানকে মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য করিল। ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকো ত্যাগে বিলম্ব করিয়া মেক্সিকোর সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

অন্তর্যুদ্ধের পর হইতে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি:

(১) মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্যের অপসারণ—মন্‌রো-নীতির প্রয়োগ

মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের সময়ে 'আলাবামা' সংক্রান্ত ঘটনার জন্য (৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আমেরিকা ইংলণ্ড হইতে দীর্ঘকাল যুঝিয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা (Alaska) ক্রয় করিয়াছিল।

(২) 'আলাবামা' ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়, আলাস্কা দখল (১৮৬৭)

প্রেসিডেন্ট ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড (১৮৮৯-৯৭) মন্‌রো-নীতিকে প্রসারিত করিয়া ক্যারিবিয়ান সাগর তীর পর্যন্ত প্রয়োগ করিলেন। ভেনিজুয়েলা ও ব্রিটেনের মধ্যে সীমারেখা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে আমেরিকা, আমেরিকা মহাদেশের প্রধান এবং সার্বভৌম শক্তি হিসাবে এই বিবাদের মধ্যস্থতা করিতে চাহিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়াতে

(৩) মন্‌রো-নীতির সম্প্রসারণ: ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার বিবাদে আমেরিকার মধ্যস্থতা

ক্লীভ্ল্যাণ্ড ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে মধ্যস্থতার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন এবং উহার সিদ্ধান্ত বলপূর্বক ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার উপর কার্যকরী করিবেন। ব্রিটেন পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমেরিকার মধ্যস্থতা গ্রহণে স্বীকৃত হইল। এইভাবে ক্রমেই মন্‌রো-নীতির সম্প্রসারণ ঘটিতে লাগিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিল।

কিউবার বিদ্রোহ: আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধ

স্পেনীয় উপনিবেশ কিউবাতে (Cuba) বিদ্রোহ দেখা দিলে স্পেনীয় সরকার সেই বিদ্রোহ দমনে বর্বরোচিত অত্যাচার নীতি অবলম্বন করিলেন। ফলে, আমেরিকাবাসীদের মধ্যে স্পেনের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। কিউবার বিদ্রোহ দমনে স্পেনীয় সরকারের অক্ষমতার ফলে তথাকার ব্যবসায়-বাণিজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। আমেরিকার বহু মূলধনী কিউবাতে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের স্বার্থরক্ষার্থ আমেরিকা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল। প্রত্যুত্তরে স্পেনীয়গণ হাভানা বন্দরে একটি মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস করিলে আমেরিকায় স্পেনের সহিত যুদ্ধের জন্য এক শক্তিশালী জনমতের সৃষ্টি হইল। আমেরিকা স্পেনকে কিউবার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে জানাইল। স্পেন ইহার উত্তরে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

(৪) প্যারিসের শান্তি চুক্তি (১৮৯৮): মার্কিন অধিকার বৃদ্ধি

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্পেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি চুক্তি (Pact of Paris) দ্বারা পোর্টোরিকো (Porto Rico), গুয়াম (Guam), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (Philippine Islands), হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ (Hawaian Islands) প্রভৃতি স্থান আমেরিকাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিউবা মার্কিন সরকারের রক্ষণাধীনে স্বাধীনতা লাভ করিল। এই সকল স্থান অধিকার করিবার ফলে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সুদূর-প্রাচ্যে আমেরিকার ক্ষমতা ও আধিপত্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। এই সময় হইতে আমেরিকা এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বিস্তার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। এই সূত্রে জাপান ও চীন-দেশের সহিত আমেরিকা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হইতে থাকে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমডোর পেরি ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাপানী সরকারকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি দ্বারা দুইটি বন্দর মার্কিন জাহাজের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে বাধ্য করেন। প্যারিসের শান্তি চুক্তি দ্বারা আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অধিকতর ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও ব্রিটেনের সহিত চুক্তি দ্বারা স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের (Samoan Islands) একাংশ দখল করে। এইভাবে রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ক্রমে অধিকতর সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিল। মনোবৃত্তির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্‌রো-নীতিও পরিত্যক্ত হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা মন্‌রো-নীতি-প্রসূত স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগপূর্বক সুদূর-প্রাচ্য ও ক্রমে ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিল।

(৫) প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মার্কিন অগ্রগতি : মার্কিন-জাপানী চুক্তি (১৮৫৪), প্যারিসের শান্তি চুক্তি (১৮৯৮), স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের একাংশ দখল (১৮৯৯)—মন্‌রো-নীতি পরিত্যক্ত

বিংশ শতাব্দী : উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হইয়াছিল। ইওরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে মন্‌রো-নীতির প্রয়োগ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমেরিকা মন্‌রো-নীতি পরিত্যাগে কুণ্ঠিত হইল না। সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা ক্রমেই অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্ট্ প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলে আমেরিকা এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি আমেরিকা, এশিয়া ও ইওরোপ—এই তিন মহাদেশেই সম-পরিমাণ উৎসাহের সহিত অনুসরণ করিতে লাগিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে দৃঢ়তর মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি

আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা এবং আলাস্কার সীমারেখা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে থিয়োডোর রুজভেল্টের দৃঢ়তার জন্যই কানাডা আলাস্কার যাবতীয় দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

(১) কানাডা-আলাস্কার সীমা-সংক্রান্ত সমস্যা

জাপানের ক্রম-উত্থানের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থরক্ষার জন্য জাপানের সহিত ভবিষ্যতে যুদ্ধ করিতে হইতে পারে এই আশঙ্কায়

আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের রাজনীতিতে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। রুশ-জাপানী যুদ্ধে (১৯০৪-৫) আমেরিকার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আমেরিকার কূটচালে পরাজিত হইয়াছিল এবং পোর্টস্‌মাউথের সন্ধিতে রাশিয়াকে যতদূর পদানত করিতে সক্ষম হইতে পারিত ততদূর পারে নাই। এই কারণে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সামান্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরে কেলিফোর্ণিয়ায় জাপানীদের বসবাস-সংক্রান্ত বিবাদের ফলে এই মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্ট্ মার্কিন নৌ-বাহিনীর শক্তি প্রদর্শনের জন্য এক মার্কিন নৌ-বাহিনী পৃথিবী প্রদক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। বিশেষ করিয়া জাপানকে মার্কিন নৌ-শক্তির অপরাজেয়তা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই রুজভেল্টের উদ্দেশ্য ছিল।

(২) জাপানের উত্থান: আমেরিকা কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ: রুশ-জাপানী যুদ্ধে মধ্যস্থতা (১৯০৪-৫)—মন্‌রো-নীতি-লঙ্ঘন

মন্‌রো-নীতি লঙ্ঘন করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা মরক্কো-সংক্রান্ত ইওরোপীয় রাজনীতির সমস্যা সমাধানে আল্‌জেসিরাস্ (Algeciras) কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল।

(৩) আল্‌জেসিরাস্ কন্‌ফারেন্সে যোগদান—মন্‌রো-নীতি লঙ্ঘন

ক্রমবর্ধমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপূরক হিসাবে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে জলপথে সংযোগ স্থাপন আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্র হইতে পানামা রাজ্যটিকে নানা-প্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্যে উৎসাহিত করিয়া আমেরিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে সমর্থ হইল। পরে পানামা রাজ্য হইতে পানামা খাল খননের উপযোগী জমি ক্রয় করিয়া আমেরিকা পানামা খালটি খনন করাইল। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া খননকার্যের ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইল। ফলে, এই দুই মহাসাগরের যোগাযোগ পথ কয়েক হাজার মাইল হ্রাস পাইল। ইহা ভিন্ন মধ্য-আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলের উপর আমেরিকার প্রভাব এবং প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইল। পানামা খালের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকা নানাপ্রকার ফন্দিবাজীর দ্বারা 'ক্যানাল জোন' (Canal-zone)-এ ক্ষমতা বিস্তার করিল।

(৪) সাম্রাজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য পানামা খাল খনন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিজ স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে আমেরিকা কোন কোন ক্ষেত্রে মন্‌রো-নীতির অনুসরণ করিতে আবার অপরাপর ক্ষেত্রে মন্‌রো-নীতি ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দেনা-পাওনা-সংক্রান্ত বিবাদের সৃষ্টি হইলে আমেরিকা মন্‌রো-নীতির উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। এই সূত্রে ক্রমে আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকার অভিভাবকত্ব ও সংরক্ষণের অধিকার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

(৫) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইওরোপীয় দেশগুলির বিবাদে আমেরিকার মন্‌রো-নীতি প্রয়োগ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপর প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই 'প্যান-আমেরিকানিজম্' (Pan Americanism)-এর মধ্যে। আমেরিকা মহাদেশের উপর সর্বাত্মক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা কয়েকটি 'প্যান-আমেরিকান্' কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিয়াছিল।

(৬) দক্ষিণ-আমেরিকার উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা : প্যান-আমেরিকানিজম্

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে প্রথম তিন বৎসর আমেরিকা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত থাকিল। লুপ্তপ্রায় মন্‌রো-নীতি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ভিন্ন আমেরিকাবাসীর এক-পঞ্চমাংশ ছিল জার্মান —এই কারণেই আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল না, কিন্তু ক্রমে জার্মানির ডুবো-জাহাজের আক্রমণে মার্কিন বাণিজ্য-স্বার্থ নষ্ট হইতে থাকিলে এবং ইওরোপীয় দেশগুলিকে আমেরিকা যে বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়াছিল তাহার নিরাপত্তার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধাবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের চেষ্টায়-ই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স গঠিত হয়। কিন্তু প্যারিস শান্তি-সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত শান্তি চুক্তিগুলির শর্তাদি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে আমেরিকা স্বীকৃত হইল না, ফলে, মার্কিন সরকার ঐ সকল সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন না। পুনরায় আমেরিকা ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন প্রথম যুদ্ধে আমেরিকা ইংলণ্ডের মাধ্যমে যে পরিমাণ ঋণ ইওরোপীয় দেশগুলিকে দিয়াছিল তাহাও আদায় না হওয়ায় আমেরিকা ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার কু-ফল বুঝিতে পারিল। ইহার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম-ভাগে মার্কিন নিরপেক্ষতা

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান (১৯১৭) : মন্‌রো-নীতি ত্যাগ

কিছুকাল পর্যন্ত আমেরিকা একদিকে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিল, অপর দিকে সুদূর-প্রাচ্যে স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু ক্রমেই আন্তর্জাতিক সমবায়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া আমেরিকা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স (Washington Conference) নামে এক সম্মেলন আহ্বান করিল। এই সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল ও নৌশক্তি হ্রাস-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ, সুদূর-প্রাচ্যে স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা

ইহা ভিন্ন আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সহযোগিতার নীতিও গ্রহণ করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য আমেরিকা দিতে স্বীকৃত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত ব্রিয়াণ্ড্-কেলগ্ চুক্তি-ও (Briand-Kellog Pact) আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছিল (১৯২৮)। জাপান ঐ সময় মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সহিত যুগ্মভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইয়াছিল। এইভাবে ক্রমেই আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার আগ্রহ ঐ সময়ে আমেরিকা পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র ছিল সন্দেহ নাই। ইতালি যখন আবিসিনিয়া দখল করে তখন আমেরিকা ইওরোপীয় যুদ্ধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া সেগুলি অনুসরণ করিয়া চলিল। কিন্তু নাৎসি জার্মানির শক্তি বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই দুইটি গণতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা যতই ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন্ রুজভেল্ট্ ততই নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে নিরপেক্ষতার আইনগুলি বাতিল করা হইল। হিট্‌লারের সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর এই কথা বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট্ আমেরিকাকে সামরিকভাবে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন (Lease & Lend Bill) প্রণয়ন করিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের

লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে যোগদান

ডিসেম্বর মাসের ৭ই তারিখে জাপান কর্তৃক পার্ল বন্দর (Pearl Harbour) আক্রান্ত হইলে আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

মার্কিন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ উন্নতি (Internal development of America)

অন্তর্যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূরীকরণে চেষ্টিত ছিল। বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের কার্যকুশলতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে পশুপালন ও কৃষি-ব্যবসায় গড়িয়া ওঠে। দক্ষিণাঞ্চলে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কৃষিজাত দ্রব্যাদি, বিশেষভাবে তূলার চাষ চলিতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত শুল্কের বিরোধিতা দক্ষিণাঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করে এবং অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা

মন্‌রো-নীতি অবলম্বন করিয়া আমেরিকা ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা প্রভৃতি স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে। মিসিসিপি নদী অঞ্চলে বসতি বিস্তার, টেকসাস্ দখল, কেলিফোর্ণিয়া অধিকার প্রভৃতি নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের ফলে আমেরিকাবাসী সমবেতভাবে এক নূতন দেশ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

মন্‌রো-নীতি : আমেরিকার আয়তন বৃদ্ধি

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীতে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন মার্কিন জাতীয়জীবনে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। কেলিফোর্ণিয়া ও কলরেডো অঞ্চলে স্বর্ণখনির আবিষ্কার, রকিস্ অঞ্চলে নানাপ্রকার মূল্যবান ধাতুর আবিষ্কার অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। জমি উন্নয়নের উৎসাহদানের জন্য মার্কিন সরকার অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কৃষিকার্যে লাগান হইবে এই শর্তে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১৬০ একর করিয়া জমি দিতে লাগিলেন। জমি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনেরও উন্নতি সাধিত হইল। পরিবহন ও চলাচলের সুবিধার জন্য 'ইউনিয়ন-

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী : কৃষি, পশুপালন, খনিজদ্রব্য ও রেলপথের উন্নতি

পেসিফিক্ রেলওয়ে' (Union Pacific Railway) নামে এক দীর্ঘ রেলপথ প্রস্তুত হইল। ১৮৭০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট রেলপথ নির্মাণ করা হইলে আমেরিকার বৃহদাংশ রেলপথ দ্বারা সংযোজিত হইল।

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সহিত সংঘর্ষ

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইওরোপীয় জাতির লোকদের বসতি বিস্তার ক্রমে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থে আঘাত হানিল। ফলে, আমেরিকা-বাসী ঔপনিবেশিকদের সহিত রেড্ ইণ্ডিযানদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া রেড্ ইণ্ডিয়ানগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ জমিগুলিও ঔপনিবেশিকদের নিকট হারাইল এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

শিল্পোন্নতি

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু ইহার পর হইতে আমেরিকা শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়। নিজ দেশের জনসংখ্যার বিরাট চাহিদার সহিত আমেরিকা মহাদেশ ও ইওরোপীয় দেশগুলির মিলিত চাহিদার ফলে আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতির প্রয়োজনীয় বাজারের অভাব কোন সময়েও হয় নাই। ইহা ভিন্ন ঐ সময়ে বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার ফলে এই বিরাট চাহিদা অনুযায়ী সামগ্রী প্রস্তুতের অসুবিধাও ছিল না। সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমেরিকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিল্পোৎপাদক দেশে পরিণত হয়। শিশুশিল্পকে সংরক্ষণ দান করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টার কোন ত্রুটি হইল না। শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড বড় শহর গড়িয়া উঠিল। লৌহ, খনিজ তৈল, মোটর গাড়ী প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প দ্রুতগতিতে উন্নত হইয়া উঠিল। শিল্পোৎপাদকগণ 'শিল্পসংঘ' (Combines), ট্রাস্ট্ (Trust) প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বিশালাকৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। লৌহশিল্পে কার্ণেগি, তৈলশিল্পে রকৃফেলার প্রভৃতি শিল্পপতিগণ শিল্পোৎপাদনে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। শ্রমিকগণও সংঘবদ্ধ হইয়া মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। মার্কিন মালিক ও মজুরের মধ্যে বিরোধ ঐ সময় হইতে আরম্ভ হইয়া আজও চলিয়া আসিতেছে।

আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতিতে আকৃষ্ট হইয়া ইওরোপীয় দেশগুলি এবং চীন ও জাপান হইতে বহুলোক আমেরিকায় বসবাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। ক্রমে বহিরাগত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে মার্কিন

সরকার অবাধভাবে বহিরাগত ব্যক্তিদের আমেরিকায় আসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতিবৎসর একটি নির্ধারিত সংখ্যার অধিক লোক বিদেশ হইতে আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। চীনা ও জাপানীদের আগমনে মার্কিন শ্রমজীবিগণের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আগন্তুকদের আমেরিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় নাগরিকত্ব যাহারা গ্রহণ করে নাই এইরূপ সকল চীনাদেরই আমেরিকা হইতে বহিষ্কার করা হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আগন্তুকদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

আগন্তুক বিরোধী আইন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকা অসাধারণ শিল্পোন্নতির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী দেশে পরিণত হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা বিরাট পরিমাণ অর্থ ইওরোপীয় দেশগুলিকে ঋণ দান করিয়াছিল। অবশ্য এই অর্থের অধিকাংশই আমেরিকা ফেরৎ পায় নাই। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তাহা আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থারও বিপর্যয় আনিয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্-এর আমলে National Industrial Recovery Act (NIRA) পাস করিয়া অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের এক সুযৌক্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই আমেরিকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পূর্ণ হইয়া বাহিরের দেশগুলিকে সাহায্য দিবার মত শক্তি জন্মিয়াছিল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক অবনতি : পুনরুজ্জীবন (NIRA)

Questions and Hints

1. What is Monroe Doctrine ? To what extent did it influence American foreign policy during the 19th century ? (C. U. 1951).

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : স্পেনীয় আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ এই বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হইলে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস্ মন্‌রো তাঁহার বিখ্যাত মন্‌রো-নীতি ঘোষণা করেন। (২) মন্‌রো-নীতি : (ক) আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ স্থাপনের স্থল নহে, (খ) কোন শক্তি আমেরিকায়

উপনিবেশ বিস্তার নীতি অনুসরণ করিলে আমেরিকা উহা শত্রুতামূলক কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে; (৩) মন্‌রো-নীতির গুরুত্ব: (ক) ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে আমেরিকাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ হইতে মার্কিন গণতন্ত্রের রক্ষা, (খ) 'আমেরিকা আমেরিকাবাসীর জন্য', (গ) মার্কিন জাতিকে বৃহত্তর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা; (৪) (ক) মন্‌রো-নীতি অবলম্বনের পূর্বে প্রেসিডেণ্ট জেফার্‌সনের আমলে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়—ট্রিপোলির সহিত যুদ্ধ, ফ্রান্স হইতে লুসিয়ানা ক্রয়, ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন, ব্রিটিশ-মার্কিন যুদ্ধ—মার্কিন জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধি, দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন (এই সকল কথা অতি সংক্ষেপে লিখিতে হইবে); মন্‌রো-নীতি প্রবর্তনের ফলে ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও নিজ আওতার মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি; অন্তর্যুদ্ধের পর দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি—মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্যের অপসারণ, আলাবামা ঘটনা, মন্‌রো-নীতির সম্প্রসারণ—কিউবার বিদ্রোহ—আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধ—প্যারিসের শান্তি-চুক্তি (১৮৯৮), (খ) প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রগতি: (৫) উপসংহার: মন্‌রো-নীতি অবলম্বন করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমেরিকা নিজ আওতার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং স্বার্থের খাতিরে কোন সময় বা এই নীতি প্রয়োগ কোন সময় বা পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে মন্‌রো-নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ৪৪৭-'৪৮, ৪৬৬-'৭১ পৃষ্ঠা।]

2. Explain the causes of the American Civil War.

(C. U. 1952).

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় হইতে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিরোধের বীজ এই দুই অঞ্চলের পরস্পর বৈষম্যের মধ্যে নিহিত ছিল। (২) কারণ: (ক) অর্থনৈতিক বৈষম্য, (খ) শুল্ক-সংক্রান্ত বিরোধ, সাউথ্ কেরোলিনার যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের চেষ্টা, (গ) দাস-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধ—উত্তরাঞ্চল দাস-প্রথা অবসানের পক্ষপাতী—দক্ষিণাঞ্চল রক্ষার পক্ষপাতী, (ঘ) রাজনৈতিক কারণ: (ঙ) Uncle Tom's Cabin পুস্তকের প্রভাব—কান্‌সাস্ নেব্রাস্কা আইন—ড্রেড্-স্কট্ বিচার, (চ) নূতন

রিপাব্লিকান দলের সৃষ্টি—জন ব্রাউন কর্তৃক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন; (ছ) আসন্ন কারণ: আব্রাহাম্ লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট-পদ-লাভ (১৮৬১)। ৪৫৮-'৬২ পৃষ্ঠা।]

3. Give an estimate of the career and statesmanship of Abraham Lincoln. (C. U. 1940, 1943, 1944).

Briefly review the career of Abraham Lincoln.

(C. U. 1953).

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে; (২) জন্ম ও চরিত্র; (৩) ডগ্লাস বিতর্ক; (৪) প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত (১৮৬১); (৫) ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ; (৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা; (৭) অন্তর্যুদ্ধ—ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ; (৮) লিঙ্কনের কৃতিত্ব। ৪৫১-'৫৩ পৃষ্ঠা।]

4. Describe the part played by America in world politics in the first two decades of the present century.

(C. U. 1950, 1957).

[উত্তর-সংকেত: (১) সূচনা: বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ আরম্ভ করে। মন্রো-নীতির প্রয়োগ ও পরিত্যাগের এক অসামঞ্জস্যপূর্ণ পররাষ্ট্র-নীতির প্রয়োগ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। (২) আমেরিকা, এশিয়া ও ইওরোপে সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ: (ক) কানাডা-সংক্রান্ত সমস্যা, (খ) জাপানের উত্থান—আমেরিকা কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ, (গ) রুশ-জাপানী যুদ্ধে মধ্যস্থতা (১৯০৪-৫)—মন্রো-নীতি লঙ্ঘন, (ঘ) আল্জেসিরাস্ কন্ফারেন্সে যোগদান—মন্রো-নীতি লঙ্ঘন, (ঙ) সাম্রাজ্য-স্বার্থ রক্ষার্থ পানামা খাল খনন, (চ) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইওরোপীয় দেশগুলির বিবাদে মন্রো-নীতির প্রয়োগ, (ছ) দক্ষিণ আমেরিকার উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা: প্যান-আমেরিকানিজম্, (জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে নিরপেক্ষতা—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগদান, (ঝ) যুদ্ধাবসানে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্নতা—সুদূর-প্রাচ্যে স্বার্থরক্ষার চেষ্টা, (ঞ) লীগ-অব-ন্যাশন্সে যোগদান (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে যোগদান) ৪৭১-'৭৪ পৃষ্ঠা।]

ঊনবিংশ অধ্যায়

সুদূর-প্রাচ্য ঃ চীন ও জাপান

(The Far East : China and Japan)

ইওরোপের সুদূর-প্রাচ্য (ভারতবর্ষের নিকট-প্রাচ্য), অর্থাৎ চীন ও জাপান ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয়দেশই ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক বিস্তার-নীতি হইতে রেহাই পাইল না। ক্রমে এই দুই দেশ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির স্বার্থসিদ্ধি ও শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

সুদূর-প্রাচ্য—চীন ও জাপান

চীন (China)

আদি সভ্যতার অন্যতম জন্মস্থান চীনদেশ, পর্বত, মরুভূমি ও সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগতের সহিত চীনদেশের যোগাযোগ ছিল না মনে করিলে ভুল হইবে। প্রচীনকালে রোমের বণিকগণ চীনদেশ হইতে রেশম লইয়া যাইত। চীন-রাজসভায় আরব পারসিক দূতগণও আসিতেন। ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইওরোপীয় নাবিকগণ 'ক্যাথে' (Cathay) অর্থাৎ চীনদেশে পৌঁছিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিত। মার্কো পোলো নামক ইতালীয় পর্যটক দীর্ঘকাল চীনদেশে অবস্থানের পর স্বদেশ ফিরিয়া 'মার্কো পোলোর ভ্রমণ' (Travels of Marco Polo) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে চীনদেশের এবং জাপান, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে ক্যাথে ও প্রাচ্য অঞ্চলের অপরাপর দেশে পৌঁছিবার এক দারুণ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হওয়ার

আদি সভ্যতার অন্যতম জন্মস্থান চীন

ইওরোপীয়দের চীনদেশে পৌঁছিবার চেষ্টা

সময় হইতে ইওরোপীয় বণিকগণ ক্রমে চীনদেশের স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া সেখানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল। চীনাগণ নিজেদের দেশকে 'স্বর্গীয় দেশ' (Celestial Empire) বলিয়া বর্ণনা করিত। তাহারা নিজেদের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিত। প্রাচীন গ্রীকগণ যেমন অ-গ্রীক মাত্রেরই নাম দিয়াছিল 'বর্বব', তেমনি চীনাগণও অপর সকলকেই 'বর্বর' (barbarian) নামে অভিহিত করিত। ফলে, তাহারা অতি সন্তর্পণে নিজ সভ্যতাকে বাহিবের সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া চলিত।

চীনদেশের স্বাতন্ত্র্য

কিন্তু ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদ্রপথ ধরিয়া পোর্তুগীজ বণিকগণ চীনদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্যাকাও (Macao) নামক বন্দরে তাহারা অতিশয় কঠোর শর্তাধীনে বাণিজ্য কবিবার সামান্য অধিকার লাভ কবিল। ইহাব এক শতাব্দী পর আসিল স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজ নাবিকগণ। ইহারা আসিল (Canton) নামক বন্দবে। এই সকল ইওরোপীয় বণিকগণ অতিশয় অপমানজনক শর্ত মানিয়া প্রায় 'জোঁকের'* ন্যায়ই চীনদেশে টিকিয়া রহিল। চীনদেশ ইওরোপীয় বণিকদের চীনে বসবাস ও বাণিজ্য করা মোটেই পছন্দ করিত না, সুতরাং চীন সম্রাট তাহাদেব উপর নানাপ্রকার কঠোর শর্ত আরোপ কবিলেন। ইওরোপীয় বণিকগণকে চীনা পদ্ধতিতে চীন সম্রাটকে ভূমিষ্ঠ হইযা প্রণাম (Kotow) করিতে হইত। বিদেশী বণিকদেব চীনাভাষা শিক্ষা করা নিষিদ্ধ ছিল, তাহাবা অতি নীচ স্তরের লোক বলিযা বিবেচিত হইত। কো-হং (Co-hong) নামে এক শ্রেণীর চীনা বণিকদের নিকট তাহারা পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী ইওরোপীয় বণিকগণ এই সকল অপমানজনক শর্ত মানিয়া লইয়াই চীনদেশে টিকিযা রহিল এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। চীনদেশের নিকটবর্তী রাশিয়াও এবিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। ১৬৮৯

পোর্তুগীজ, স্পেনীয় ও ইংরেজ বণিকগণের আগমন

অপমানজনক শর্তে ইওরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য-অধিকার লাভ

* "They fastened like leeches upon her southern shore......" Ketelbey, p. 493.

খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রাশিয়াই চীন সম্রাটের সহিত নারস্কিঙ্ক্ (Nerschink) নামক চুক্তি স্থাপনে সমর্থ হয়। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম চীনা-ইওরোপীয় চুক্তি। রুশ বণিকদিগকেও নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম-কানুন মানিয়া বাণিজ্য করিতে হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আরও কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও রুশ বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্যের প্রসার সাধনে সমর্থ হয় নাই। বরঞ্চ চীনা-রুশ বাণিজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতি সামান্য পরিমাণে আসিয়া দাঁড়ায়। অপরাপর ইওরোপীয় বণিকগণ চীনা চা ও রেশম ক্রয় করিত এবং চীনদেশে আফিং আমদানি করিত। ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবিষয়ে অগ্রণী ছিল।

নারস্কিঙ্ক্ চুক্তি : রুশ-চীনা বাণিজ্যচুক্তি

ক্রমে চীনদেশের সহিত ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্রিটিশ সরকারও কোম্পানিকে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ চীন সম্রাটের নিকট উপঢৌকন-সহ দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু চীনের সম্রাট এই উপঢৌকনকে 'কর' (tribute) বলিয়া অভিহিত করিলেন। সম্রাট চিয়েন লুঙ্ (Chien Lung) তৃতীয় জর্জের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না এবং ইংরেজ বণিকদের কোনপ্রকার সুযোগ দানে বা ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন না। তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে লর্ড ম্যাক্কার্টনি (১৭৯৩) এবং লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮১৬) বাণিজ্যের সুযোগ আদায় করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে চীনদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় দৌত্যই বিফল হইয়াছিল। চীনা সম্রাট কর্তৃক বাণিজ্যিক সুবিধা দানে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য প্রসার

চীনে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের দূত প্রেরণ

নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিং ব্যবসায় ইতিমধ্যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফিং ব্যবসায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং ঐ বৎসর সমগ্র চীনদেশের মোট রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আফিংয়ের মোট আমদানি মূল্য অধিক ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় ও পারস্য দেশীয় আফিং চীনে

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আফিং ব্যবসায়ের প্রসার

আমদানি করিত এবং তুরস্ক হইতে আফিং আমদানি করিত মার্কিন ব্যবসায়িগণ। এই বিরাট পরিমাণ আফিং আমদানি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চীনবাসীদের অধিকাংশই আফিংসেবী ছিল। আফিং সেবনের কু-অভ্যাস বিদেশীরাই চীনদেশে প্রচলন করিয়াছিল। চীন সরকার এই সর্বনাশাত্মক অভ্যাস দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে আদেশ জারী করিয়া আফিং সেবন নিষেধ করিয়াছিলেন এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে আফিং আমদানি করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থপর বিদেশী বণিকগণ চীনা সরকারী কর্মচারিবর্গের দুর্নীতি-পরায়ণতার সুযোগ লইয়া এই সকল বাধা-নিষেধ অমান্য করিয়া আফিংয়ের ব্যবসায় পূর্ণোদ্যমেই চালাইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই চীন সরকারের এক আদেশের ফলে সাময়িকভাবে ক্যাণ্টন বন্দর হইতে আফিংয়ের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে চীনা কর্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থাগমের পথও বন্ধ হইয়া গেল। ফলে, তাহারা আফিংয়ের ব্যবসায় গোপনে পুনরায় গড়িয়া উঠিবার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে লাগিল।

চীন সরকার কর্তৃক আফিং বর্জন নীতি গ্রহণ : চীনা কর্মচারী ও বিদেশী বণিকদের স্বার্থপরতায় গোপনে আফিং ব্যবসায় প্রচলিত

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাণ্টন বন্দরে একজন চীনা কমিশনার আফিং সেবন ও আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বিদেশী বণিকগণের বিরোধিতা ও চীন সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থপরতার জন্য আফিং ব্যবসায় বন্ধ করা সম্ভব হইল না। ঐ বৎসরই ব্রিটিশ সরকার লর্ড চার্লস্ নেপিয়ারকে চীনদেশ ব্রিটিশ বাণিজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। চার্লস্ নেপিয়ারের উদ্দেশ্য ছিল চীন সরকারের নিকট হইতে ব্রিটিশ বণিকদের সম্মানজনক শর্তে বাণিজ্য করিবার অধিকার আদায় করা। চার্লস্ নেপিয়ারের ঔদ্ধত্য চীন সরকারের বিরক্তি বৃদ্ধি করিল। পর বৎসর (১৮৩৪) নেপিয়ারের মৃত্যু হইলে আসন্ন ইঙ্গ-চীনা বিরোধের আশঙ্কা দূর হইল বটে, কিন্তু চীন সরকারের ব্রিটিশ বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইল। ঐ বৎসরই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিং ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার বাতিল হইলে এই ব্যবসায়ে আরও বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইল। ক্রমেই আফিংয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি

চীন সরকার কর্তৃক আফিং-ব্যবসায় দমনের চেষ্টা : ইঙ্গ-চীন মনোমালিন্য

পাইতেছে দেখিয়া চীন সরকার ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে এই সর্বনাশাত্মক মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার লিন্-জু-সু (Lin-Tzu-hsu) নামে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে ক্যান্টনের স্পেশ্যাল কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য যে-সকল বিধি-নিষেধ করা হইয়াছিল সেগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হইল। লিন বিদেশী বণিকগণকে তাহাদের হাতে যে পরিমাণ আফিং ছিল তাহা তাঁহার নিকট জমা দিতে এবং ভবিষ্যতে তাহারা আফিং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ অমান্য করিলে তিনি বিদেশী বণিকদের চীনদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া দিবেন বলিয়া ভীতিও প্রদর্শন করিলেন। ব্রিটিশ বণিকগণ তাহাদের আমদানিকৃত আফিংয়ের কতক পরিমাণ চীনা কমিশনারের আদেশ অনুসারে জমা দিল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে আফিং ব্যবসায় ত্যাগের প্রতিশ্রুতিদানে অস্বীকার করিল। মার্কিন বণিকগণ ঐ শর্ত গ্রহণ করিল এবং চীনদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অধিকার ভোগ করিতে লাগিল। ব্রিটিশ বণিকদের সহিত যাবতীয় বাণিজ্য-সম্বন্ধ চীন সরকারের আদেশে বন্ধ করা হইল, এমন কি খাদ্যদ্রব্যাদিও তাহাদের পক্ষে পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। এইভাবে চীন সরকার ও ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হইল তাহা ক্রমে প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইল।

লিন্ স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত (১৮৩৯)

ইংরেজ বণিকদের সহিত বিরোধের সৃষ্টি

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ (Anglo-Chinese or Opium War):

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের মূল কারণ যে ইংরেজ বণিকদের নীচ স্বার্থপরতা-প্রসূত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈতিকতার দিক হইতে বিচার করিলে চীনদেশের অধিবাসিগণকে আফিংয়ের ন্যায় অনিষ্টকর দ্রব্য সেবন করাইয়া ইংরেজ বণিকদের অর্থ-লাভের চেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত কার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে বলা বাহুল্য।

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের মূল কারণ: ইংরেজদের স্বার্থপরতা

চীনদেশে অহিফেন বা আফিং সেবনের কু-অভ্যাসের জন্য প্রধানতঃ স্বার্থান্বেষী বিদেশী বণিকগণই দায়ী ছিল। অবশ্য চীন সরকারের আফিং সেবন বন্ধ করিবার অক্ষমতা ও চীনা সরকারী কর্মচারিগণের দুর্নীতিপরায়ণতা এজন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল সন্দেহ নাই। আফিং সেবনের কু-অভ্যাস চীনবাসীদিগকে যেমন হীনচেতা করিতেছিল অপরদিকে বিরাট পরিমাণ আফিংয়ের আমদানির ফলে চীনদেশের সোনা-রূপা বিদেশে চলিয়া যাইতেছিল। ন্যায়পরায়ণ কোন কোন মার্কিন বা ইংরেজ বণিকও যে আফিং ব্যবসায়ের অবৈধতা ও সর্বনাশাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন না ছিলেন এমন নহে। আফিং ব্যবসায়ের উপর অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদির ব্যবসায় দিন দিনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল এই কারণেও অনেকে আফিং ব্যবসায়ের সঙ্কোচ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী বিদেশী বণিকদের অর্থলিপ্সার জন্য আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার যাবতীয় চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছিল।

অহিফেন সেবনের কু-অভ্যাস : দেশী বণিকদের দায়িত্ব

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার কমিশনার লিন্-এর হস্তে আফিং ব্যবসায় দমন করিবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। লিন্ ব্রিটিশ বণিকদের নিকট হইতে যাবতীয় আফিং হস্তগত করিলেন এবং মোট কুড়ি হাজার আফিং বোঝাই বাক্স পুড়াইয়া দিলেন। ব্রিটিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ক্যাপ্টেন ইলিয়ট্ (Captain Elliot) এইজন্য ইংলণ্ডের রাণীর নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইবেন বলিয়া চীনা কমিশনার লিন্‌কে ভয় দেখাইলেন। লিন্ ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি ব্রিটিশ বণিকগণকে ভবিষ্যতে আফিং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে বলিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, পুনরায় যাহারা আফিং ব্যবসায় শুরু করিবে তাহাদিগকে চীনা আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে। চীন সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন ব্রিটিশ জাহাজ চীনা উপকূলে ভিড়িতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চীনা বিচারালয়ে ব্রিটিশ বণিকদের বিচার করিবার অধিকার লইয়া চীন সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে বিনা অনুমতিতে তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিলে চীন সরকারের আদেশে

কমিশনার লিন্ কর্তৃক আফিং ব্যবসায় দমন

আফিং ব্যবসায়ে বাধা : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজ বণিকদের পক্ষ অবলম্বন

একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজও আক্রমণ করা হইযাছিল। তদুপরি ব্রিটিশ বণিকদের সহিত যাবতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণ, ভবিষ্যতে ইংরেজ বণিকদের চীনদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার এবং কমিশনার লিন্ কর্তৃক বিনাশ-কৃত আফিংয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ চীন সরকারের নিকট দাবি করিলেন। চীন সরকার এই সকল দাবি অগ্রাহ্য করিলে ব্রিটিশ-জাহাজ কতিপয় চীনা-জাহাজের উপর গুলি বর্ষণ করে। এই সূত্রে প্রথম ইঙ্গ-চীনা বা প্রথম অহিফেন যুদ্ধ শুরু হয। এই যুদ্ধ ১৮৪০ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২)

উপরোক্ত কারণগুলি ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের আসন্ন কারণ হইলেও ইহার মূল কারণ ছিল ইংরেজ তথা ইওরোপীয দেশগুলির নিকট চীনদেশকে উন্মুক্ত করিবার ইচ্ছার মধ্যে। মার্কিন ঐতিহাসিক জন কুইন্‌সি এ্যাডামস্ (John Quincy Adams) বলেন যে, বোস্টন বন্দরে চায়ের বাক্স জলে নিক্ষেপ করা যেরূপ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কেবল অজুহাত মাত্র ছিল, সেইরূপ চীন সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ ব্যবসায প্রতিষ্ঠানগুলির আফিংযের বাক্স বাজেয়াপ্ত করাও চীনদেশের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের অজুহাত ভিন্ন অপর কিছুই নহে।* বস্তুতপক্ষে এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল, (১) চীনা সাম্রাজ্যে ইংরেজ রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের ইচ্ছা, (২) রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি করা এবং কো-হং (co-hong) প্রথার অবসান করা।

অহিফেন-সংক্রান্ত ঘটনা যুদ্ধের আসন্ন কারণ

মূল কারণ: (১) চীন সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন, (২) বাণিজ্য-স্বার্থ বৃদ্ধি, (৩) কো-হং প্রথার উচ্ছেদ

যুদ্ধ শুরু হইলে অল্লায়াসেই ব্রিটিশসৈন্য চীনাসেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত চীন সরকার ইংরেজদের সহিত

* "It is a general, but I believe, altogether mistaken opinion that the quarrel is merely for certain chests of opium imported by British merchants into China, it is mere incident to the dispute; but no more the cause of war than the throwing overboard of the tea in the Boston Harbour was the cause of the North American revolution." Vide Vinacke, p. 40.

শান্তি স্থাপনে বাধ্য হইলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট চীনদেশের সহিত ইংরেজ পক্ষের নানকিং-এর চুক্তি (Treaty of Nankin) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে ২ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে চীন সরকার ইংরেজগণকে দিতে বাধ্য হইলেন। চীন সরকার ব্রিটিশ সরকারকে হংকং দান করিলেন। ইহা ভিন্ন ক্যান্টন, এময়, ফুচো, নিংপো ও সাংহাই—এই পাঁচটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করিতে চীন সরকার স্বীকৃত হইলেন। এই সকল বন্দরে বিদেশী বণিকগণ নিজ নিজ কন্‌সাল (Consul) নিযুক্ত করিবার অধিকার পাইল। 'কো-হং' প্রথার অবসান করা হইল এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক বিদেশী বণিকদের আমদানি-রপ্তানির উপর নির্ধারিত হইল।

চীনের পরাজয় : নান্‌কিং-এর চুক্তি (১৮৪২)

শর্তাদি

ফলাফল

এই যুদ্ধ আফিং ব্যবসায় লইয়া-ই শুরু হইয়াছিল বটে, কিন্তু নান্‌কিং-এর সন্ধিতে আফিং ব্যবসায় সম্পর্কে কোন উল্লেখই করা হইল না। তদুপরি, এই যুদ্ধের ফলেই চীনদেশের সামরিক দুর্বলতার পরিচয় ইংরেজগণ তথা ইওরোপীয়রা পাইল এবং উহার সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হইল।

ইওরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারের উৎসাহ

চীনদেশের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত কবিবার দায়িত্ব ইংরেজগণ গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর ইওরোপীয় দেশও চীনদেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিতে লাগিল। আমেরিকার চেষ্টায় চীনদেশীয় বাণিজ্য সকল বিদেশীর নিকট-ই উন্মুক্ত রাখা হইল, ইংরেজগণ চীনদেশ সম্পর্কে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' (Open door policy) অবলম্বন করিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা চীনদেশের সহিত একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এই চুক্তি দ্বারা চীনদেশে অবস্থানকারী মার্কিন বণিকগণ কোন প্রকার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে কেবলমাত্র মার্কিন কন্‌সাল তাহাদের বিচার করিবেন স্থির হইল। এইভাবে চীনদেশে অবস্থান করিয়াও চীনদেশের আইন-কানুনের প্রয়োগ ও চীনা আদালত হইতে স্বাধীনভাবে থাকিবার অধিকার (extra territorial rights) মার্কিন ব্যবসায়িগণ লাভ করিল। আমেরিকার পর ফ্রান্সও অনুরূপ শর্তে চীন সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। ফ্রান্স ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের অনুমতিও লাভ করিতে সমর্থ হইল। এইভাবে

ইংরেজ, আমেরিকাবাসী ও ফরাসীদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিবার ফলে চীনদেশের দ্বার ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট উন্মুক্ত হইল। সুইডেন, নরওয়ে, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও চীনদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার সুযোগ গ্রহণে পশ্চাদপদ রহিল না।

দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ (Second Chinese War) ঃ

ক্রমেই বিদেশী বণিকগণ নিজ নিজ স্বার্থবৃদ্ধির জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট রহিতে পারিল না। সমগ্র ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকা তাহারা নিজেদের প্রাধান্যাধীনে আনিতে চাহিল। অপর দিকে চীন সরকার বিদেশী বণিকদের সুযোগবৃদ্ধি ব্যাহত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিলেন। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই এক দ্বিতীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল।

চীন সরকার ও বিদেশী বণিকদের মনোমালিন্য : দ্বিতীয় সংঘর্ষের প্রস্তুতি

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীন সরকারের দুর্বলতা টেইপিং (Taiping) বিদ্রোহের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে বিদেশী বণিকদের স্বার্থবৃদ্ধির সুযোগ হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন চীনা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে জনৈক ফরাসী খ্রীষ্ট ধর্মযাজকের প্রাণদণ্ড হইলে ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। এই দুই দেশের সরকার চীন সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময় অপর একটি ঘটনা প্রকাশ্য যুদ্ধের অজুহাতের সৃষ্টি করিল। এ্যারো (Arrow) নামে একটি লর্চা (*Lorcha*) অর্থাৎ জাহাজ ছিল একজন চীনবাসীর। এই জাহাজ ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করিয়া গোপনে অহিফেন ব্যবসায়, জলদস্যুতা প্রভৃতি অবৈধ কার্যে লিপ্ত ছিল। চীন সরকারের আদেশে এই জাহাজের বারো জন নাবিককে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সকল নাবিকের মধ্যে একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যুও ছিল। ক্যান্টনে অবস্থিত ব্রিটিশ কন্‌সাল (Consul) এই নাবিকদের প্রত্যর্পণ দাবী করেন এবং ব্রিটিশ পতাকার অবমাননার জন্য চীন সরকারকে মাপ চাহিতে বলেন। চীন সরকার প্রথমে এই সকল দাবি অগ্রাহ্য করিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাবিকদের ফিরাইয়া দিলেন। মাপ চাহিবার দাবি অবশ্য চীন সরকার

দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধের কারণ

'লর্চা এ্যারো ঘটনা'

ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিলেন। এই অজুহাতে ব্রিটিশ পক্ষ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিল। ফ্রান্স ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিল। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী পামারস্টোন্ এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটিশ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ 'এ্যারো' নামক জাহাজটি ছিল চীনদেশীয় এবং চীন সরকারের সার্বভৌমত্ব উহার উপর প্রয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত হইয়াছিল।

টেইপিং বিদ্রোহে দুর্বলীকৃত চীন সরকার ইঙ্গ-ফরাসী যুগ্মবাহিনীর বিরুদ্ধে অধিককাল যুঝিতে সক্ষম হইলেন না। বাধ্য হইয়াই চীন সরকার ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তির সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই দুই দেশের সহিত সন্ধিই তিয়েনসিন (Treaties of Tientsin)-এর সন্ধি নামে পরিচিত (১৮৬১)। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) আরও এগারটি বন্দর বিদেশী বণিকদের ব্যবসায়ের জন্য উন্মুক্ত হইল। (২) পিকিং-এ ইওরোপীয় দেশগুলির দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। (৩) বিদেশী বাণিজ্য-স্বার্থের সুবিধার জন্য শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করা হইল। (৪) নির্ধারিত শুল্ক দিয়া অহিফেন আমদানি আইনতঃ স্বীকৃত হইল। (৫) খ্রীষ্ট ধর্মযাজকগণকে অবাধ ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়া হইল। (৬) চীন সরকার ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষকে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলেন। (৭) বিদেশী বণিকগণকে চীনা আইনের প্রয়োগ হইতে মুক্ত রাখিবার extra-territorial rights পুনরায় স্বীকৃত হইল। দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ চীন সাম্রাজ্যের ও চীনা জাতির আত্মমর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিল।

তিয়েনসিন-এর সন্ধির শর্তাদি

টেইপিং বিদ্রোহ (Taiping Rebellion) :

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন সাম্রাজ্য যখন ইওরোপীয় বণিকদের স্বার্থপর আক্রমণ-নীতি হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত তখন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। মাঞ্চু সম্রাট্‌বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য 'টেইপিং বিদ্রোহ'* নামে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় (১৮৫১)। এই আন্দোলন প্রথমে একটি ধর্মান্দোলন হিসাবে শুরু হইয়া অল্পকালের মধ্যেই রাজনৈতিক প্রকৃতি লাভ করে। টেইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দক্ষিণ চীনের কোয়াংটাং

টেইপিং বিদ্রোহের সূত্রপাত : হাং-এর নেতৃত্ব

* T'ai P'ing=Perfect Peace.

প্রদেশবাসী হাং-সিন্-চুয়ান্ (Hung-Hsin-Chuang)। ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ক্যান্টনের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মযাজকগণের নিকট তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি এক নূতন ধর্মপ্রচারের জন্য স্বর্গীয় প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হাং পৌত্তলিকতা-বিরোধী খ্রীষ্টধর্মের অনুকরণে এক নূতন ধর্ম প্রচার শুরু করেন। নিজেকে তিনি 'স্বর্গীয় রাজা' (Heavenly King) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বর্গরাজ্য (Heavenly Kingdom) নামে একটি নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। হাং 'সম্পূর্ণ শান্তি' বা 'টেইপিং' (Taiping = Perfect Peace) নামে এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কোয়াংসি নামক স্থানে হাং বহুসংখ্যক লোকের সমর্থন লাভ করিলেন। কোয়াংসি হইতে হাং তাঁহার দলবলসহ উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মন্দিরের দেবমূর্তি, গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি বিনষ্ট করিয়া এবং সরকারী সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া এক ব্যাপক অব্যবস্থার সৃষ্টি করিলেন। এইভাবে হাং সাময়িকভাবে নান্‌কিং দখল করিতেও সমর্থ হইলেন এবং সেখানে নিজের একটি রাজধানীও স্থাপন করিলেন। ধর্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও এক নূতন রাজ্য গঠনের রাজনৈতিক আদর্শ-ই ছিল ইহার প্রকৃত প্রেরণা। ইওরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বিগণ হাং-কে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিল। প্রথমে ব্রিটিশ সরকারও টেইপিং বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকা এই ব্যাপারে চীনা সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। 'বিদেশী বণিকদের মধ্যে প্রথমে যাঁহারা টেইপিং বিদ্রোহী-দিগকে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, হাং যদি দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বিদেশী সহানুভূতি টেইপিং বিদ্রোহিগণের পক্ষ হইতে চীন সম্রাটের দিকে পক্ষান্তরিত হয়। বিদেশী সহায়তায় মাঞ্চু সম্রাটবংশ টেইপিং বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাবও টেইপিং বিদ্রোহের বিফলতার অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন সেং-কুয়ো-ফান্ (Tseng-Kuo-Fan) একদল সৈন্য যোগাড় করিয়া টেইপিং বিদ্রোহী-দিগকে নানকিং হইতে বিতাড়িত করেন। বিদেশী সাহায্যের মধ্যে

প্রথম টেইপিং বিদ্রোহের ধর্মাশ্রয়ী রূপ—প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন

বিদ্রোহ দমন

ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী ক্যাপ্টেন গর্ডন (Captain Gordon)-এর তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে টেইপিং বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমিত হয়।

টেইপিং বিদ্রোহ মূলতঃ কৃষকদের বিদ্রোহ ছিল। সামন্ত প্রথা-প্রসূত অত্যাচার-অবিচার এই বিদ্রোহের প্রেরণা দান করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ মাঞ্চু সম্রাটবংশের দুর্বলতা ও পতনোন্মুখতার প্রমাণ-স্বরূপ ছিল। ১৮৫১ হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া এই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ভবিষ্যতের চীনা বিদ্রোহের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল। টেইপিং বিদ্রোহিগণের দাবির কোন কিছুই ঐ সময়ে সাফল্যলাভ করে নাই বটে, কিন্তু প্রায় একশত বৎসর পরে নূতন চীন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে টেইপিং বিদ্রোহিদের দাবির সব কিছুই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আধুনিক চীনের পূর্বাভাস একশত বৎসরের পূর্বেকার টেইপিং বিদ্রোহে পরিলক্ষিত হয়। ইহাই হইল টেইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব।

টেইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব

তিয়েনসিন-এর সন্ধি (১৮৬১) হইতে শিমনোশেকির সন্ধি (১৮৯৫) পর্যন্ত চীন (China from the Treaty of Tientsin to the Treaty of Simonoseki) :

তিয়েনসিনের সন্ধির পর চীন সাম্রাজ্য ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইল। বহু শতাব্দীর লৌহ-অবগুণ্ঠন সামরিক শক্তিপুষ্ট ইওরোপীয় বণিকদের স্বার্থলিপ্সার আঘাতে উন্মোচিত হইল। বিদেশী বণিকগণ চীনদেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া চীনদেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপরতার এক নগ্ন, জঘন্য অভিনয় চীন সাম্রাজ্যের বুকে অভিনীত হইতে লাগিল।

বিদেশী বণিকদের চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

বিদেশী বণিকদের মধ্যে চীনদেশের অর্থনৈতিক শোষণের এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বেই ইওরোপীয় দেশগুলির প্রত্যেকটিই চীন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের অংশ গ্রহণের সুযোগ লইয়াছিল। ইংলণ্ড চীনা বাণিজ্যের সর্বাধিক অংশ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক চীনের অর্থনৈতিক শোষণ

জনৈক ব্রিটিশ কন্‌সালকে হত্যা করিলে ব্রিটিশ সরকার সুযোগ পাইয়া চীন

সরকারের উপর এক নূতন চুক্তির শর্ত চাপাইলেন। ইহা 'চিফু চুক্তি' (১৮৭৬) (Cheefoo Agreement) নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে আরও চারিটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ বাণিজ্য অধিকারও নানাভাবে বৃদ্ধি করা হইল।

ইওরোপীয় বণিকগণ চীন সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না। চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অংশগুলি একে একে বিদেশিগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিল, ফ্রান্স ইন্দোচীনে আনাম ও টন্‌কিন্ অধিকার করিল। ইংলণ্ড ব্রহ্মদেশ ও সিকিম দখল করিয়া লইল। এইভাবে চীনদেশের অধীন সাম্রাজ্যের অনেকাংশ বিদেশীদের হস্তগত হইল। এশিয়াস্থ দেশ জাপানও চীনগ্রাসে অগ্রসর হইল। জাপান কর্তৃক চীনগ্রাসের নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর-প্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন এবং গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়; সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা এক নূতন জটিলতায় জটিলতর হইয়া উঠে। ১৭৯৩ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যার প্রধান প্রশ্ন ও উদ্দেশ্য ছিল চীনদেশের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা-সুযোগ আদায় করা। ১৮৬০ হইতে ১৮৯৫ পর্যন্ত সুদূর-প্রাচ্য সমস্যা তিনটি বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে (১) চীন ও জাপানে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বাণিজ্য স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা, (২) চীন সাম্রাজ্য গ্রাসের প্রতিযোগিতা এবং চীন সাম্রাজ্যের অধীন বহু স্থান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কর্তৃক অধিকার, (৩) জাপানের উত্থান এবং চীনা সাম্রাজ্য গ্রাসে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সমধর্মী হইয়া উঠা—এই তিনটি কারণে সুদূর-প্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল।

চীন সাম্রাজ্যাংশ অধিকার

জাপানের উত্থানে নূতন জটিলতার সৃষ্টি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুদূর-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামরিক জ্ঞান লাভ করিয়া জাপান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ন্যায়ই এক সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন করিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন চীনদেশকে নিজ নিজ সুবিধামত চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিতেছিল তখন জাপান যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া চীনদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ নীতি গ্রহণ করে। ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায়-ই জাপান

চীনদেশের নিকট হইতে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার দাবী করে (১৮৭২)। চীন সাম্রাজ্যাধীন কোরিয়া রাজ্য জাপানের নিকট নিজ বন্দরগুলি উন্মুক্ত করিতে অস্বীকার করিলে জাপান কোরিয়ার বন্দরগুলি আক্রমণ করে। দুই বৎসর পর (১৮৭৪) জাপান ফর্মোসা দ্বীপটি আক্রমণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশ হইতে লুচু দ্বীপগুলি (Loochoo Islands) বলপূর্বক দখল করে। কিন্তু জাপানের দৃষ্টি ছিল কোরিয়ার উপর নিবদ্ধ। জাপানের নিরাপত্তার দিক হইতেও কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা এবং সেখানে জাপানী প্রাধান্য বিস্তার করা প্রয়োজন ছিল। কোরিয়া কোন ইওরোপীয় শক্তির হস্তে চলিয়া গেলে জাপানের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে এক প্রকার বিনা কারণেই যুদ্ধ শুরু করিল এবং চীনদেশকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া শিমনোশেকির সন্ধি (Treaty of Shimonoseki) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল (১৮৯৫)। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী চীনদেশ কোরিয়ার উপর আধিপত্য ত্যাগ করিল এবং ভবিষ্যতে কোরিয়ার উপর জাপানের অধিকার বিস্তৃতির পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল। শিমনোশেকির সন্ধি দ্বারা জাপান সমগ্র লিয়াওটাং উপদ্বীপটি আত্মসাৎ করিতে চাহিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রতিহত হইল।

জাপান কর্তৃক চীন সাম্রাজ্য-গ্রাস নীতি গ্রহণ

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৫); শিমনোশেকির সন্ধি

জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ দখল করিলে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রসারের পথ বন্ধ হইত। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারে ইচ্ছুক ছিল। শিমনোশেকির সন্ধি দ্বারা লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানের দখলে চলিয়া যাওয়াতে রাশিয়া জার্মানি ও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া জাপানকে বাধা দানে অগ্রসর হইল। এই তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মত সামর্থ্য জাপানের তখন ছিল না। সুতরাং তাহাদের হস্তক্ষেপের ফলে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু জাপানকে চীন সাম্রাজ্য গ্রাসে বাধা দানের কালে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার আগ্রহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ প্রদর্শন করিলেও

চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার অজুহাতে রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ

ইহা নিছক স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবেই যে করা হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। চীন সাম্রাজ্যের তথাকথিত বন্ধুদেশ রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানি জাপানের গ্রাস হইতে চীন সাম্রাজ্যাংশ রক্ষা করিবার পুরস্কার গ্রহণে অগ্রসর হইল। ফ্রান্স চীনদেশকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ঋণদানের বিনিময়ে নানাপ্রকার বাণিজ্য-সুযোগ আদায় করিয়া লইল। চীনদেশের রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনার যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব ফ্রান্স গ্রহণ করিল। সাণ্টাং বন্দরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন জার্মান ধর্মযাজকের হত্যাকাণ্ডের ফলে জার্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে সুবিধা-সুযোগ আদায় করিয়া লইল। সাণ্টাং বন্দরটি ও কিয়াও-চাও জেলাটি ৯৯ বৎসরের জন্য দখলে রাখিবার অধিকার জার্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে আদায় করিল। জার্মানির এইভাবে শক্তি বৃদ্ধি পাইলে অপরাপর ইওরোপীয় দেশ জার্মানির সহিত শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার অজুহাতে চীন সরকার হইতে নানা স্থান আদায় করিয়া লইল। ফ্রান্স কোয়াং চোয়াং ৯৯ বৎসরের জন্য দখল করিল এবং টন্‌কিন্ ও য়ুনান নামক স্থানের যাবতীয় রেলপথ নির্মাণ ও উহার পরিচালনার ভার পাইল। রাশিয়া পোর্ট আর্থার ও টালিয়েন নামক স্থান দুইটি ২৫ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক্ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করিয়া লইল। রাশিয়া যত দিন পোর্ট আর্থার দখলে রাখিবে ততদিন ব্রিটেন ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক স্থানের উপর আধিপত্য করিবার অধিকার আদায় করিল। জাপান চীন হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিল যে, ফুকিন (Fukein) অঞ্চলে অন্য কোন শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে চীন সরকার রাজী হইবেন না। এই ভাবে সাণ্টাং অঞ্চলে জার্মানি, ইয়াং সিকিয়াং উপত্যকায় ব্রিটেন, ফুকিন অঞ্চলে জাপান, টন্‌কিন, য়ুনান ও কোয়াং চোয়াং অঞ্চলে ফ্রান্স এবং মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়া অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। জাপানকে শিমনোশেকির চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন সাম্রাজ্যের অংশ দখল করিতে বাধা দেওয়ার পশ্চাতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যে স্বার্থবুদ্ধি লুক্কায়িত ছিল তাহা চীনদেশ ও জাপানের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। চীন সাম্রাজ্য

চীন হইতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের প্রতিযোগিতা

সাণ্টাং অঞ্চলে জার্মানি, ইয়াং সিকিয়াং অঞ্চলে ইংরেজ, ফুকিন অঞ্চলে জাপান, মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ায় রাশিয়া, কোয়াং চোয়াং, টন্‌কিন্, য়ুনান অঞ্চলে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্থাপন

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থলোলুপতার যূপকাষ্ঠে আহুত হইতে চলিল।

আমেরিকা চীনদেশের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নাই, উপরন্তু টেইপিং বিদ্রোহকালে সর্বপ্রথম আমেরিকা-ই চীন সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্তী সময়েও অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যখন চীনদেশের সাম্রাজ্য দখল করিতে ব্যস্ত, তখনও আমেরিকা চীনদেশে বাণিজ্য করিবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। আমেরিকা চীনদেশে extra-territorial rights অবশ্য ভোগ করিত। এই সকল কারণে আমেরিকা চীনদেশের প্রকৃত মিত্রদেশ হিসাবে বিবেচিত হইত। আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধ এবং উহার পর আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব মার্কিন জাতিকে বহির্জগতে উপনিবেশ বিস্তারে নিরস্ত রাখিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সহিত যুদ্ধের ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার পর প্রশান্ত মহাসাগরে চীন দেশের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বৃদ্ধি পাইল। ইহার পূর্বাবধি কেবলমাত্র বাণিজ্যস্বার্থ বৃদ্ধিই ছিল আমেরিকার সুদূর-প্রাচ্য নীতির মূল সূত্র। কিন্তু স্পেনের যুদ্ধের পর আমেরিকা এক অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইল। ইতিমধ্যে ইওরোপীয় দেশগুলি চীন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এমনভাবে ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল যাহার ফলে ঐ সকল দেশ ইচ্ছা করিলে চীনদেশে মার্কিন বাণিজ্যাধিকার একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। সুতরাং মার্কিন সুদূর-প্রাচ্য নীতি সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিল। আমেরিকার সম্মুখে তখন তিনটি পন্থা উন্মুক্ত ছিল : (১) অপরাপর শক্তিগুলির সহিত চীন সাম্রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তারে অবতীর্ণ হওয়া, (২) চীন সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র বাণিজ্য-স্বার্থ বৃদ্ধি করা এবং সেই কারণে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা, এবং (৩) চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। চীন সাম্রাজ্যে মার্কিন উপনিবেশ বিস্তার ঐ সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি বহির্ভূত ছিল। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের ফলে ঐ নীতি কতকটা ব্যাহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু চীনের অংশ দখল করিবার নীতি তখনও মার্কিন সরকার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক

চীনদেশের প্রতি মার্কিন বন্ধুত্ব

আমেরিকা কর্তৃক চীনদেশে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' গ্রহণের দাবি

ছিলেন না।* সুতরাং আমেরিকা চীনদেশের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ইওরোপীয় দেশগুলিকে চীনে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' (Open door policy) অনুসরণের জন্য অনুরোধ জানাইল। মার্কিন প্রস্তাবে কোন বিদেশী বণিকের বিরুদ্ধে চীনা বাণিজ্যের বিষয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গৃহীত হইবে না দাবী করা হইল। একমাত্র রাশিয়া ভিন্ন অপরাপর সকল ইওরোপীয় দেশই আমেরিকা প্রস্তাবিত 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' স্বীকার করিল। রাশিয়া এই নীতি অগ্রাহ্য না করিলেও স্পষ্টভাবে উহা গ্রহণও করিল না।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' স্বীকার

মার্কিন নীতি গ্রহণের ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে চীন সাম্রাজ্যের আসন্ন ব্যবচ্ছেদ রোধ করা সম্ভব হইল।

বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rebellion)ঃ আমেরিকার চেষ্টায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশ আত্মসাৎ করিবার নীচ স্বার্থপর প্রতিযোগিতা কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল। চীনদেশের লৌহ-অবগুণ্ঠন অবশ্য সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হইয়া চীনদেশ ইওরোপীয় দেশগুলির শোষণের জন্য উন্মুক্ত হইল। কিন্তু এই শোষণ নীতির বিরোধিতা চীনাবাসীর মধ্যে ক্রমেই প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপলাভ করিতে চলিল।

রাপীয়দের প্রতি চীনাবাসীর বিরোধিতা

মাঞ্চু বংশের শাসনের অক্ষমতা ও দুর্বলতা বিদেশীদের চীনদেশ গ্রাস নীতির সহায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। স্বভাবতই বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চু বংশের পতন ঘটাইবার ইচ্ছাও জাগিল। 'মুষ্টি যোদ্ধা' (Boxers or Fist-Fighters) নামে এক গোপন সমিতি গড়িয়া উঠিল। এই বিদ্রোহী সঙ্ঘ বিদেশী শোষণ এবং বিদেশীয়দের অনুকরণে চীন সাম্রাজ্যে সম্রাট কোয়াং-সু (Kwang-

'বক্সার' গোপন সমিতি গঠন

* "Consequently, for the United states to attempt to get a slice of the 'Chinese Melon' would have been for it to make a violent departure from its past policy. The departure would have been more marked if adopted in China than if adopted elsewhere, because after 1842 the government of the United States had almost uniformly urged the necessity of maintaining the territorial integrity of China." Vide Vinacke, p. 143,

Hsu) প্রবর্তিত সংস্কার—অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিদেশীয় প্রভাবের অবসানকল্পে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে (১৮৯৮) জু-সি (Tzu-Hsi) নামে বিধবা সম্রাজ্ঞী সম্রাট কোয়াং-সু'কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজ হস্তে শাসনকার্য গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদেশীয়দের অনুকরণে প্রবর্তিত যাবতীয় সংস্কার নাকচ করিলেন এবং এক অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। মাঞ্চু বংশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে দারুণ বিদ্রোহভাব জাগিয়াছিল তাহা হ্রাস করিবার উপায় হিসাবে তিনি বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে দেশবাসীর স্বাভাবিক বিদ্রোহভাবের সমর্থন করিতে লাগিলেন।

সম্রাজ্ঞী জু-সি-এর সহায়তা

বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে চীনাবাসীর প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের পর হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ যুদ্ধের পর ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মান ধর্ম-যাজকগণ অধিকতর উৎসাহ সহকারে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। চীন-বাসিগণ এই সকল ধর্মযাজকগণকে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত-কারক বলিয়া মনে করিত। বিদেশী খ্রীষ্ট ধর্মযাজকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করে। বিদেশী ধর্মযাজকদের হত্যাকাণ্ডে এই বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহ চরমে পৌঁছে। চীনদেশের নানা স্থানে শত শত ইওরোপীয় ধর্মযাজককে হত্যা করা হয়। জার্মানির একজন পদস্থ কর্মচারীকে পিকিং-এর রাস্তায় হত্যা করা হয়। বিদেশী দূতাবাসগুলি বিদ্রোহী জনতা কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। প্রায় দুই মাস এই সকল দূতাবাসের কর্মচারিগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবার পর এক আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী পিকিং-এ উপস্থিত হইয়া দূতগণকে অবরোধ-মুক্ত করে। আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী জু-সি ও তাঁহার সভাসদ্‌গণ পিকিং ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী চীনা বিদ্রোহী এবং বিদেশীয় সৈন্যদের দমন করিয়া শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপন করিল।

বক্সার বিদ্রোহ (১৯০০)

আন্তর্জাতিক সেনা-বাহিনী কর্তৃক বিদ্রোহ দমন

ঐ সময়ে চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। চীন সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের শ্রেষ্ঠ সুযোগ তখন উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আমেরিকা নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি'র সমর্থন এবং চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল (১৯০০)। ঐ বৎসরই ইংলণ্ড ও জার্মানি চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও অব্যবস্থার সুযোগে নিজ নিজ উপনিবেশ বিস্তার করিবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইল এবং অপর কোন শক্তি চীন সাম্রাজ্য-গ্রাস নীতি অবলম্বন করিলে উভয়ে মিলিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল।

আমেরিকা কর্তৃক 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' পুনঃ সমর্থন

চীনদেশের ব্যবচ্ছেদ রোধ হইল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তি মাত্রেই চীনা সরকারের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ এবং বাণিজ্য-স্বার্থ আদায় করিয়া লইল। ইহা ভিন্ন উত্তর চীনে, পিকিং-তিয়েনসিন রেলপথে এবং বিদেশীয় দূতাবাসে ইওরোপীয় সৈন্য মোতায়েন করিবার অধিকার চীনা সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বক্সার বিদ্রোহ এইভাবে বিফলতায় পর্যবসিত হইল বটে, কিন্তু চীনাবাসীদের মধ্যে বিদেশীয়দের শোষণের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছিল তাহার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

ইওরোপীয় দেশ কর্তৃক চীন হইতে ক্ষতিপূরণ ও নানা-প্রকার সুযোগ গ্রহণ

আমেরিকা কর্তৃক সমর্থিত 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' এবং ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি ভিন্ন অপর একটি কারণেও চীনদেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজন হইল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীনদেশের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া জাপানকে শিমনোশেকির সন্ধির শর্তানুযায়ী সুবিধা ভোগ করিতে দেয় নাই। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরই (১৮৯৭) রাশিয়া পোর্ট আর্থার দখল করিয়া লইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক্ ও পোর্ট আর্থার পর্যন্ত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করিয়াছিল। রাশিয়ার ক্রম-বিস্তার ইংলণ্ড ও জাপানের স্বার্থবিরোধী ছিল। সুতরাং বক্সারের বিদ্রোহের সুযোগে রাশিয়া সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া লইল এবং মাঞ্চুরিয়ার উপর সামরিক শাসন স্থাপনের অধিকার দাবী করিল। তখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের তীব্র বিরোধিতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইংলণ্ড ও জাপান চীনদেশে নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহা দ্বারা চীনদেশের নিরাপত্তা ও

রাশিয়ার চীন সাম্রাজ্য-গ্রাস নীতি

'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' রক্ষা করা হইবে এই স্বীকৃতি দান করা হইল এবং যুদ্ধ বাধিলে পরস্পর পরস্পরকে সামরিক সহায়তা দান করিবে স্থির হইল। ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি পরোক্ষভাবে চীনদেশের সংহতি রক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইয়া মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু রাশিয়াকে বিতাড়িত করিবার পশ্চাতে জাপানের নিজ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় ছিল বলা বাহুল্য। এইভাবে বিভিন্ন দেশের স্বার্থের বিরোধিতার ফলে চীনদেশ সাময়িকভাবে রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেও জাপান ক্রমেই চীনদেশ দখলে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করিয়া লইল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে 'একুশ দাবি' (Twenty one Demands) নামে একুশটি ভিন্ন ভিন্ন দাবি চীন দেশের নিকট উত্থাপন করিল।

ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি (১৯০২) : চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নীতি গৃহীত

জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখল (১৯১০)

চীনের বিপ্লব (The Chinese Revolution) :

বক্সার বিদ্রোহে বিদেশী বিতাড়নের এবং অকর্মণ্য মাঞ্চুবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার যে মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা বক্সার বিদ্রোহের বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতা দিন দিনই চীনবাসীদের মধ্যে মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী ভাবের সৃষ্টি করিল। মাঞ্চুবংশের রাজত্বকালের দুর্বলতার সুযোগেই বিদেশীরা চীনদেশকে তাহাদের বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুবংশীয় সম্রাজ্ঞী জু-সি চীনবাসীদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবকে ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া সাময়িকভাবে মাঞ্চুবংশকে বাঁচাইয়াছিলেন। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হস্তে চীনের পরাজয় এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের উত্থানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া চীনজাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবাদের উদ্রেক হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই চীনবাসীর মধ্যে সংস্কারের ব্যাপক দাবি উত্থিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই দাবি শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই সময়ে সম্রাজ্ঞী জু-সি কতকগুলি সংস্কার সাধন করিয়া মাঞ্চু-শাসনকে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি

মাঞ্চুবংশের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি, শাসনসংস্কার সাধন করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চাহিলেন। এমন কি তিনি জাতীয় প্রতিনিধিবর্গের একটি পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া চীনদেশে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিশ্রুতিও দান করিলেন। ইওরোপের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি কমিশনও তিনি প্রেরণ করেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন মাঞ্চুবংশের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই (১৯০৮) মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটে।

সম্রাজ্ঞী জু-সি-এর সংস্কার কার্য

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চীনের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংস্কার-নীতি সম্পর্কে বিভেদের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণাঞ্চলের চীনাগণ ছিল প্রজাতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। তাহারা মাঞ্চুবংশের অবসান করিয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কুয়োমিং-তাং (Kuoming-tang) বা প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দল গঠন করিয়া মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুন্-ইয়াৎ-সেন নামে একজন ডাক্তার এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্যাণ্টন ছিল কুয়োমিং-তাং দলের কর্মকেন্দ্র। মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য শুরু হইলে সরকার পক্ষ জাতীয় সভা অহ্বান করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু সুন্-ইয়াৎ-সেন মাঞ্চুশাসনের সহিত কোন প্রকার মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সুন্-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দল মাঞ্চুবংশের শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা নানকিং দখল করিয়া সেখানে এক অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করিল। সুন্-ইয়াৎ-সেন এই অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেণ্ট হইলেন। ঐ সময়ে মাঞ্চুবংশের এক নাবালক সম্রাট চীন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিপ্লব ব্যাপকতা লাভ করিলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিলেন (১৯১২)। চীনদেশ প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হইল।

ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিং-তাং দল

মাঞ্চুশাসনের অবসান: চীনদেশ প্রজাতন্ত্রে পরিণত

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ করিলেন এবং জেনারেল য়ুয়ান্-শি-কাই (Yuan-shi-kai) প্রেসিডেণ্ট-পদে স্থাপিত হইলেন।

য়ুয়ান্-শি-কাই ছিলেন একজন অতিশয় শক্তিশালী সামরিক নেতা এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কূটকৌশলী। সুন্-ইয়াৎ-সেন মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান্-শি-কাই-এর ন্যায় দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে প্রজাতন্ত্র স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু সুন্-ইয়াৎ-সেনের সেই আশা ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া য়ুয়ান্-শি-কাই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন। বিদেশী বণিকদের নানা প্রকার সুবিধা-সুযোগ দান করিয়া তিনি তাহাদের সহায়তা লাভে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিজে সম্রাটসুলভ ক্ষমতা অর্জন করিয়া একটি নূতন রাজবংশের পত্তন করিবেন। য়ুয়ান্ চীনদেশে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তনের জন্য জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বার্থপরতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি পরস্পর সামরিক প্রস্তুতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সুযোগে রাশিয়া ও জাপানের পক্ষে চীনদেশে অধিকার বিস্তৃতি সহজ হইল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীন বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া বহির্মঙ্গোলিয়া (Outer Mongolia) চীন সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রুশ সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বাধীনে এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিল। চীন দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলা বাহুল্য। ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলি চীনদেশকে ঋণ দান করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে চাহিল বটে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া সহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ লিপ্ত হওয়াতে চীনদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিয়া দৃঢ় করিবার নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। স্বভাবতই জাপানের পক্ষে চীনগ্রাসের চরম সুযোগ উপস্থিত হইল।

রাশিয়া ও জাপানের চীন সাম্রাজ্য গ্রাসের সুযোগ

জাপান ইওরোপের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীন সাম্রাজ্যে জার্মান অধিকৃত সাণ্টাং অঞ্চল দখল করিল এবং জার্মানির অপরাপর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও আত্মসাৎ করিল। ইহা ভিন্ন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন সরকারের নিকট 'একুশ দাবি' (Twenty one Demands) নামে এক দীর্ঘ দাবি-পত্র উপস্থিত করিল। এই একুশটি দাবি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল দাবিতে চীনদেশের বিভিন্ন

স্থান দখল করিবার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা, জাপান হইতে চীন দেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকার প্রস্তাব ছিল। এগুলি স্বীকার করিয়া লইলে চীন দেশ জাপানের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইত বলা বাহুল্য। ঐ সময়ে চীনদেশের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন য়ুয়ান্-শি-কাই। জাপান য়ুয়ান্-শি-কাইকে তাঁহার সম্রাট-পদ লাভে সাহায্য দান করিবে এই প্রলোভন দেখাইল। ইহা ভিন্ন 'একুশ দাবি' স্বীকার না করিলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ও দেখান হইল। য়ুয়ান্-শিং-কাই প্রায় সব কয়টি দাবিই স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবল মাত্র যে সকল দাবি স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব বিল্লোপের সম্ভাবনা ছিল সেগুলি ভবিষ্যতে বিচারের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল। এইভাবে জাপান চীনদেশের এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইল। য়ুযান্-শি-কাই-ও মৃত্যুর সামান্য পূর্বে হাং-সিয়েন (Hung Shien) নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। অল্পকালের মধ্যে (১৯৩৬) য়ুয়ানের মৃত্যু ঘটিলে চীনা প্রজাতন্ত্র রক্ষা পাইল।

'একুশ দাবি' (Twenty one Demands)

আমেরিকা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল বটে কিন্তু জাপান যখন 'একুশ দাবি' চীনদেশকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল তখন কেহ-ই চীন দেশের সাহায্যে অগ্রসর হইল না। জাপান মিত্রপক্ষকে সাহায্য দানের বিনিময়ে 'একুশ দাবির' সমর্থন লাভ করিল। চীনদেশের সংহতি রক্ষা নীতির সমর্থক আমেরিকার সহিত জাপানের লান্সিং-ইশাই (Lansing-Ishii) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে মার্কিন সরকারের চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি যে কেবল মুখের কথা তাহা প্রমাণিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা আমেরিকা সান্টাং-এর উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও আমেরিকার এই আচরণের পশ্চাতে একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, তাহারা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল।

ইওরোপীয় শক্তি ও আমেরিকা কর্তৃক জাপানের দাবি সমর্থন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ লইয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইবে এই ভয় চীনা সরকারের প্রথম হইতেই ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জাপানের সুযোগ নাশ করিবার ইচ্ছায়-ই চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ

হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জাপানের বাধাদানে এবং মিত্রপক্ষ চীনদেশের যুদ্ধে যোগদানে তাহাদের হস্ত দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চীন সরকারের যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব তেমন গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু জাপান 'একুশ দাবি' দ্বারা সাণ্টাং অঞ্চল এবং জার্মানির অপরাপর সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করিবার পর চীন দেশও জার্মানির শত্রুদেশে পরিণত হউক ইহাই চাহিল। কারণ চীন ও জার্মানির সদ্ভাব জাপানের সাণ্টাং দখল করিয়া রাখিবার পরিপন্থী হইতে পারে এই ভয় জাপানের ছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধাবসানে শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট রহিয়াছে এই কথা আমেরিকা চীন সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিল। ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৪ আগস্ট) চীনদেশ জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মিত্রপক্ষ চীনদেশের এই সহায়তার জন্য কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল না। তবে বক্সার বিদ্রোহের জন্য যে ক্ষতিপূরণ চীন দেশের দেওযার কথা ছিল, সেই ক্ষতিপূরণের বাকি অংশ চীনকে দিতে হইবে না ও যুদ্ধের পর বিদেশী বণিকগণ কত শুল্ক দিবে সেই প্রশ্ন পুনঃ বিবেচনা করা হইবে এইটুকু আশা চীনকে দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন

চীনের যুদ্ধ ঘোষণা

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের পূর্বে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) ও স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দেওযা হইতেছিল তাহাতে চীনবাসীর মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধি সাণ্টাং চীনদেশকে ফিরাইয়া দেওয়া, বিদেশী প্রাধান্যের অবসান, বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, শুল্ক স্থাপনের ব্যাপারে চীনা সরকারের চরম অধিকার, বিদেশীদের 'অতি-রাষ্ট্রীয়' অধিকার (extra-territorial rights)-এর অবসান দাবী করিল। কিন্তু জাপানের প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করিবে বলিয়া হুম্‌কি প্রদর্শন করিলে শেষ পর্যন্ত সাণ্টাং-এর অধিকার জাপানকে দেওয়া হইল। চীনদেশের অপরাপর দাবিও সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যার পক্ষে অবান্তর বিবেচনায় অগ্রাহ্য করা হইল। চীনা প্রতিনিধি প্রায় শূন্য হস্তেই প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার ফলে চীনদেশ আন্তর্জাতিক সন্ধি বর্জন করিল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীনের স্বার্থ অবহেলিত

প্যারিস সম্মেলনে চীনদেশের স্বার্থের প্রতি এইরূপ অবহেলা প্রদর্শনের ফলস্বরূপ চীনা জাতির মধ্যে ইওরোপীয়দের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। জাপানের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হইল, জাপানী সামগ্রী চীনদেশে বর্জন করা হইল। এমতাবস্থায় জাপানের বাণিজ্য-স্বার্থ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাপান চীনদেশের সহিত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে চাহিল। চীন সরকার জাপানের সহিত কোন প্রকার মীমাংসার পূর্বে সাণ্টাং ফেরৎ চাহিলেন। এইভাবে উভয় সরকারের মধ্যে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ওয়াশিংটনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের, সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা এবং নৌশক্তি হ্রাসের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্য এক সম্মেলন (Washington Conference) আহ্বান করেন।

চীনে ইওরোপীয় ও জাপান বিরোধী আন্দোলন

ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)

ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনদেশের 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' পুনরায় স্বীকার করা হইল। বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশের বিভিন্ন অংশকে 'প্রভাবিত অঞ্চল' (Sphere of influence) বলিয়া বিবেচনা করা নিষিদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময় চীনদেশকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বিবেচনা করিবার নীতি গৃহীত হইল। জাপানকে একটি ভিন্ন চুক্তি দ্বারা কিয়াও-চাও এবং সাণ্টাং-এ জার্মানির সর্ব প্রকার অধিকার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। শুল্ক নির্ধারণ নীতি প্রভৃতি আরও কয়েকটি অধিকারও চীনদেশ ফিরিয়া পাইল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা কতক পরিমাণে স্বীকৃত হইল। ঐ সময় হইতেই চীনদেশে বিদেশী প্রাধান্য অবসানের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হইল।

চীনের লাভ

চীনদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত : চীনের স্বাধীনতার ইতিহাসের সূচনা

সুন্-ইয়াৎ-সেন (Sun-Yat-Sen) : চীনের জাতীয় জীবনে যখন ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল তখন সুন্-ইয়াৎ-সেন নামে জনৈক দেশপ্রেমিক দক্ষিণ-চীনে কুয়োমিং-তাং নামে এক প্রজাতান্ত্রিক দল গঠন করিয়া বিভ্রান্ত চীনাবাসীকে জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সুন্-ইয়াৎ-সেন ছিলেন একজন ডাক্তার। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তিনি একজন বিপ্লবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

সুন্-ইয়াৎ-সেনের প্রথম জীবন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জু-সি (Tzu-Hsi)-এর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ঐ সময়ে সুন্-ইয়াৎ-সেন কুয়োমিং-তাং নামক এক প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দল গঠন করিয়া মাঞ্চুবংশের শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নেতৃত্বেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং নামক জাতীয়তাবাদী দল সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা নানকিং দখল করিয়া সেখানে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল। ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেনকে এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হইল। পর বৎসর (১৯১২) মাঞ্চুবংশের সর্বশেষ সম্রাট পদত্যাগ করিলে সমগ্র চীনদেশ প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল।

সুন্-ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিং-তাং বা জাতীয়তাবাদী দল : ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব

সুন্-ইয়াৎ-সেন ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। দেশের মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। এইজন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনারেল য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট-পদ ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান্-শি-কাই-এর ন্যায় দৃঢ়চেতা সামরিক সংগঠকের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু য়ুয়ান্ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলে সুন্-ইয়াৎ-সেন পুনরায় এক বিরোধী প্রজাতান্ত্রিক দল গঠন করিলেন। দক্ষিণ-চীনে প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপনের জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করিলেন। রাজতন্ত্রের সমর্থক ও স্বার্থপর সামন্তগণের বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্তভাবে যুঝিয়া চলিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী দল ক্যান্টনে এক নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল।

য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বার্থপরতা : সুন্-ইয়াৎ-সেনের বিরোধিতা

সুন্-ইযাৎ-সেনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক দল তিনটি বিশেষ আদর্শের উপর নির্ভর করিয়া চীনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। এই তিনটি আদর্শের বিশ্লেষণ সুন্-ইয়াৎ-সেন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "আমাদের দেশের মুক্তি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই শান্তি, সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নহে।" তিনি দক্ষিণ চীনের সামরিক নেতৃবর্গের সাহায্যে তাঁহার জাতীয়তাবাদী কুয়োমিং-তাং দলকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করিলেন। তাঁহার এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। কিন্তু

সুন্-ইয়াৎ-সেনের নীতি : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শান্তি

ইতিমধ্যে রুশ-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়া সুন্-ইয়াৎ-সেনকে তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাহায্য দান করিল। সুন্-ইয়াৎ-সেন ইওরোপীয় দেশগুলি চীন হইতে যে সকল অ-ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা, অতি-রাষ্ট্রীয় অধিকার বা extra-territorial rights আদায় করিয়াছিল সেগুলি নাকচ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত তিনি সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করিলেন। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তিনি গণতন্ত্র কার্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ দান করিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং দলের এক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহাতে কুয়োমিং-তাং-এর সভ্যপদ চীনা কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে যাহারা কুয়োমিং-তাং নীতিতে বিশ্বাসী তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্বেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুন্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার পড়িল তাঁহারই শিষ্য চিয়াং-কাই-শেক-এর উপর। চিয়াং-এর আমলে রাশিয়ার সাহায্যে হাংকাও, নান্‌কিন্, সাংহাই ও পিকিং প্রভৃতি স্থান জাতীয়তাবাদী চীনের অধীনে আনা হইল।

জাতীয়তাবাদী চীনের রুশ সাহায্য লাভ

চীনদেশের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে সুন্-ইয়াৎ-সেনের অমর দান রহিয়াছে। তাঁহারই নেতৃত্বে চীনের অকর্মণ্য মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পিত তাঁহার কর্মপন্থা চীনবাসীর মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি চীনের জাতীয়তার উৎসস্বরূপ।

সুন্-ইয়াৎ-সেনের দান

১৯২৫-১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন (China from 1925-1939) ঃ

সুন্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পূর্বেই কুয়োমিং-তাং দলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। বামপন্থীদল কমিউনিস্ট্ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল, অপর দিকে দক্ষিণপন্থী দল কমিউনিস্ট্ নীতিবিরোধী ছিল এবং রাশিয়ার সহিত মৈত্রী অবসানের পক্ষপাতী ছিল। সুন্-ইয়াৎ-সেনের জীবদ্দশায় দুই দলের বিভেদ প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুন্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিয়া কুয়োমিং-তাং-এর কমিউনিস্ট্

সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার শুরু করিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই অবশ্য চিয়াং-কাই-শেক সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রায় সমগ্র চীনদেশ কুয়োমিং-তাং-শাসনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি রাশিয়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই (১৯২৭) তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে বল্‌শেভিক প্রচারকগণ কর্তৃক চীনদেশে কমিউনিস্ট্ মতবাদ প্রচার লইয়া চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে চীনের ঐক্য বিধানের জন্য জাতীয়তাবাদী দল (কুয়োমিং-তাং) নান্‌কিং দখল করিলে কমিউনিস্ট্‌গণ বিদেশী দূতাবাস ও বিদেশীয়দের সম্পত্তি আক্রমণ ও লুঠ করিল। এই বিষয় লইয়া বিদেশী সরকারগুলির সহিত চীন সরকারের গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা চীন সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিল। জাপান নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ চীনের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার সৈন্য প্রেরণ করিল। এমতাবস্থায় বিদেশীয় বণিকদের সহায়তায় চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্‌দের দমনে কতকটা কৃতকার্য হইলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিকিং দখল করিয়া উত্তরাঞ্চলের পৃথক সরকারের উচ্ছেদসাধন করিলেন। নান্‌কিং ঐক্যবদ্ধ চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের রাজধানী হইল। ঐ বৎসরই কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি (Kuoming-tang Executive Committee) আইন প্রণয়ন করিয়া এক জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি-ই চীনের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সমিতির নির্দেশাধীনে দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার দেওয়া হইল স্টেট্ কাউন্সিল (State Council)-এর উপর। চিয়াং-কাই-শেক এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলেন। চেয়ারম্যানই চীনের প্রেসিডেণ্ট নামেই সর্ব সাধারণ্যে পরিচয় লাভ করিলেন। এই বৎসরই (১৯২৮) চিয়াং-কাই-শেক নান্‌কিং ঘটনায় (Nanking Affairs) ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশী সরকারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও জাপান চিয়াং-কাই-শেকের শাসনব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইল।

সমগ্র চীনে জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন : চিয়াং-কাই-শেক চেয়ারম্যান নির্বাচিত

চিয়াং-কাই-শেক চীনের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকার্যে মার্কিন ও জার্মান সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখনও বামপন্থীদের আন্দোলনের অবসান না হওয়ায় তাঁহাকে প্রায়ই যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইল। ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন প্রভৃতির ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে চিয়াং-কাই-শেকের শাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট্‌দের প্রচারকার্য সহজ হইল। তাহারা চিয়াং-এর জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসন স্থাপন করিতে চাহিল। কমিউনিস্ট্‌পন্থিগণ ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকার দক্ষিণাংশে সোভিয়েট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইলে চিয়াং-কাই-শেক তাহাদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। অপর দিকে এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া চীনের কোন কোন সামরিক নেতাও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে (১৯২৯) রাশিয়ার সহিত চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের এক তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। অবশেষে খাবারোভ্‌স্ক প্রটোকোল (Khabarovsk Protocol) দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি কন্‌ফারেন্স্ আহ্বান করা স্থির হইল। এই বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্বেই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল (সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)।

আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা: কমিউনিস্ট্‌ আন্দোলনের প্রসার

দক্ষিণ ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকায় কমিউনিস্ট্‌ প্রাধান্য

জাতীয়তাবাদী চীন ও রাশিয়ার বিরোধ

মাঞ্চুরিয়া চীনদেশের একটি অতিশয় বর্ধিষ্ণু ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত অংশ ছিল। চীনদেশের মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়া হইতেই প্রেরণ করা হইত। ইহা ভিন্ন জাতীয়তাবাদী সরকার মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলকে চীনদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিবেচনা করিতেন। ঐ স্থানের মোট বাসিন্দার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল চীনা জাতির লোক। অপর দিকে মাঞ্চুরিয়ায় বিদেশী সরকারগুলির, বিশেষতঃ রাশিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। রাশিয়ার সাইবেরিয়া-ভ্লাডিভস্টক রেলপথ মাঞ্চুরিয়ার মধ্যদিয়া প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা ভিন্ন মাঞ্চুরিয়ার পশ্চিম বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রাশিয়ার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ ছিল জাপানের অধীনে। মাঞ্চুরিয়ার অধিকাংশ রপ্তানি দ্রব্যাদি জাপানী-অধিকৃত দাইরেন (Dairen) বন্দর দিয়া প্রেরণ করা হইত। প্রথম

মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্ব

বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর জাপানের এক আশাতীত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে এক অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দিলে জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনও বাধাপ্রাপ্ত হইল। সেই স্থলে দেখা দিল বেকারত্ব ও আর্থিক দুর্দশা। এমতাবস্থায় জাপান মাঞ্চুরিয়ার পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া এই অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একুশ দাবি'র যে-সকল দাবি অপূর্ণ রহিয়াছিল সেইগুলি জাপান এখন (১৯৩১) দাবি করিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়ায় অর্থনৈতিক শোষণ

এদিকে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জাতীয়তাবাদী সুরকার ও কমিউনিস্ট্‌দের পরস্পর বিরোধে তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তখন অনাহারে. অর্ধাহারে দিন যাপন করিতেছে। স্বভাবতই জাপান এইরূপ অবস্থায় চীনের বিরুদ্ধে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিল। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের অজুহাতও পাওয়া গেল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় (Innor Mongolia) একজন জাপানী ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জাপানী সম্পত্তি সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের একাংশ বিস্ফোরক দ্বারা বিনষ্ট করা হইলে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। চীনদেশ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স ও মার্কিন সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে করিতেই জাপান মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী ব্যবসায়ের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া মাঞ্চুরিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়া লইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী প্রাধান্যাধীনে মাঞ্চুরিয়াকে 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হইল। এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হইল সিং কিং (Hsing King)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ার মুক্‌ডেন ও অপরাপর শহর দখল করিতে আরম্ভ করিলে চীনদেশে এক জাপান-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। চীনবাসীরা জাপানী দ্রব্যাদি বর্জন করিল। জাপানী সামগ্রীর দ্বিতীয় বৃহৎ ক্রেতা-দেশ ছিল চীন। সুতরাং চীনদেশের জাপানী সামগ্রী বর্জনের ফলে জাপানী বাণিজ্যস্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাংহাই-এ

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল

অবস্থিত জাপানী বণিকগণ জাপান সরকারকে নৌবলের সাহায্যে সাংহাইয়ের চীনাদের জাপান-বিরোধী আন্দোলন দমন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। জাপান সাগ্রহে একটি নৌবাহিনী সাংহাই বন্দরে প্রেরণ করিলে চীনবাসীরা সেই নৌবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করিল। জাপান ইহাকে চীনদেশের আক্রমণাত্মক আচরণ (!) বলিয়া বর্ণনা করিয়া পৃথিবীর জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে লীগ-অব-ন্যাশন্স চীন-জাপানী বিরোধের মীমাংসাকল্পে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করিল। লিটন্ কমিশন মাঞ্চুরিয়ায় চীনের প্রাধান্যাধীনে একটি স্বায়ত্ত-শাসিত রাজ্য স্থাপনের সুপারিশ করিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-অব-ন্যাশন্স লিটন্ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে অপর একটি কমিশন নিয়োগ করিল। লীগ-অব-ন্যাশন্স যখন কমিশনের পর কমিশন নিয়োগ করিয়া চীন-জাপানী বিবাদের মীমাংসার উপায় নির্ধারণে কালক্ষেপ করিতেছিল তখন জাপান উত্তর-চীনের বহু স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল। ঐ বৎসরই জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

লর্ড লিটন্ কমিশন

লীগ-অব ন্যাশন্স-এর বিফলতা

এদিকে চীন লীগ-অব-ন্যাশন্স হইতে কোন প্রকার সাহায্য না পাইয়া একপ্রকার হতাশ হইয়াই জাপানের সহিত টাংকু (Tangku)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী জাপানী সৈন্য চীনের প্রাচীরের উত্তরে অপসরণ করিতে রাজী হইল। জাপানী-অধিকৃত স্থানসমূহ ও চীনের অধীন অঞ্চলের সীমার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলকে নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসন চীনা কর্মচারীদের হস্তেই থাকিবে বটে, কিন্তু শাসনকার্যে জাপানের ক্ষতি-কারক কোন কিছু করা হইবে না সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কার্যত-অবশ্য জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারনীতি পূর্ণোদ্যমেই চালাইল। চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সরকার চীনের কমিউনিস্ট্ দমনে প্রবৃত্ত থাকায় জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার তেমন চেষ্টা করিলেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে চীনা কমিউনিস্ট্ নেতা মাও-সে-তুং ও অপরাপর নেতৃবর্গ জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির সম্মিলিত শক্তি নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইলেন এবং নিজেরাও জাপানী শক্তি প্রতিহত করিবার কার্যে সরকারকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। চিয়াং-

টাংকু-এর সন্ধি

কাই-শেক জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা অপেক্ষা কমিউনিস্ট্‌দের দমন করিবার কার্যেই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। এমন সময় চিয়াং-কাই-শেকের নিজ অধীন কর্মচারিগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দুই সপ্তাহ কাল এক অজ্ঞাত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই আকস্মিক ঘটনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিয়াং-কাই-শেককে দেশরক্ষার জন্য কমিউনিস্ট্‌ দলের সহিত বিরোধ মিটাইতে বাধ্য করা। দুই সপ্তাহ পর বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইয়া চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্‌দের সহিত অন্তর্যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন।

চিয়াং-কাই-শেকের কমিউনিস্ট্‌ দমন নীতি

কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌ মৈত্রী

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌ যুগ্মশক্তি জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কার্যে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু কুয়োমিং-তাং দল কমিউনিস্ট্‌দিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। এই সন্দেহ হইতেই ক্রমে দুই দলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কিয়াংসি ও ফুকিন অঞ্চলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌ দলের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ সৃষ্টি হইলে চিয়াং-কাই-শেকের মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে এই অন্তর্যুদ্ধের অবসান হইল। ঐ বৎসরই পার্ল হারবার (Pearl Harbour) জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায়ই চীনের কমিউনিস্ট্‌গণ কুয়োমিং-তাং পক্ষকে পরাজিত করিয়া চীনের বিপ্লব সংঘটিত করে, ফলে নূতন চীনের উত্থান ঘটে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জাপানী আক্রমণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌ ঐক্য : চীনের বিপ্লব

জাপান (Japan)

জাপানের উত্থান (Rise of Japan) :

সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের উত্থান আধুনিক ইতিহাসের এক বিচিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু শতাব্দীর সুষুপ্তি কাটাইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের উত্থান পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

জাপানের উত্থান বিচিত্র ঘটনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক। মিকাডো বা সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক। তিনি নিজ রাজধানী কিয়োটো (Kioto)-তে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বাস করিতেন। শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা ছিল সোগান বা প্রধানমন্ত্রীর হস্তে। মিকাডো ছিলেন কেবল নামেমাত্রই সম্রাট, প্রকৃত শাসক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা সোগান। সোগানের সরাসরি অধীনে ছিল দাইমিও (Daimios) বা সামন্ত ভূম্যধিকারিগণ। এই সকল ভূম্যধিকারিগণের অধীনে ছিল সামুরাই (Samurai) বা অস্ত্রধারী উপসামন্তগণ। দাইমিও ও সামুরাইগণের সাহায্যে সোগান শাসন পরিচালনা করিতেন। সমাজের সর্বনিম্নে ছিল রাজনৈতিক অধিকারহীন কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সমাজ।

জাপানী শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা : মিকাডো, সোগান, দাইমিও ও সামুরাই

জাপানের কৃষ্টি চীনা সভ্যতার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী ছিল, কিন্তু জাপানী সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে চীনা সভ্যতার অনুকরণ মনে করিলে ভুল হইবে। জাপানীদের চরিত্রের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল—দেশাত্মবোধ ও যুদ্ধক্ষেত্রে দেশের জন্য প্রাণ দিবার আগ্রহ। জাপানীদের ধর্ম সিন্টোবাদ (Shintoism) আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধও শিক্ষা দিয়াছিল। অক্লান্ত কর্মক্ষমতা এবং অসাধারণ অনুকরণ-প্রিয়তা জাপানী জাতীয় চরিত্রের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

জাপানী জাতীয় বৈশিষ্ট্য

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে জাপান বিদেশীয়দের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিত না মনে করা ভুল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপীয় ধর্মযাজকগণকে জাপানে ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইংরেজ, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ বণিকগণ জাপানী বন্দরে যাতায়াত করিত। ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় ও যাজকগণের স্বার্থপরতার ফলেই জাপান নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখিয়া চলিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল।* ইওরোপীয় বণিকদের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ

বিদেশীয়দের সহিত জাপানের যোগাযোগ

---

* "The conduct of the foreigners themselves and the conditions of the European world, made it seem advisable and necessary for the Japanese narrowly to limit their contacts." Vinacke, p. 79.

ও স্বার্থপর প্রতিযোগিতা জাপানীদিগকে বিদেশীয়দের প্রতি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি রোমান ক্যাথলিক যাজকগণ জাপানী খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণকে পোপের (Pope) প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে প্ররোচিত করিলে জাপানী সরকার যাজকশ্রেণীর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সকল যাজক জাপানের সম্রাটের বিচারের বিরুদ্ধে পোপের নিকট আপীল করিতে শুরু করিলে জাপানী সরকার বিদেশীয় বণিকদের জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। তথাপি জাপান যে বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা বলা চলে না। তখনও ওলন্দাজগণের ব্যবহারে জাপানী সরকার সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া কতক কতক বাণিজ্যিক অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। দেশিমা (Deshima) নামক উপদ্বীপে ওলন্দাজগণকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

ইওরোপীয়দের নীচ স্বার্থপরতা : জাপানে বিদেশীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ

ওলন্দাজ বণিকদের প্রতি উদারতা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান এইভাবে বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগ এড়াইয়া চলিল। শতাব্দীর প্রথমভাগে জাপানে এক জাগরণের সৃষ্টি হয়। জাপানীরা প্রথমে চীনা প্রাচীন সাহিত্য এবং পরে নিজের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া দুইটি প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠিল : জাতীয়তাবোধ ও মিকাডো বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য। তাহারা সোগান কর্তৃক মিকাডোর ক্ষমতা অপহরণের বিরোধিতা শুরু করিল। দেশিমায় অবস্থিত ওলন্দাজ বাণিজ্য-কুঠির মাধ্যমে জাপানীরা ইওরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যা ও ইওরোপীয় দেশগুলির অগ্রগতির কতক পরিচয় লাভ করিল। এইভাবে যখন জাপানীদের মধ্যে ইওরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন মার্কিন সরকার কমোডোর পেরি (Commodore Perry)-এর অধীনে কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ জাপানে পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া জাপানী সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন।

জাপানের জাগরণ

বিদেশী শিক্ষা সম্পর্কে ঔৎসুক্য

চীনদেশের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। এই কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া নৌচালনার জন্য মধ্যপথে কয়লা বোঝাই করা প্রয়োজন হইত। অথচ জাপান নিজ বন্দরগুলি বিদেশীয়দের নিকট বন্ধ রাখায় মার্কিন

জাহাজগুলির অসুবিধা হইত। ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাপানের নিকট হইতে জাপানীদের বন্দর ব্যবহারের অধিকার আদায় করিবার জন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই কমোডোর পেরি জাপানী নিষেধ অমান্য করিয়া বলপূর্বক জাপানে উপস্থিত হইলেন।

কমোডোর পেরি'র আগমন (১৮৫৩)

মার্কিন সরকারের আদেশ অনুযায়ী পেরি জাপানী সরকারের নিকট জাপানের নিকটবর্তী সমুদ্রে বিপদ্‌গ্রস্ত মার্কিন জাহাজ ও নাবিকদের ব্যবহারের জন্য একাধিক জাপানী বন্দর উন্মুক্ত রাখিবার দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন কোন মালবাহী মার্কিন জাহাজ সমুদ্রে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে সেই সকল মাল জাপানী বন্দরে বিক্রয় করিবার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার অধিকারও দাবি করা হয়। এই সকল দাবি প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক আদায় করা হইবে তাহা কমোডোর পেরির সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজ দেখিয়াই জাপানী সরকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জাপানী কর্তৃপক্ষ কমোডোর পেরি'র দাবির অধিকাংশ স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জাপান বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করিবে কিনা সেবিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ রাখিলেন। পর বৎসর (১৮৫৪) জাপানী কর্তৃপক্ষ কমোডোর পেরি'র সহিত এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নাগাসাকি ও আরও দুইটি বন্দর মার্কিন বাণিজ্যপোতের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। শিমোডা (Shimoda) নামক স্থানে একজন মার্কিন কন্‌সাল (Consul) নিযুক্ত করিবার অধিকার স্বীকৃত হইল। জাপান আমেরিকাকে 'most favoured nation' হিসাবে বিবেচনা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

কমোডোর পেরি-চুক্তি (১৮৫৪)

কমোডোর পেরি'র এই চুক্তি-স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশ জাপানের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হইল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই ইংলণ্ড জাপানের সহিত কমোডোর পেরি'র চুক্তির অনুরূপ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। রাশিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ পর পর জাপানের সহিত অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কন্‌সাল হ্যারিস্ (Consul Harris) কমোডোর পেরি'র চুক্তির শর্তগুলির সম্প্রসারণ সাধন করিলেন। এই নূতন চুক্তি দ্বারা জাপান আরও চারিটি বন্দর বিদেশীয়দের ব্যবহারার্থ উন্মুক্ত করিল। ইহা ভিন্ন অন্যান্য জাপানী বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিবার অধিকারও স্বীকৃত হইল। অপর কোন বিদেশীয় শক্তির সহিত জাপানের কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত

ইংলণ্ড, রাশিয়া ও হল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি

হইলে আমেরিকা উহার সমাধানে মধ্যস্থতা করিবার প্রতিশ্রুতিও দান করিল।

কন্‌সাল হ্যারিসের চুক্তি (১৮৫৮)

কন্‌সাল হ্যারিস্-স্বাক্ষরিত চুক্তির সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল জাপানের বন্দরগুলিতে মার্কিন সরকারের 'অতি-রাষ্ট্রীয়' বা extra-territorial অধিকার। এই শর্তের বলে জাপানে অবস্থিত মার্কিনদের উপর জাপানী আইন-কানুন প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা ভিন্ন জাপানী মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার অবাধ বিনিময় স্বীকৃত হইয়াছিল।

বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগের ফলে জাপানের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইল। পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে জাপান নিজ দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হইল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সোগান মিকাডো বা সম্রাটকে ক্ষমতাহীন করিয়া রাখিয়া শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। সোগানের আধিপত্য হইতে সম্রাটকে মুক্ত করিবার জন্য এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই আন্দোলনের পশ্চাতে ছিলেন একদল দেশপ্রেমিক, উৎসাহী যুবক। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোগানের আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া মিকাডোকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। জাপানী ইতিহাসে ইহা রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) নামে পরিচিত। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় সমাজের এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইলে জাপানী জাতি এক নব উদ্যমের সহিত জাতীয় জীবনকে উন্নত করিতে আত্মনিয়োগ করিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রভাব জাপানী জাতির মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করিল। জাপানী জাতি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিল যে, বহু শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বহির্জগতের উন্নতির সহিত নিজেকে অতি আশ্চর্যজনক-ভাবে মানাইয়া লইল। জাপানী জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সামন্ত সৈন্যের পরিবর্তে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হইল। সামরিক শিক্ষা ও সামরিক বৃত্তি গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইল। রেলপথ দ্বারা দেশের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন করা হইল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইল। কিয়োটো ও

জাপানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব

জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব : সর্বাঙ্গীণ উন্নতি

টোকিও এই দুই স্থানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বিদেশ হইতে অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতিগণকে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটিতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। ইওরোপীয় আইন-কানুনের অনুকরণে জাপানে আইন প্রণয়ন করা হইল। ইওরোপীয় বর্ষপঞ্জী জাপানে গৃহীত হইল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনও সাধিত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দুই-কক্ষযুক্ত একটি পার্লামেণ্ট গঠন করা হইল। এইভাবে সর্বদিক দিয়া জাপানে এক নব জীবনের সূচনা হইল। এই নবলব্ধ জীবনীশক্তির পরিচয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনা-জাপানী যুদ্ধ ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে পাওয়া যায়।

জাপানে নবজীবনের সূচনা

চীন-জাপানের যুদ্ধ, ১৮৯৪—'৯৫ (Sino-Japanese War) :

কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার-সংক্রান্ত বিবাদের ফলেই চীন-জাপানের যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে চীন ও জাপানের মধ্যে কোরিয়ার উপর প্রাধান্য লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে বিচার করিলে জাপানের নিরাপত্তার জন্য কোরিয়া জাপানের অধীনেই রাখা প্রয়োজন ছিল। জাপানের কোন শত্রুশক্তির হস্তে কোরিয়া চলিয়া গেলে জাপানের বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাতের ন্যায়ই হইত। মাঞ্চুরিয়ার দিকে রাশিয়ার ক্রমবিস্তৃতিও জাপানের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে চলিয়াছিল। এই কারণেও জাপানের পক্ষে কোরিয়া দখল করা প্রয়োজন ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিল। চীনদেশ পূর্ব প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে জাপান চীনের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যুদ্ধের অনুকূল ছিল। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভেদ দূর করিবার উপায় হিসাবে জাপানী সরকারের যুদ্ধঘোষণার প্রয়োজন ছিল। চীন-জাপানের যুদ্ধের কারণগুলি ছিল: (১) জাপানী জনসাধারণের একাংশ ও জাপান সরকারের যুদ্ধঘোষণার প্রয়োজন ও ইচ্ছা; (২) দীর্ঘকাল যাবৎ কোরিয়ার সহিত জাপানের স্বার্থ জড়িত ছিল, ইহা ভিন্ন চীন মহাদেশে রাজ্যবিস্তৃতির ব্যাপারে কোরিয়া প্রবেশ-পথস্বরূপ ছিল; (৩) কোরিয়া কোন বিদেশী শক্তি কর্তৃক অধিকৃত হউক ইহা জাপানীরা মোটেই সহ্য করিতে পারিত না, সুতরাং কোরিয়ার উপর

চীন-জাপানের যুদ্ধের কারণ

সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিবার সুযোগ জাপান সহজে ছাড়িতে চাহিল না; (৪) কোরিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বাজার জাপানের স্বার্থের নিকট উন্মুক্ত রাখাও প্রয়োজন ছিল।

জাপানের সামরিক শক্তির তুলনায় চীনদেশ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইহা ভিন্ন জাপানের সেনাবাহিনী ছিল যেমন সুগঠিত তেমনি আধুনিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অপর পক্ষে চীনদেশের অফুরন্ত লোকবল থাকিলেও যুদ্ধের ব্যাপারে তাহারা ছিল বহু পশ্চাদ্পদ। সুতরাং জল এবং স্থলে চীনদেশ জাপানের নিকট পরাজিত হইল। জাপান সৈন্য প্রেরণ করিয়া কোরিয়া দখল করিল। চীনদেশ জাপানের সহিত শিমনোশেকির চুক্তির স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে: চীন (ক) কোরিয়ার সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার মানিয়া লইল; (খ) জাপানকে মাঞ্চুরিয়ার লিয়াওটাং অঞ্চল, ফর্মোসা, পেস্কাডোরিস দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; (গ) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভুত পরিমাণ অর্থ (২০ কোটি টেয়ল্স্) জাপানকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহাও স্থির হইল যে, যতদিন পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণ আদায় না হইবে ততদিন পর্যন্ত জাপান ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক স্থানটি অধিকার করিয়া রাখিবে। (ঘ) সর্বশেষে, চীনদেশ চুংকিং, সুচাও, হ্যাং-চাও ও শাসি—এই চারিটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

চীনের পরাজয়: শিমনোশেকির চুক্তি (১৮৯৫)

চুক্তির শর্তাদি

শিমনোশেকির সন্ধির ফলে চীনা সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিই কেবল জাপানের হাতে চলিয়া গেল না, লিয়াওটাং উপদ্বীপে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় মাঞ্চুরিয়ার নিরাপত্তাও ব্যাহত হইল। চীনদেশ ভিন্ন রাশিয়ার পক্ষেও শিমনোশেকির সন্ধি গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ লিয়াওটাং উপদ্বীপে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় চীনদেশে রাশিয়ার বিস্তারনীতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। স্বভাবতই রাশিয়া জার্মানি ও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে শিমনোশেকির সন্ধির বিরোধিতা করিল। রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স জাপানকে লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইল। লিয়াওটাং অঞ্চলে জাপানী অধিকার স্থাপিত হইলে চীনদেশের রাজধানী

শিমনোশেকি চুক্তির বিরোধিতা: রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ

পিকিং-এর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই রাশিয়া-জার্মানি-ফ্রান্স জাপানের লিয়াওটাং অঞ্চল হইতে অপসরণ দাবি করিল। এইভাবে ইওরোপীয় তিনটি দেশের যুগ্ম-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যুক্তি-যুক্ত নহে মনে করিয়া জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতি-পূরণের বিনিময়ে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

(১) 'তিন শক্তির হস্তক্ষেপ' (Three-power intervention) অর্থাৎ রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের ফলে জাপানকে লিয়াওটাং ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল বটে, তথাপি চীন-জাপানের যুদ্ধ এবং শিমনোশেকির সন্ধি চীনের দুর্বলতা প্রমাণিত করিয়াছিল। (২) অপর পক্ষে চীনদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের সামরিক বিজয় জগতের চক্ষে জাপানের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল।

শিমনোশেকির সন্ধির গুরুত্ব

(৩) এই যুদ্ধের ফলে সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতির এক নূতন পর্যায় শুরু হইয়াছিল। জাপানের ফরমোসা ও পেস্কাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার এবং চীন কর্তৃক কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি জাপানের শক্তি যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিল, তেমনি সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপানের ভবিষ্যৎ প্রতিপত্তিরও সূচনা হইয়াছিল। (৪) অপর পক্ষে, চীনের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা, চীনা জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব প্রভৃতি যাহা কিছু জাপানের সহিত চীনের পরাজয়ের কারণ ছিল তাহা বহির্জগতের চক্ষে চীনদেশের মর্যাদা আরও হ্রাস করিয়াছিল। (৫) চীন-জাপানের যুদ্ধ সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে চীন ও জাপানের পূর্ব-সম্পর্কের ও শক্তি-সাম্যের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া জাপানকে প্রাধান্য দান করিয়াছিল।* এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে জাপানী জাতির মধ্যে এক দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। (৬) জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে পুনরুজ্জীবিত জাপানের শক্তির প্রথম পরিচয় ছিল চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভ। (৭) এই যুদ্ধে জয়লাভের পরই ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানে যে Extra-territoriality ভোগ করিয়াছিল তাহা নাকচ করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। (৮) রাশিয়ার নেতৃত্বে শিমনোশেকির সন্ধির সুবিধাভোগে জাপানকে বাধা দানের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই রুশ-জাপানী যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাশিয়াই যে জাপানের প্রধান শত্রু তাহা জাপান উপলব্ধি করিয়াছিল।

* The Sino-Japanese War marked a reversal in the relative positions of China and Japan in the Far East." Vinacke, p. 135.

রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার অজুহাতে জাপানকে শিমনোশেকির সন্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতি যে কতদূর আন্তরিকতা-বর্জিত ছিল তাহা অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণিত হইল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সাণ্টাং নামক স্থানে দুই জন জার্মান ধর্মযাজককে হত্যা করা হইলে জার্মানি এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ কিয়াওচাও নামক স্থানটি ৯৯ বৎসরের জন্য অধিকার করিল এবং অপরাপর নানাপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড অনুরূপ শর্তে এক একটি বন্দর দখল করিল। রাশিয়া চীনদেশ হইতে লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল ও পোর্ট আর্থার পঁচিশ বৎসরের জন্য অধিকার করিয়া লইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জাপান স্বভাবতই ইওরোপীয় দেশগুলি প্রধানতঃ রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স—যে তিনটি শক্তি চীন-দেশের অখণ্ডতার দোহাই দিয়া জাপানকে চীন-জাপানের যুদ্ধের ফল ভোগ করিতে দেয় নাই, সেই সকল দেশ চীন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আত্মসাৎ করিতেছে দেখিয়া জাপান স্বভাবতই অত্যন্ত বিরক্ত হইল। এই সকল পরিস্থিতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল রাশিয়া। সুতরাং জাপানবাসীরা রাশিয়াকেই জাপানের প্রধান শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। এই মনোভাবের মধ্যেই ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপানী যুদ্ধের মূল কারণ পরিলক্ষিত হয়।

রাশিয়া, জার্মানি, ও ফ্রান্সের চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতির অসারতা

জাপানের রুশ-বিদ্বেষ : রুশ-জাপানী যুদ্ধের মূল কারণ

রাশিয়ার ক্রমবিস্তার-নীতি ইংলণ্ডের পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই কাম্য ছিল না। সুতরাং ইংলণ্ড রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করিবার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তির ফলে এক দিকে যেমন জাপানের শক্তি বৃদ্ধি পাইল, অপর দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের মর্যাদাও বহুগুণে বর্ধিত হইল।

ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রী (১৯০২) : জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি

রুশ-জাপানী যুদ্ধ, ১৯০৪-৫ (Russo-Japanese War) :

মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত ছিল। উত্তর-মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ট্রান্স্-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণের অধিকার রাশিয়া চীনদেশ হইতে আদায়

করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন রুশ-চীনা ব্যাঙ্ক ছিল সম্পূর্ণ একটি রুশ প্রতিষ্ঠান। লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার ছিল রাশিয়ার অধিকৃত স্থান। এই সকল সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বক্সার বিদ্রোহের সময় মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। ইহার পরও রাশিয়া চীনদেশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া নীতির কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ঐ বৎসরই (১৯০২) রাশিয়া চীনদেশের অনুরোধে 'মাঞ্চুরিয়া চুক্তি' (Manchurian Convention) স্বাক্ষর করিয়া মোট ১৮ মাসের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল হইতে রুশ সৈন্য অপসারণের প্রতিশ্রুতি দান করিল। কিন্তু প্রথম দফায় কতক সৈন্য অপসারণের পর রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া চুক্তির শর্তানুযায়ী দ্বিতীয় দফা সৈন্য অপসারণের কোন চেষ্টাই করিল না। উপরন্তু রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানী প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বহুসংখ্যক রুশ সৈন্যকে কোরিয়ায় পাঠাইতে লাগিল। জাপান রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিতে ও কোরিয়ায় জাপানী প্রাধান্য স্বীকার করিতে এবং সেজন্য যথাযথ চুক্তি সম্পাদনে আহ্বান করিল। রাশিয়া এই প্রস্তাবের উত্তরে একটি পাল্টা প্রস্তাব করিল যে, জাপান যদি রাশিয়াকে চীনদেশ ও মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে কোন প্রকার বাধা না দেয় তাহা হইলে রাশিয়া জাপানকে কোরিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারে কোন বাধা দান করিবে না। এইভাবে কোন পক্ষই অপর পক্ষের দাবি স্বীকার না করিলে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৯০৪)।

মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে রুশ স্বার্থ

'মাঞ্চুরিয়া চুক্তি' (১৯০২): চুক্তির শর্ত ভঙ্গ

কোরিয়ায় রাশিয়ার জাপানী বিরোধিতা

মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টা

রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া মুকডেন (Mukden) ও শুশিমা (Tshusima) নামক স্থানে পর পর পরাজিত হইল। সুদূর-প্রাচ্য অঞ্চলে আমেরিকার বাণিজ্য স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধজয়ের দ্বারা জাপান যাহাতে অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইতে না পারে সেজন্য মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রাশিয়া ও জাপানের দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করিলেন। পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (Treaty of Portsmouth) দ্বারা রুশ-জাপানী যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

মুকডেন ও শুশিমার যুদ্ধ: রাশিয়ার পরাজয়, পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (১৯০৫)

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) কোরিয়ায় জাপানের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। (২) লিয়াওটাং উপদ্বীপে রাশিয়ার যাবতীয় অধিকার জাপানের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। (৩) মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের দক্ষিণাংশ এবং শাগালিন নামক স্থানটি জাপানকে দিতে হইল। (৪) রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে যাবতীয় রুশ সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হইল। (৫) জাপান বা রাশিয়া চীন দেশের আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করিবে না এবং মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ অর্থনৈতিক প্রয়োজন ভিন্ন কোন সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে না—এই স্বীকৃতিও দেওয়া হইল।

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির শর্তাদি

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির তথা রুশ-জাপানী যুদ্ধ জাপানের শক্তি ও সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ জাপানের মর্যাদা, শক্তি ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধির দ্বিতীয় পর্যায় বলা যাইতে পারে। চীন-জাপানের যুদ্ধ (১৮৯৪-৫) ছিল প্রথম পর্যায়। রুশ-জাপানী যুদ্ধের ফলে প্রথমতঃ এই কথাই প্রমাণিত হইল যে, ইওরোপীয় দেশগুলির সামরিক শক্তি অপরাজেয় নহে। রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় আধুনিক ইতিহাসের এশিয়াস্থ দেশের নিকট ইওরোপীয় দেশের সর্বপ্রথম পরাজয়। স্বভাবতই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট এই কথা স্পষ্ট-ভাবেই প্রমাণিত হইল যে, সুদূর-প্রাচ্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে জাপানের ন্যায় শক্তিশালী দেশের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি তথা রুশ-জাপানী যুদ্ধের গুরুত্ব :

(১) ইওরোপীয় শক্তি অপরাজেয় নহে—এই সত্য প্রমাণিত

দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধের ফলে কোরিয়ায় জাপানের প্রাধান্য রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃত হইল এবং লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় চীনদেশ অভিমুখে রাশিয়ার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল হইতে রুশ সৈন্য অপসারণের ফলে ঐ অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য বিস্তারের পথও প্রশস্ত হইল।

(২) চীনের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত

তৃতীয়তঃ, এই যুদ্ধের ফলে চীনদেশে এক গভীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সামরিক শক্তি সংগঠন, এই সত্য চীনবাসী উপলব্ধি করিল। জাপানের সামরিক

সাফল্য চীনাবাসীকেও আত্মনির্ভরশীল হইতে অনুপ্রাণিত করিল। চীনবাসীও ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতির অনুকরণে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাপানী সামরিক কর্মচারীদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। এই নূতন প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল ১৯১১-'১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিলক্ষিত হয়।

(৩) চীনের জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ

চতুর্থতঃ, রুশ-জাপানী যুদ্ধের প্রভাব ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বলকান অঞ্চলে বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা নামক স্থান দুইটি অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইল। ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের পর রাশিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে সাময়িকভাবে অপসরণ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়া বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা দখল করিলে এই সূত্রে রাশিয়া পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল।

(৪) অস্ট্রিয়া কর্তৃক রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ: ইওরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চমতঃ, রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া হীনবল হইলে ইংলণ্ডের রুশভীতি অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। ফলে, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে 'এ্যাংলো-রাশিয়ান কন্‌ভেন্‌শন' নামক চুক্তি (Anglo-Russian Convention) স্বাক্ষরিত হইল।

(৫) ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর পথ প্রশস্ত

ষষ্ঠতঃ, রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় জারতন্ত্রের দুর্বলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ ছিল। ফলে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ অনেকটা সহজ হইয়াছিল।

(৬) জারতন্ত্রের দুর্বলতার প্রমাণস্বরূপ

সপ্তমতঃ, এই যুদ্ধের ফলে জাপানের অপ্রতিহত ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আমেরিকা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ রুশ-জাপানী যুদ্ধ অবসানের জন্য মধ্যস্থতা করিয়াছিল। সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করিলে মার্কিন স্বার্থ নষ্ট হইবে এই বিবেচনা করিয়াই আমেরিকা মন্‌রো-নীতি উপেক্ষা করিয়া সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল।

(৭) সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপ

সর্বশেষ, রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ জাপানের জাতীয় জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনাস্বরূপ হইল। জাপানের আত্মপ্রত্যয় এবং রাজ্য বিস্তার-স্পৃহা এই বিজয়লাভের ফলে অধিকতর উৎসাহিত হইল।

(৮) জাপানের আত্মপ্রত্যয়

চীন-জাপানী ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা বৃদ্ধি করিল। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে এক অন্যায়মূলক প্রসার-নীতি অবলম্বন করিল।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে জাপান নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনদেশে জার্মান অধিকৃত সাণ্টাং অঞ্চল, কিয়াও-চাও প্রভৃতি দখল করিয়া লইল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশের নিকট একুশটি বিভিন্ন দাবি উপস্থিত করিল এবং মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই সকল দাবি পূরণের জন্য জানাইল।

এই 'একুশ দাবি' পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ ছিল সাণ্টাং অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপন-সংক্রান্ত, দ্বিতীয় ভাগ ছিল বহির্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া-সংক্রান্ত, তৃতীয় ভাগে চীনদেশ হইতে কয়লা ও লৌহশিল্প-সংক্রান্ত

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

সুযোগ-সুবিধার দাবি ছিল, চতুর্থ ভাগে চীনদেশ নিজ বন্দর, উপকূল বা প্রণালী কোন বিদেশী (ইওরোপীয়) শক্তির নিকট ত্যাগ করিবে না এই দাবি করা হইয়াছিল, পঞ্চম ভাগে ফুকিন (Fukein) অঞ্চলে চীনা শাসনকার্য-পরিচালনায় জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ, জাপান হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, এবং জাপানকে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান প্রভৃতি দাবি করা হইয়াছিল।

আমেরিকা ও অপরাপর শক্তিবর্গ জাপানের এই 'একুশ দাবি' তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানকে দৃঢ়ভাবে বাধাদান করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। বাধ্য হইয়াই চীনদেশ 'একুশ দাবির' অধিকাংশ-ই স্বীকার করিয়া

চীন কর্তৃক একুশ দাবির অধিকাংশ স্বীকৃত

লইল, কেবলমাত্র যে সকল শর্ত স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেগুলি অগ্রাহ্য করিল। জাপান দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিল, রেলপথ প্রস্তুত করিবার, চীনদেশকে ঋণ দিবার নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগও লাভ করিল। দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া এবং কিরিণ-চাংচুং রেলপথ প্রভৃতি ৯৯ বৎসর পর্যন্ত দখলে রাখিবার অধিকার পাইল।

'একুশ দাবি' সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ সন্দেহ নাই। দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের স্বার্থপর বিস্তার-নীতি নৈতিকতা-বর্জিত ছিল বটে, কিন্তু এই দাবির মধ্যে এশিয়ায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'একুশ দাবির' চতুর্থ ও পঞ্চমভাগের শর্তগুলিতে চীনদেশের বন্দর, প্রণালী, অর্থনৈতিক সুযোগ প্রভৃতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই নীতিও পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে 'একুশ দাবি'কে 'এশিয়ার মন্‌রো-নীতি' (Asiatic Monroe Doctrine) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

'একুশ দাবি'—
'এশিয়ার মন্‌রো-নীতি,

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটজনক মুহূর্তে যখন জাপানী সাহায্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমেরিকা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ চীনদেশের নিরাপত্তা নীতি অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের 'একুশ দাবি' সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। যুদ্ধশেষে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে পরাজিত জার্মানির অধীনে চীনের যে সকল স্থান ছিল তাহা চীনদেশ প্রত্যর্পণ দাবি করিলে জাপান উহা অগ্রাহ্য করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের গ্রাস হইতে চীনকে রক্ষা করিবার কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিলেন না। চীনা প্রতিনিধি শূন্যহস্তে প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে
চীনের আশাভঙ্গ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ বৃহৎ দেশগুলির নৌশক্তির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তিবর্গের পরস্পর স্বার্থ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ওয়াশিংটনে এক কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার নৌবলের অর্ধেক হইতেও অধিক পরিমাণ নৌ-বহর রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। জাপানের পক্ষে ইহা অতিশয় সুবিধাজনক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোন দেশই আর কোন রকম নূতন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিতে পারিবে না স্থির হওয়ায় এই অঞ্চলে জাপান-ই সর্বাধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইল। মার্কিন সরকার আমেরিকায় জাপানী শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলে মার্কিন-জাপানী বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময়ে জাপান ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা চুক্তি

স্বাক্ষর করিলে আমেরিকায় জাপানী শক্তিবৃদ্ধিতে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই কারণে আমেরিকার অনুরোধে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে (১৯২১), উহা আর পুনঃ স্বাক্ষরিত হইল না। ফলে, ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির অবসান ঘটিল। ইহার পরিবর্তে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে এক চতুঃশক্তি মৈত্রী স্থাপিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকৃত স্থান আক্রমণ করিবে না এবং এই সকল স্থান-সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ যুগ্ম কন্‌ফারেন্সে মীমাংসিত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। চীন সম্পর্কে উন্মুক্ত-দ্বার নীতিই স্বীকৃত হয়। চীন-জাপানের মধ্যে সাণ্টাং অঞ্চল লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল উহা চীনের স্বপক্ষে মীমাংসিত হয়। জাপান কিয়াও-চাও এবং সাণ্টাং-এর অপরাপর জার্মান অধিকৃত অঞ্চল চীনকে ফিরাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইয়াপ (Yap) দ্বীপ লইয়া আমেরিকার সহিত জাপানের বিরোধেরও মীমাংসা ঐ সময়ে করা হয়।

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স (১৯২১-২২) : নৌশক্তি নিয়ন্ত্রণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যার সমাধান

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে একদিকে যেমন জাপানকে সাণ্টাং অঞ্চল চীন-দেশকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল, অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি ইত্যাদি কেহই বৃদ্ধি করিবে না এই স্বীকৃতির ফলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে জাপান এই প্রাধান্য নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করিয়াছিল।

জাপানের প্রাধান্য

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র যে অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দিয়াছিল উহার ফলে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল দখল করিয়া সেখানের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে মনস্থ করিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইলে এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিলে জাপান 'একুশ দাবির' যে-সকল অংশ তখনও চীনদেশ হইতে আদায় করা হয় নাই সেগুলি দাবি করিল এবং সেই সূত্রে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক তাঁবেদার রাজ্য গঠন করিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিকট আবেদন করিয়া একাধিক কমিটির সুপারিশের অপেক্ষা করিয়াও শেষ

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১) : মাঞ্চুকুয়ো তাঁবেদার রাজ্য গঠন

পর্যন্ত চীনদেশ এই আন্তর্জাতিক সংঘ হইতে কোন সহায়তা লাভে সমর্থ হইল না। বাধ্য হইয়াই চীনদেশ জাপানের সহিত টাংকু (Tangku) নামক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তরদিকে অপসরণ করিতে স্বীকৃত হইল এবং চীন ঐ প্রাচীরের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করিতে স্বীকার করিল।

টাংকু-এর শান্তি চুক্তি

মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঐ সময় হইতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিল। সমগ্র সুদূর প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শোষণের অবসান করিয়া জাপান এশিয়ার অভিভাবকত্ব ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইল। চীনদেশকে ইওরোপীয় শোষণমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জাপান চীনদেশের দ্বার পুনরায় ইওরোপীয়দের নিকট রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। এই কারণে জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং-কাই-শেকের অপসারণ অপরিহার্য ছিল। বৈকাল হ্রদের পূর্বাঞ্চলে যে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বিনাশ করা প্রয়োজন ছিল। এইভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে জাপান তথাকথিত 'নূতন পরিকল্পনা' (New Order) প্রস্তুত করিল। ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারই ছিল জাপানের 'নূতন পরিকল্পনার' মূল উদ্দেশ্য।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহিত

'নূতন পরিকল্পনা'—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নূতন বিশ্লেষণ

এদিকে চীনদেশে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তার চীনজাতিকে দেশরক্ষা এবং দেশকে বিদেশী শোষণ হইতে মুক্ত করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিল। বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিতে চীনে কুয়োমিং-তাং ও কমিণ্টার্ণ দল ঐক্যবদ্ধ হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানির সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিয়ার সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের আশঙ্কার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল।

চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

জাপান-জার্মান চুক্তি

এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিপিং-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে 'মার্কো পোলো পুল' (Marco Polo Bridge)-এর নিকটে চীনা

ও জাপানী সৈন্যদের কয়েকজনের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ ঘটিলে এই সূত্রে জাপান চীন আক্রমণ করিল। জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য চীনের কমিউনিস্ট্ দল চিয়াং-কাই-শেকের কুয়োমিং-তাং সরকারের সহিত যুগ্মভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই যুদ্ধে জাপান চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল দখল করিয়া লইল। জাপান এই অধিকৃত অঞ্চলে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক তাঁবেদার সরকার নিয়োগ করিয়া উহাকে চীনের 'জাতীয় সরকার' নামে অভিহিত করিল। অপর দিকে চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল স্বাধীন চীন হিসাবেই রহিল। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনা কমিউনিস্ট্‌গণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে স্বাধীন চীন কমিউনিস্ট্ অধিকৃত অঞ্চল এবং জাতীয়তাবাদী বা কুয়োমিং-তাং অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া গেল। কুয়োমিং-তাং সরকারের রাজধানী হইল চুংকিং আর কমিউনিস্ট্-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান্।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ

জাপানী অধিকৃত অঞ্চল : স্বাধীন অঞ্চল

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সুদূর-প্রাচ্য অঞ্চলের এক আমূল পরিবর্তন ঘটিতে চলিল।

Questions & Hints

1. How was China affected by (a) the Boxer Rebellion and (b) the Twenty-one Demands ? (C. U. 1952)

[উত্তর-সংকেত : (a) (১) সূচনা : ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক চীনের শোষণের বিরুদ্ধে চীনে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল উহাই বক্সার বিদ্রোহে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধের পর হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। মাঞ্চুবংশের দুর্বলতার সুযোগে বিদেশী শোষণের পথ সহজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। (২) 'বক্সার' গোপন সমিতি গঠন ; (৩) সম্রাজ্ঞী জু-সি (Tzu-Hsi)-এর সহায়তা ; (৪) বক্সার বিদ্রোহ, ১৯০০ ; (৫) আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনীর সহায়তায় বিদ্রোহ দমন ; (৬) আমেরিকা কর্তৃক চীনের 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি'র পুনঃ সমর্থন ; (৭) চীনদেশের আসন্ন ব্যবচ্ছেদ রোধ—বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ।

(b) (১) সূচনা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান ইংলণ্ডের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই সূত্রে জার্মান-অধিকৃত চীনের সাণ্টাং অঞ্চল

দখল করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের বিরুদ্ধে 'একুশ দফা' দাবি করে ; (২) 'একুশ দফা' দাবির প্রকৃতি ; (৩) আমেরিকা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক 'একুশ দফা' দাবি স্বীকার ; (৪) জাপান চীনের এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ। ৪৯৬-'৯৭, ৫২৩-'২৪ পৃষ্ঠা]

2. Write notes on : (a) Sun-Yat-Sen (C. U. 1951) ; (b) The Chinese Revolution of 1911. (C. U. 1952)

[উত্তর-সংকেত : (a) (১) সূচনা : আধুনিক চীনের জন্মদাতা ডক্টর সুন্-ইয়াৎ-সেন চীনা ইতিহাসের এক উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। (২) তাঁহার বাল্যজীবন ; (৩) কুয়োমিং-তাং দল গঠন ; (৪) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ; (৫) সুন্-ইয়াৎ-সেনের নীতি—জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শান্তি ; (৬) সুন্-ইয়াৎ-সেনের দান। ৫০৪-'০৬ পৃষ্ঠা]

(b) (১) সূচনা : মাঞ্চুবংশের অকর্মণ্যতা এবং সেই সুযোগে বৈদেশিকদের শোষণ-নীতি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের চীনা বিপ্লবের মূল কারণ। (২) রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের জয়লাভে চীনে উদ্দীপনা—জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রভাব ; (৩) সম্রাজ্ঞী-জু-সি-এর মৃত্যু—উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে বিভেদ—কুয়োমিং-তাং দলের প্রতিষ্ঠা ; (৪) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নাবালক সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগ—চীন প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত ; (৫) প্রথম প্রেসিডেন্ট সুন্-ইয়াৎ-সেন—তাঁহার পদত্যাগ—যুয়ান্-শি-কাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ৪৯৯-'৫০০ পৃষ্ঠা]

3. Trace the growth of Japanese Imperialism in the Far East from 1895 to 1919. (C. U. 1955, 1952)

Narrate the story of the ascendancy of Japan in the Far East during the first two decades of the present century. (C. U. 1954)

Describe the rise of Japan as a world power from the beginning of the present century down to the year 1939. (C. U. 1956)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : সুদূর-প্রাচ্যের ইতিহাসে জাপানের উত্থান এক যুগান্তকারী ঘটনা। বহু শতাব্দীর সুষুপ্তি কাটাইয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে জাপানের প্রবেশ যেমন বিস্ময়কর তেমনি উপদেশপূর্ণ। (২) চীন-জাপানের যুদ্ধ—কারণ ও ফলাফল ; (৩) ইঙ্গ-

জাপানী চুক্তি—জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি ; (৪) রুশ-জাপানের যুদ্ধ—কারণ ও ফলাফল ; (৫) 'একুশ দাবি' ; (৬) ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে জাপানের সুযোগ ; (৭) মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১), টাংকু-চুক্তি ; (৮) 'নূতন পরিকল্পনা' —জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নূতন রূপ ; (৯) ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন আক্রমণ, দক্ষিণ-পূর্ব চীন জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে পরিণত। ৫২৪-'২৫ পৃষ্ঠা]

4. How did the Treaty of Shimonoseki (1895), and the Treaty of Portsmouth (1905) change the balance of power in the Far East ? (C. U. 1953, 1959)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : জাপানের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতির ইতিহাসে শিমনোশেকি ও পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনা-জাপানী যুদ্ধের ফলে শিমনোশেকির সন্ধি এবং ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধের ফলে পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। (২) শিমনোশেকির সন্ধির শর্ত : সেগুলির গুরুত্ব ; (৩) পোর্টস্-মাউথের সন্ধির সর্ত : সেগুলির গুরুত্ব ; (৪) উপসংহার : চীনা-জাপানী যুদ্ধ ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপান সুদূর-প্রাচ্যের সর্বাধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে জাপানের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, জাপান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই দুই যুদ্ধে জয়লাভের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই জাপান এক ঘোর সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হইল। সমগ্র এশিয়ার নেতৃত্ব ও এশিয়ার উপর প্রাধান্য স্থাপন হইল জাপানী পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য। ৫১৭-'২০, ৫২১-'২৩ পৃষ্ঠা]

5. Why is the Sino-Japanese War (1894-95) regarded as a critical and decisive event in the history of the Far East ? (C. U. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : চীন-জাপানের যুদ্ধের কারণ অতি সংক্ষেপে কয়েক লাইন দিতে হইবে ; (২) শিমনোশেকির চুক্তি—চুক্তির শর্তাদি ; (৩) গুরুত্ব। ৬১৬-২০ পৃষ্ঠা]